

A. or. Ramdas Sen
2522^d
80

Royal Academy
Munich

Presented to the
Author

BHARAT RAHASYA
OR
ESSAYS ON THE ANCIENT RELIGION
AND
WARFARES OF INDIA &c.

BY
RAMDAS SEN, M. R. A. S.
MEMBER ORDINARY OF THE ORIENTAL ACCADEMY,
FLORENCE,

ভারত-রহস্য ।

প্রথম ভাগ ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
বহরমপুরে প্রকাশিত ।

“যেনাস্য পিতরীযাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ ।
নেন যাযাত্ সতাং মাগং তেন গচ্ছন্ ন रिष्यते ॥”

কলিকাতা

বাল্মীকিযন্ত্রে মুদ্রিত ।

১২৯২ সাল ।

(1885)



1717 1658

বিজ্ঞাপন ।

প্রথম ভাগ “ভারত-রহস্য” মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । ইহার প্রস্তাব গুলি পূর্বে “ভারতী” “আর্যদর্শন” “পান্থিক-সমালোচক” ও “নব্যভারত” নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই সকল প্রবন্ধ ইহাতে অবিকল মুদ্রিত করা হয় নাই ; সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে । স্থলবিশেষে পরিবর্তন, স্থল বিশেষে নূতন অংশের সংযোজন এবং সংশোধন করা হইয়াছে ।

এই পুস্তকের অনেক স্থানে অনেক বরাতি কথা আছে ; অর্থাৎ ইহাতে “ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব ।” এবং “পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ।” এইরূপ অনেক কথা পাইবেন । সে সকল কথার বিস্তৃত বিবরণ ইহার দ্বিতীয় ভাগে দেখিতে পাইবেন । দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে ।

বিষয় গুলি লিখিতে হস্তলিখিত নাগরাক্ষরের পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল । সেইসকল পুস্তক অপাঠ্য-তম ও অশুদ্ধতম । তৎকারণে ইহার সংস্কৃত প্রমাণ গুলিতে

যৎকিঞ্চিৎ অশুদ্ধ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা আপন আপন বিবেচনা শক্তির সাহায্যে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন।

আমি যখন “ভারত-রহস্যের” জন্ম প্রবন্ধ লিখিতে ব্যাপৃত ছিলাম, আমার সংস্কৃতাত্ম্যাপক মাননীয়তম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে তৎকালে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন এবং ইহার সংশোধন ভার লইয়াও আনন্দিত করিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

ভূমিকা ।

পিতৃ পিতামহগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পুত্র পৌত্র গণ তাঁহাদের ধন, মান, গৌরব ও পদমর্যাদা প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া সে-সকল রক্ষার্থ যত্ন তৎপর হন, ইহা এ দেশের চিরাভ্যস্ত প্রথা । এই চিরন্তনী প্রথাই আমাদের জাতিপ্রবাহ, ধর্মপ্রবাহ, ও কুলপ্রবাহ এবং শ্রেণীপ্রবাহ অদ্যাপি অক্ষত রাখিয়াছে ; সঙ্কর হইতে দেয় নাই । কশ্যপ মুনি কোন্ কালে জন্মিয়া ছিলেন তাহার ঠিকানা নাই, অথচ আমরা কশ্যপ (কশ্যপের বংশ বা সন্তান) । কশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাই তাঁহার উত্তরাধিকারিসূত্রে আমরাও ব্রাহ্মণ । কশ্যপ হিন্দু ছিলেন ; তাই তদ্বংশীয় আমি হিন্দু । এরূপ উত্তরাধিকারিতা অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ ; অথবা থাকিলেও অন্যদেশের লোক উহা অব্যাহত রাখিতে জানে কি না তাহা সংশয় ।

মনুষ্যের জুযশ, পদমর্যাদা ও ধর্মখ্যাতি স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ভৌমসম্পত্তির ন্যায় নশ্বর বা ক্ষণভঙ্গুর নহে । উহা

রাখিতে জানিলে যুগযুগান্তকাল থাকে, রাখিতে না জানিলে এক নিমেষে লয় হইয়া যায়। পূর্বকালের হিন্দুসন্তানেরা অথবা আৰ্য্যসন্তানেরা আপন আপন বংশপুরুষের জ্ঞান, ধর্ম, পদমর্যাদা ও সুযশ বজায় রাখিতে জানিতেন ; তাই এদেশে আজপর্যন্ত একই ধর্ম, একই জ্ঞান, একই অভিজ্ঞতা, একই নীতি ও একই আচার ব্যবহার অচ্ছিন্নপ্রবাহে দীর্ঘা-দপি দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হায় ! আর তাহা চলে না ; চলিবে না ; চলিবার সম্ভাবনাও নাই। আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও অভিজাত্য বজায় রাখা দূরে থাকুক, বিবেচনা হয়, যেন অচিরে এই বিস্তীর্ণজাতির চিহ্ন পর্যন্ত প্রলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যাঁহারা যথার্থ বংশধর সন্তান, যাঁহারা যথার্থ সংপুত্র, তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে কুলপুরুষের পূর্বমহিমা স্মরণ করিলে যেন তাঁহাদের শরীর মন পবিত্র হয় ; অঙ্গ পুলকিত হয় ; অধিকন্তু অভূতপূর্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয়। ঐরূপ পিতৃভক্ত ও প্রেমিক হিন্দু সন্তান দিগের সন্তোষার্থ আমি পূর্বে আৰ্য্যজাতির পূর্বমহিমাস্মারক কতিপয় প্রবন্ধ “ঐতিহাসিক-রহস্য” নাম দিয়া প্রচারিত করিয়া ছিলাম ; সম্প্রতি আবার “ভারত-রহস্য” নাম দিয়া ভারতের পূর্ব-জ্ঞান, ভারতের পূর্বধর্ম, ভারতের পূর্বাচার, ভারতের পূর্বব্যবহার, ভারতের সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র এবং

ভারতের পূর্ব ভক্ষ্য ও পূর্বপরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য স্মর্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম।

পূর্বে ভারত বাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগ যজ্ঞ করিতেন ; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল ? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাব আজ কাল জনসাধারণের অবিদিত প্রায় হইয়া আছে ; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অববোধক এতৎপুস্তকের “রহস্য” নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, ধর্ম, ধর্মানুষ্ঠানপ্রকার, নীতি-সেবা, সমাজ ব্যবস্থা, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি অনুসন্ধান করায় অত্র কোন সুফল না হউক, মনের বিস্তার ও আনন্দ অবশ্যই হইবে এবং বর্তমান-সমাজ-সংস্করণেচ্চার অনেক আনুকূল্য হইবে। যাহারা অনন্তকালের সামাজিক-ব্যবস্থার পরিপর্তন ও সংশোধন করিতে ইচ্ছুক ; তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্যই অনুকূল অবলম্বন হইবে ; কেন না, প্রাচীন ব্যবস্থার মর্ম ইহাতে বিশদ রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পূর্বব্যবস্থায় পাণ্ডিত্য জন্মিলে অবশ্যই পূর্বব্যবস্থার পরিবর্তন সংশোধন সহজ হইয়া আসিতে পারে ; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি পূর্বে “ঐতিহাসিক রহস্য” প্রচার করিয়া ছিলাম ; এক্ষণে আবার তাহার শাখাস্বরূপ “ভারত-রহস্য” প্রচার

করিলাম। ইহার দ্বারা যদি কাহার অত্যন্ত আনন্দ,
অত্যন্ত জ্ঞান ও অত্যন্ত উপকার হয়, তাহা হইলে আমি
আমার ব্যয়ের ও উৎকট পরিশ্রমের যথোচিত সাফল্য
অনুভব করিব।

সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা পর্যন্ত ।
সোমযাগ ...	১ ...	২২
আর্য্যজাতির যুদ্ধান্ত্র ...	২৩ ...	৬৮
ধনুর্বেদ ...	৬৯ ...	১২৯
অসি ...	১৩০ ...	১৮০
দেবযান ...	১৮১ ...	১৯১
রাজসূর্যযজ্ঞ ...	১৯২ ...	১৯৯
অশ্বমেধ যজ্ঞ ...	২০০ ...	২০৮
পুরুষমেধ যজ্ঞ ...	২০৯ ...	২১২
রাজাভিষেক ...	২১৩ ...	২৩৯
যুদ্ধ-রহস্য ...	২৪০ ...	২৮৮
যুদ্ধ-ধর্ম্ম ...	২৮৯ ...	৩০১

115

115	...	...	...	...	...	...
116	...	...	...	...	...	...
117	...	...	...	...	...	...
118	...	...	...	...	...	...
119	...	...	...	...	...	...
120	...	...	...	...	...	...
121	...	...	...	...	...	...
122	...	...	...	...	...	...
123	...	...	...	...	...	...
124	...	...	...	...	...	...
125	...	...	...	...	...	...

ভারত-রহস্য ।

সোমযাগ ।

ভারতের পূর্ব মহিমা অনুসন্ধান করা নিষ্ফল নহে। আমরা জানি, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের অত্যন্ত মহিমা জানিবামাত্র কেমন এক অনির্বচনীয় জাতীয় প্রেম উচ্ছলিত হয়। সেই জন্যই আমি “ভারত-রহস্য” নাম দিয়া পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রকাশে উৎসুক হইয়াছি। প্রথমতঃ তাঁহাদের যাগযজ্ঞ ও ভূতি ধর্ম্মকার্যের ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্তব্যতা (প্রণালী) বর্ণন করিব, পশ্চাৎ অগ্নি রহস্য, যাহা এখন লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, সে গুলির বর্ণনা করিব।

বৈদিক সময়ে দুই শ্রেণীর যজ্ঞ ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এবং পুরোডাশ প্রভৃতি পিষ্টক আহুতি দিয়া এক প্রকার ; আর সোমরস আহুতি দিয়া দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকারের নাম “হবির্যজ্ঞ”, দ্বিতীয় প্রকারের নাম “সোম-যজ্ঞ” বা “সোমযাগ”।

হবির্যজ্ঞের পরে সোম-যজ্ঞ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রমাণ অথর্ব বেদে আছে। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যজ্ঞ মনোনীত করেন।

হবির্যজ্ঞ অনেক প্রকার, এবং সোম-যজ্ঞও অনেক প্রকার। কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞসমূহের নাম আছে এবং ঐ বেদে তত্তাবতের বিধিও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যাহা আছে তাহা কিছু বিস্পষ্ট। ফল, যজুর্বেদের প্রচার সময়েই সমুদায় যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হয়, ঋগ্বেদের সময়ে কেবল অঙ্গুর মাত্র ছিল। প্রাচীন লোকেরা সেই জন্যই “ত্ৰিনায়াং যোগ্যমুচ্যতে” বলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ১ কাণ্ড ষষ্ঠ প্রপাঠক, ৯ অনুবাকে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা আছে। যথা—

“প্রজাপতির্যজ্ঞানমৃজত। অগ্নিহীত্রং চাগ্নিহোমম্ চ দীর্ঘমাসী-
শ্বীকৃৎস্বামাবাস্থাস্থানিরান্নং—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে যে হবির্যজ্ঞের কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানতঃ

৭ প্রকার । যথা অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, আগ্র-
যনী, চাতুর্মাশ্র, পশুবন্ধ, ও সৌত্রামনী ।

সোম-যজ্ঞও প্রধান করে ৭ প্রকার । অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নি-
ষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোষ্যাম ;
এবং রাজ-স্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও এই সোমযাগের মধ্যে গণ্য,
কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণেরা করিতেন না ।

এই সোম-যজ্ঞের অন্তঃপাতি অনেক প্রকার যাগ আছে ।
যত প্রকারই থাকুক, প্রথমোল্লিখিত অগ্নিষ্টোমই সকলের
প্রকৃতি । সুতরাং বিশেষ বিশেষ প্রকারের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ,
বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় উক্ত হইত । সোমরস দ্বারা সাধিত
হইত বলিয়া ইহাকে সোমযাগ বলিত ।

এবম্প্রকার সোম-যাগ আবার ৩ প্রকার । “অহীন”
“সত্র” এবং “একাহ” । যাহা এক দিনে সমাধা হয় তাহা
“একাহ” ।

২ হইতে ১২ দিন পর্যন্ত যজ্ঞ হইলে তাহার নাম
“অহীন ।”

১ পক্ষ কি বহুকাল-ব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম
“সত্র ।”

সত্র আবার অনেক প্রকার “দীর্ঘ সত্র” ইত্যাদি ।

সত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ পরে বলিব । অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ
করিবার কাল এই রূপ নির্ণীত আছে । যথা—“বসন্তঃস্বিন্দি

ষ্টীমঃ ।” (কাত্যায়নসূত্র) “বসন্তী জ্যোতিষ্টীমেণ যজ্ঞেত” (আপস্তুত্ব
সূত্র ।) সূতরাং বসন্ত কালই সোমযাগ করিবার কাল, বসন্ত
কালেই প্রচুরতর সোম পাওয়া যাইত, সূতরাং বসন্ত কালেই
ঋষিরা সোম-যাগে প্রবৃত্ত হইতেন ।

যোগ-যাগের দেবতা অগ্নি । অগ্নিরই স্তব করা যাইত
বলিয়া অগ্নিষ্টোম (অগ্নিঃ স্তোমঃ স্তবনং ইত্যগ্নিষ্টোমঃ ।) অগ্নির
স্তোত্র ও পূজা করাই প্রধান উদ্দেশ্য, আনুষঙ্গিক অন্যান্য
বহু দেবতারও পূজা করা হইত ।

এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যজ্ঞ-কার্যে সুপটু প্রধান
প্রধান ব্রাহ্মণেরাই নিযুক্ত হইতেন ।

প্রথমে কোন পুণ্য ও লক্ষণ-যুক্ত ভূমি যজ্ঞ-ক্ষেত্রের জন্য
অন্বেষণ করিয়া তাহাতেই যজ্ঞ হইত । যেখানে সেখানে হইত
না । পরে, ক্রমে, যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় সেই
স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত বলিয়া বিধি প্রচারিত হইয়াছিল ।
ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডে উল্লিখিত আছে ।

“নদুহীবাচ যান্নবল্কীয়া বায়্মায দেবযজনং জীষযিতুমৈম ।
নত্ সাত্যযজ্ঞীঃপ্রবীত্ সৰ্ব্বা বা দুযং পৃথিবী দেবযজনং যন্ন বা অস্মৈ
ক্চ যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজযেতি ।”

ইহার অর্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন, যে আমরা
এক সময়ে বায়্মের জন্য যজ্ঞোপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে-
ছিলাম, পথে সাত্যযজ্ঞের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন,

সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যথা ইচ্ছা, যেখানেই যন্ত্র-
লভ হইবে সেই স্থানেই তোমরা বাগ্নকে লইয়া যজ্ঞ কর ।

এইরূপ স্থান নিশ্চয় হইলে তথায় প্রথমতঃ একটী মণ্ডপ
নিৰ্মাণ করা হইত । তাহা চারি দিকে সমান ও প্রত্যেক
দিকে ১২ অরতি প্রমাণ (কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির
মূল-পর্যন্ত অরতি শব্দের অভিধেয় । যাহাকে আমরা “মুটুম-
হাত” বলি ; অর্থাৎ এক হাত পূর্ণ নহে, সেই মুষ্টিবদ্ধ হস্তই
অরতি) । এই মণ্ডপটির নাম “প্রাচীন বংশ ।” ইহার চারিটা
দ্বার থাকে, সুতরাং ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলে । এই
মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত করা হয় ।

এইরূপে প্রাচীন বংশ মণ্ডপের নিৰ্মাণ সমাপ্ত হইলে এবং
যজ্ঞীয় তাবদ্রব্যের আয়োজন পূর্ণ হইলে ঋত্বিক অর্থাৎ
পুরোহিতেরা যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষিত
করান (যজ্ঞ-বিষয়ক উপদেশ দেন, যজমানও তাহা স্বীকার
করেন ।) সোম-যাগে কত গুলি পুরোহিত বা ঋত্বিক আব-
শ্যক হইত, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে ।

সকল যজ্ঞে সমান ঋত্বিক আবশ্যক হয় না । অগ্ন্যাধেয়
যাগে ৪, অগ্নিহোত্রে ১, দশ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ৪,
চাতুৰ্মাস যাগে ৫, পশুবন্ধ যাগে ৬, সোমযাগে ১৬ ।

এই ৬ জন ঋত্বিকের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও কার্য আছে ।
নাম যথা— “ব্রহ্মা” “উদগাতা” “অধ্বর্যু” “হোতা”

“ব্রাহ্মণাচ্ছংসী” “প্রস্তোতা” “মৈত্রাবরুণ” “প্রতি-প্রস্থাতা”
 “পোতা” “প্রতিহর্তা” “অচ্ছাবাক” “নেষ্টা” “আগ্নিধু”
 “সুব্রহ্মণ্য” “গ্রাবস্তুং” এবং “উন্নেতা”।

আপস্তম্ব বলেন, “সদশু”ও লাগে। তাহা হইলে
 সোমযাগের ১৭ জন পুরোহিত, ইহাদের মধ্যে ৪ জন
 প্রধান, অবশিষ্ট ঐ ৪ জনের সাহায্যকারী। হোতা
 উদগাতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, এই ৪ জনই প্রধান।

কে কাহার সাহায্যকারী তাহা বলা যাইতেছে। অধ্ব-
 র্যুর সাহায্যকারী “প্রতি-প্রস্থাতা” “নেষ্টা” ও উন্নেতা
 এই ৩ জন।

হোতার সাহায্যকারী “মৈত্রাবরুণ” “অচ্ছাবাক” এবং
 “গ্রাবস্তুং” এই তিন জন।

উদগাতার সাহায্যকারী “প্রস্তোতা” “প্রতি-হর্তা” এবং
 “সুব্রহ্মণ্য” এই ৩ জন।

দেবতার স্তব ও আহ্বান করা হোতার কার্য। দেবতার
 সন্তোষ জনক সাম গান করা উদগাতার কার্য। কন্ম-বিশেষে
 অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য পর্যবেক্ষণ করা এবং
 জপ করা ব্রহ্মার কার্য।

যজমান এই সকল ঋত্বিক্ বরণ করিবেন। ইহারা
 যজমানকে হস্তে ধরিয়া সেই যজ্ঞমণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত
 করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণ কালে যজমান অগ্রে ক্ষৌরিক, পরে স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও মাঙ্গল্য দ্রব্য ধারণ করিবেন । পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত মহা আনন্দে যজ্ঞ-শালায় উপনীত হইবেন । ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশ-গুচ্ছ লইয়া যজমানের সর্বাঙ্গ মার্জন করিবেন । বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে সেই প্রাচীন বংশ নামক যজ্ঞমণ্ডপের পূর্বদ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবেন । প্রবেশের পরেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইবেন । দীক্ষিত করান কি না একটী মাত্র ক্ষুদ্র হোম করান । সেটী আরম্ভ-সূচক । ইহার নাম “দীক্ষণীয় ইষ্টি” । এই ইষ্টিতে বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একা-দশটী পুরোডাশ হোম করা হয় ।

এইরূপ দীক্ষা-কার্য সমাধা হইলে, প্রথমতঃ অধ্বর্যু উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনান, যে, “অহীচ্চিষ্টা-যং ব্রাহ্মণঃ” অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত । পরে দীক্ষিত যজমান নিজে একটী “প্রাণোষ্টি” নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন । এই যাগে চরু পাক করিয়া তদ্বারা অদिति এবং ঘৃতের দ্বারা অগ্নি, সোম ও সূর্য্য দেবতার হোম করা হয় । এই ইষ্টি করা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞের আরম্ভ হইল । ইহার পরে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক “উপরব” প্রদেশে (উপরব কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক এক খানি বৃষ-চন্দ্র

বিস্তার করেন, তদুপরি কুশ বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর সোমলতার ভার অর্থাৎ বোঝাটী স্থাপন করেন । পরে সোমবিক্রেতা সোমের অংশ অর্থাৎ তত্ত্ব সকল পরীক্ষা করিতে থাকে এবং পরিষ্কার করিতে থাকে । পরে ১৭ জন ঋত্বিক সমভিব্যাহারে যজমান তথায় আগমন করিয়া তাহা ক্রয় করেন । অন্য কিছু দিয়া ক্রয় করিলে হইবে না, একটী অরুণ-বর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গাভী দিয়া ক্রয় করিতে হইবেক । এতাদৃশী গাভীটী উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ অধ্ব-র্যুর সঙ্গে সোম-বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয়ের কথা হয় । সেই কথা গুলি বড় আশ্চর্য্য । যথা—

প্রথমে অধ্বর্যু বলেন, “অযি মী বিক্রেতঅস্তু সীমী রাজা ?” রাজা সোমকে কি তুমি বিক্রয় করিবে ?

সোম-বিক্রেতা ! “অস্তু বিক্রেতঅঃ” “হঁা বিক্রয় করিতে হইবে ।”

অধ্ব । ‘গীঃ কলযা মূল্যেন ক্রীণীমঃ’ এই গাভীর ষোল অংশের এক অংশ মূল্য দিয়া আমরা কিনিব ।

সোম—“ইতীঃপি ভূয়ঃ সীমী রাজাঃহঁতি” রাজা সোম ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য পাইবার যোগ্য ।

অধ্ব । সত্যং গীরপি বিশিষ্টী মহিমা । পয চীরসাবং দধ্যামিচ্ছা নবনীতমুদস্বিত্ চূতম্ ইত্যেবমাदीनि संसारीपयोगि-बस्तु-जानानि गोभ्यः समुद्भवन्ति ।” সত্য বটে যে, সোম অধিক

মূল্যবান ; কিন্তু গাভীরও বিশিষ্ট মহিমা আছে । তুমি দেখ, — দুগ্ধ, ক্ষীর-সার অর্থাৎ সর বা মালাই, দধি, আমিন্ধা অর্থাৎ ছানা, নবনীত উদশ্বিৎ অর্থাৎ তক্র বা বোল, ঘৃত, ইত্যাদি অনেক প্রকারবস্তু গাভী হইতে পাওয়া যায় । *

সোমবি—“অস্নীতন্ তথাপি গীঃ ষোড়শাংশাদধিকং সীমী রজাঃস্বঁতি ।” সত্য বটে, তথাপি রাজসোম গাভীর ষোড়শাংশের অধিক মূল্যের যোগ্য ।

ক্রমে অধ্বর্যু ৪ ভাগের এক ভাগ মূল্য দিয়া কিনিতে চাহেন । পরে ৩ ভাগের এক ভাগ দিয়া, ক্রমে অর্ধেক, ক্রমে সেই সম্পূর্ণ গাভীটী দিতে স্বীকৃত হন, তখন সোমবিক্রেতা বলেন, “বিক্রীণী ময়া সীমঃ পরন্তু বস্ত্রাদিকং পারিতোষিকমুদ্যৎ লব্ধমিচ্ছামি ।” আমি সোমবিক্রয় করিলাম, পরন্তু পারিতোষিক পাইতে ইচ্ছা করি ; পরে বিক্রেতাকে পারিতোষিক দিয়া রাজা সোমকে শকটে উঠাইয়া সেট প্রাচীন-বংশ নামক যাগ-গৃহে পূর্ব দ্বার দিয়া আনিয়া “আহবনীয়” নামক অগ্নি-কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে এক খানি কাষ্ঠ পীঠের (পিঁড়ি) উপরমৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার

* ছেনক প্রস্তুত করিবার নিয়ম বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত আছে । “তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি স বৈশ্বদেব্যামিচ্ছা” এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ ।

উপর রাখা হয় । এই সময়ে একটী “আতিথ্যেষ্টি” নামক ক্ষুদ্র যাগ করা হয় । অর্থাৎ রাজা সোম যেন গৃহে অতিথি হইয়াছেন তুতরাং যথোচিত অতিথি সংকার করা উচিত, এই ভাবেই সেই ইষ্টিটি করা হয় এবং তাহা ঠিক লৌকিক রীতিতে সম্পাদিত হয় ।

পরে সোম-যাগের বিঘ্নকারী অশুর দিগের পরাভব কামনায় যজমান ৩ দিন পর্যন্ত “উপসদ” নামক একটী ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘতাহুতির দ্বারা হোম করা হয় । তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় এই (উপসদ) যজ্ঞ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিম্নয়োজন ।

দিনত্রয়-ব্যাপক “উপসদ” যজ্ঞের মধ্য দিনে সৌমিক বেদী নির্মাণ করা হয় । ইহা পূর্বোক্ত প্রাথংশ শালাঃ সম্মুখ ভাগে পাদত্রয়-পরিমিত ভূভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত ।

এই বেদীটির উপরিভাগও চতুর্দিক বিতান দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় । ইহার সম্মুখভাগের নাম “অংস,” আর পশ্চাৎ ভাগের নাম “শ্রোণী ।” এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে আয়তনে ১০ পদ পরিমিত একটী বেদী রচনা করা হয় । ইহা অগ্নিহোত্রবেদীর সদৃশ । ইহার

নাম ‘উত্তর বেদী ।’ এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে পূর্বপশ্চিমে ১ পদ আয়ত এক বেদী নির্মিত হয় । ইহার আকার অগ্নিহোত্র বেদীর সদৃশ অর্থাৎ কুশমধ্য । অনন্তর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী-রেখা টানা হয় । মধ্য হইতে অংস পর্য্যন্ত সেই সুব্যক্ত রেখার নাম ‘পৃষ্ঠ্যা ।’ অপিচ মহাবেদীর উত্তরাংশের পশ্চাৎ ভাগে ৩ পদ দূরে একটী গর্ত খনন করা হয় । ইহাকে বৈদিকেরা ‘চাত্তালক’ বলেন । এই চাত্তালক গর্ত হইতে ১২ পদ দূরে অপর একটী গর্ত করা হয় তাহার নাম ‘উৎকর’ ।

এই সমস্ত নির্মাণের পর, অধ্বযু্য ও প্রতিপ্রস্থাতা ‘হবির্ধান’ নামক দুই খানি শকট (গাড়ী) সেই উৎকর গর্তে ধোত করিয়া পশ্চিম ধার দিয়া মহাবেদীতে আনয়ন করতঃ শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং সেই পৃষ্ঠ্যা নামক রেখার দক্ষিণ উত্তর পাশে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ উত্তর ক্রমে ৩ অরতি এবং পশ্চিম দিকে ৯ অরতি পরিমিত (৪ কোণা) চতুরস্র এবং চারিটী স্তম্ভ যুক্ত এক মণ্ডপ নির্মাণ করেন । এই মণ্ডপের নাম ‘হবির্ধান মণ্ডপ ।’ পূর্বে ও পশ্চিমে ২টী দ্বার থাকে । বীরণ অর্থাৎ শর-পত্রের কট (মাদুর) দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয় ।

অনন্তর মণ্ডপের মধ্যে সমান চারিটী প্রকোষ্ঠ নির্মাণ পূর্বক তাহার আগ্নেয় (অগ্নিকোণস্থিত) প্রকোষ্ঠের মধ্য-স্থলে

হস্তপ্রমাণ সমচতুরস্র (স্কোয়ার) রেখা কল্পনা করিয়া, প্রত্যেক কোণের প্রান্ত প্রদেশে বিস্তারে অর্দ্ধ হস্ত এবং গভীরতায় এক হস্ত, এরূপ চারিটি গর্ত করা হয়। গর্তের মুখে বরুণকাষ্ঠ অথবা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠের চারি খানি ফলক দ্বারা পুষ্টিত অর্থাৎ আবদ্ধ করিয়া তত্পরি বৃষচর্ম, তত্পরি শিলাপটু (পাথরের পাটা) রাখা হয়। তাহাতেই রস-নিষ্কাশণের নিমিত্ত সোম পেষণ করা হইয়া থাকে।

‘হবির্ধান’ মণ্ডপের সম্মুখে “পৃষ্ঠ্যা” নামক স্থানের দক্ষিণে “হবির্ধান” মণ্ডপের আয় “সদোমণ্ডপ” রচনা করা হইয়া থাকে। এই মণ্ডপ দশ অরতি প্রমাণ পূর্বায়ত, নয় অরতি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভসুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত করা হয়। এতাদৃশ সদোমণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে যজ্ঞমানের তুল্যপ্রমাণ একটী ঔদম্বরী স্তূপ (যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ অগ্নিধ্বশালার নির্মাণ এবং তাহা সদোমণ্ডপ ও হবির্ধান মণ্ডপ, এই দুয়ের উত্তর ভাগেই হইয়া থাকে। ইহার আয়তন ও বিস্তারাদি প্রায় পূর্বের মত পূর্বপশ্চিম দীর্ঘ। ইহার এক অর্দ্ধাংশ বেদীর প্রান্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট, এবং অপর অর্দ্ধাংশ বেদীর বাহিরে নিঃসৃত থাকে। ইহার দুইটি দ্বার থাকে, দক্ষিণ দিকে একটী ও পূর্বদিকে একটী।

উল্লিখিত সদোমণ্ডপে বা অগ্নিধ্বশালায় মৃত্তিকা ও

কাঁকরের হস্ত প্রমাণ যে সকল বেদী নির্মাণ করা হয়, যাজ্ঞিক-গণ সে গুলিকে “ধিক্ষ্য” বলিয়া উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে আগ্নিঋশালার দুইটী “ধিক্ষ্য” অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে একটী (ইহার নাম মার্জালীয়) উত্তর ভাগে একটী (ইহার নাম আগ্নিধ্রীয়)। অপিচ হোতার জন্ত ১, মৈত্রাবরুণের জন্ত ১, প্রশান্তার জন্ত ১, ব্রাহ্মণাচ্ছংশীর জন্ত ১, পোতার জন্ত ১, নেষ্টার জন্ত ১, এবং অচ্ছাবাকের জন্ত ১, এই সাতটী ধিক্ষ্য সদোমগুপ মধ্যে নির্মিত হইয়া থাকে।

মহাবেদীর সম্মুখভাগে এবং আহবনীয় কুণ্ডের সন্নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তু উচ্ছিত করা হয়।*

মহাবেদীর নির্মাণ সমাধা হইলে, বৈসর্জন-নামক হোমের পরে, “অগ্নিষ্টোমীয়” পশুযাগের প্রারম্ভ হয়। এই যাগটী সোম-যাগের পূর্বসঙ্গ। এই সময়েই প্রাগ্বংশশালায় উত্তরবেদীস্থিত সোমলতা সকল আনীত হইয়া হবির্ধান মণ্ডপে স্থাপিত করা হয়। পরে যজ্ঞীয় পশুকে পবিত্রজলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করতঃ কুশপিঞ্জলীযুক্ত পল্লশাখার দ্বারা উপাকরণ অর্থাৎ মন্ত্রপূত

* যজ্ঞীয় যূপ সকল অষ্টাশ্র অর্থাৎ আট পোয়ালে করা হইত। যজ্ঞ-বিশেষে ইহার উচ্চতার তারতম্য ছিল। সোমযাগে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরতি হইতে পঞ্চদশ অরতি পর্যন্ত এবং খদির কাষ্ঠের দ্বারা অভাবে পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হইত।

করা হয়। উপাকরণ কার্য সমাপ্ত হইলে সংজ্ঞপন অর্থাৎ বধ করা পর্যন্ত যে সকল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা হইত সেই সমুদায়ের নাম পশ্চালন্তন।

জাতদত্ত, অবিকৃতান্ত, রোগ শূন্য এবং বিশেষরূপে পুষ্ট, এতাদৃশ ছাগ পশুই যজ্ঞকার্যে গৃহীত হইত।

কথিত প্রকারের পশু যখন বধ্যস্থানে নীত হয়, ঋত্বিকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র গান করিতে থাকেন। সেই গায়মান মন্ত্রের অর্থ এই রূপ—— “হে ব্যাপক ইন্দ্রিয়-সমূহ! এই পশুর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত অর্থাৎ প্রাণবায়ুপ্রভৃতি ও জীবাত্মার সহিত তোমরা আমাদের “হবি” অর্থাৎ হোম দ্রব্য প্রদান কর। পশ্চাৎ এই পশুর ভবিষ্যৎ-দেব-শরীরের সহিত সংযুক্ত হও।” সংজ্ঞপন * কার্য সমাপ্ত হইলে তাহার নিম্ন-লিখিত অঙ্গ সকল উৎকর্ভন করিয়া লইয়া “শামিত্র” নামক অগ্নিকুণ্ডে তাহা পাক করিয়া মন্ত্রগান করতঃ আহুতি প্রদান করা হইত। হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয় বাম হস্ত, পাশ্ব দ্বয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনালা, বপা, এবং বসা প্রভৃতি আরও কএকগী অঙ্গ ছেদন করিয়া

* এই সংজ্ঞপন কার্য যে কোন ব্যক্তি নির্বাহ করিতে পারেন। এখন যেমন খড়্গের একাঘাতে পশু বধ করার প্রথা প্রচলিত আছে, পূর্বে এরূপ ছিল না। মুষ্ঠাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে যজ্ঞ পশু বিনষ্ট করা হইত। তাদৃশপ্রকারে বিনাশ করার নাম “সংজ্ঞপন”।

তদ্বারা হোম করা হইত। এতদন্ত কার্য্য-কলাপের নাম
“অগ্নিষ্টোমীয় পশু-যাগ।”

ইহার পরেই পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা চাত্বাল ও উৎকর
ভূমির উত্তরভাগে অবস্থিত বহমান জলাশয় হইতে জল
আহরণ করিয়া যজ্ঞশালায় স্থাপন করেন। সেই আহৃত
জলের বৈদিক নাম “বসতীবরী”। এই দিবসের রাত্রিতে
যজমান জাগরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট নানা প্রকার
পুরাতন ইতিহাস ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন ;
সেই কারণেই এই দিনের নাম “উপবসথ।”

তাহার পরদিবসের নাম “সূত্যাদিবস।” তদ্বিনের
প্রাতে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া
এই দিবসের বৈধকার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন।
যথা—

প্রথমতঃ হবির্ধান শকট হইতে সোম* আহরণ করিয়া

* আমরা সোমলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক রহস্য
২য় ভাগের বেদ প্রস্তাবে লিখিয়াছি। তাহাই এক্ষণে কোন কোন
যশোলব্ধ ব্যক্তি অবিকল বা কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া প্রস্তাবান্তরে বা
গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট লিখিতেছি যে, সোমলতা
সম্বন্ধীয় যে সকল বৈদিক প্রমাণাদি আমাদের বেদ-প্রস্তাবে প্রকাশিত
হইয়াছে সে গুলি পূর্ব্ব ইউরোপীয় পণ্ডিত বা বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তির
গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই।

সোমলতা—যাহা এক্ষণে যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যবহার হয় তাহা *Asclepias*
acdia of *Rox-burgh* মিসেস ম্যানিং কহেন ইহা গাঁইট যুক্ত লতাবিশেষ

উপসব স্থলে স্থাপিত করা হয়। অধ্বর্যু অতি প্রত্যুষে উঠিয়া হোতাকে “প্রেষ-মন্ত্ৰে” উদ্বুদ্ধ করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক পাঠ করতঃ অশ্বিনী-কুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নিধ পুরোডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, উন্নৈতা সোম-পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন। *

অনন্তর হবির্ধান শকটের অক্ষ প্রদেশে দুই খানি ঐর্গ বস্ত্র অর্থাৎ মেঘ-লোম-রচিত কশ্বল, সোমরস শোধনের (ছাঁকিবার) জন্ত স্থাপন করা হয়। তাহার এক খানি প্রাদেশ পরিমাণ এবং দ্বিতীয় খানি অরত্নি-পরিমাণ।

অপিচ দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃণায় দ্রোণকলস স্থাপনা করা হয়। এবং উত্তর হবির্ধান শকটের উপরে অগ্নি দুইটি বৃহৎ কলস ; তাহার একটির নাম উপভূত এবং অপ-রটির নাম আধবনীয়। পুনরপি উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠময় চমস এবং মৃণ্ময় ৫টি ঘট রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত কার্য উন্নৈতাই করিয়া থাকেন।

এবং স্বগ্রন্থে ইহার এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে *Sarcostema viminatis* বলেন। ইহা “হাড়ঘোড়া” গাছের ঞায় ডাঁটা বিশিষ্ট এবং অল্প অল্প পত্রযুক্ত। ইহার পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেতবর্ণ এবং সুগন্ধযুক্ত। রক্তবর্ণ কহেন ইহার ডাঁটায় দুষ্ক নির্গত হয় এবং তাহার আশ্বাদ ঈষৎ অম্ল। ইহা পঞ্জাবের স্থান বিশেষে, বোলন পাশে, পুনা এবং চোল মণ্ডলে জন্মিয়া থাকে।

* সোম পাত্র দুই প্রকার। গ্রহ ও স্থালী। গ্রহ গুলি কাষ্ঠ-রচিত

অনন্তর অধ্বর্যুর অনুজ্ঞা ক্রমে যজমান, পত্নী এবং চম-
সাধ্বর্যু উল্লিখিত ঘটদ্বারা জল আহরণ করেন। পুরুষেরা যে
জল আনয়ন করে তাহার নাম “এক ধন” এবং পত্নী যাহা
আনয়ন করেন, তাহার নাম “পান্নেজন”। অধ্বর্যু সেই দুই
প্রকার জল পূর্বোক্ত বসতীবরী জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া
লন। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, এবং অধ্বর্যু, এই
কএকজন ঋত্বিক্ সেই সোমাভিষব ফলকের নিকটে উপবিষ্ট
হইয়া উপলখণ্ড (নোড়া) গ্রহণ পূর্বক অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ
করেন। অনন্তর অধ্বর্যু পাঁচ মুটো সোম সেই প্রস্তর ফলকে
স্থাপন করেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টি
সোম অংশু গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিসন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া
রাখেন, পরে সকলে একত্রিত হইয়া তাহার পেষণ করা হয়।
এই রূপে সোমরস নিষ্কাশন করার নাম সোমাভিষব, ইহা
দিনে তিনবার মাত্র করা হয়। প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের
নাম প্রাতঃ সবন, মধ্য মধ্যাহ্ন সবন, সায়ংকালে সায়ং সবন।
অভিসৃত সোমরস আত্মি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ
স্থাপিত থাকে। এই সোমাভিষব বোধক শ্রুতিতে প্রসঙ্গ
ক্রমে বা দৃষ্টান্ত বিষয় পুরুষ-পত্নীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।*

এবং স্থালীগুলি যুক্তিকা নির্মিত। এই দুই পাত্র ভিন্ন ভিন্ন আকারে
গঠিত করিবার বিধি আছে।

* “কস্মাত্ সত্যাত্ বয়ঃ পশূনাং হস্তাদানাঃ—পুরুষী হস্তী মর্কটঃ”

আহুতির উপযুক্ত সোমাভিষব সমাপ্ত হইলে, পুরোহিত-গণের দ্বারা তখন একটা মহাভিষব অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সোম পেষণ আরম্ভ করা হয় । প্রতি-প্রস্থাতা প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া পিষিতে থাকেন, অধ্বর্যু তাহাতে জলসিক্কন করিতে থাকেন । উত্তমরূপে পেষণ করা হইলে, তাহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন, অনন্তর তাহা বস্ত্রের দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয় । সেই রস ক্রমে “গ্রহ” “চমস” ও “কলসে” পূর্ণ করা হয়, নানা প্রকার মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয় ।

সোম-যাগের দেবতা—সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,* ইন্দ্রাগ্নি, মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র, তৃষ্ণু সহিত অগ্নিপত্নী স্তাহা বা অগ্নায়ী ।

এবম্প্রকার অনুষ্ঠানের পর পুরোহিতেরা এবং যজমান

ইতি । এই মন্ত্রে পুরুষের পশুত্ব উক্তি থাকায় এবং “ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ্য-মালমিত” এই ব্রাহ্মণবাক্যে স্পষ্টরূপে ব্রাহ্মণালভনের বিধি থাকায় এবং শুনঃ শেফ উপাখ্যানে পুরুষালভনের বর্ণনা থাকায়, পূর্বকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে ।

* প্রকৃত মাস দ্বাদশ এবং দুই প্রকার মলমাস ; এইরূপে ১৪ মাসের গণনা আছে । ইহার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক-সময়ে জ্যোতির্গণনাও উন্নত হইয়াছিল ।

সোমরস পানের পর আত্মাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন ।*
 পুরোহিতের ও যজমানের সোম-পান বিধানের প্রভেদ
 আছে । প্রভেদ এই যে, পুরোহিতেরা প্রত্যেক সবনেই
 অবশিষ্ট সোম পান করিতেন ; যজমান কেবল সায়ংসবনে
 পান করিতেন ।

যাগ সমাপ্ত হইলে যজমান পূর্বোল্লিখিত সদোমগুপে
 গিয়া পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দান করিতেন । অগ্নিষ্টোম
 যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ ক্রমে ১২০০ দ্বাদশ শত গাভী†, এবং
 সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেঘ, ছাগ, অন্ন, যব ও
 মাসকলায় দিবার বিধিও আছে ।

যে যে পুরোহিতকে যে যে প্রকারে দক্ষিণাদানের বিধি
 আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ।

ব্রহ্মাকে ১২টী (গাভী) কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি ।

উদগাতাকে	ঐ	ঐ
হোতাকে	ঐ	ঐ
অধ্বর্যুকে	ঐ	ঐ

* গোপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগ-গত দ্বিতীয় প্রপাঠকে উল্লেখ আছে,
 যে ব্যক্তি সঙ্কল্প অর্থাৎ “মাসূর্দন মচরন প্রানর্বাষাঃস্বাহা সীমং সম্ভা-
 পয়ামি” এই মন্ত্রার্থ স্মরণ রাখিয়া সোম পান করে, “নাস্য সীমং ক্লন্দতি”
 তাহার সোম ক্ষরিত হয় না । সোম-রস ভূমি-পতিত হইলে নাকি দোষ
 হইয়া থাকে ।

† অভাবে শত গাভী, তদভাবে মূল্য দেওয়ার বিধিও আছে ।

ব্রহ্মণাচ্ছংসীকে ৯টী (গাভী) ও কিক্কিংপরিমাণে সুবর্ণ
প্রভৃতি ।

প্রস্তোতাকে	ঐ	ঐ
মৈত্রাবরুণকে	ঐ	ঐ
প্রতিপ্রস্থাতাকে	ঐ	ঐ

পোতাকে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৬টী (গাভী) এবং কিক্কিং পরিমাণে
সুবর্ণ প্রভৃতি ।

প্রতিহর্তা'কে	ঐ	ঐ
অচ্ছাবাক'কে	ঐ	ঐ
নেষ্টা'কে	ঐ	ঐ

অগ্নিধ্র'কে, চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩টী (গাভী) ও
কিক্কিং পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি ।

সুব্রহ্মণ্য'কে	ঐ	ঐ
গ্রাবস্ত্বং'কে	ঐ	ঐ
উন্নৈতা'কে	ঐ	ঐ

অবশিষ্ট গো এবং হিরণ্যাদি অন্যান্য সাহায্যকারী
ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ চমসাধ্বর্য্যু ও সদশ্র প্রভৃতি'কে যথা-
শাস্ত্র বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে ।

এই সময়ে অন্যান্য প্রার্থী, অনাহৃত ব্রাহ্মণ, অন্ধ, পঙ্গু,
অনাথ প্রভৃতি দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি (শত্ৰু-
সারে) বিতরণ করা হয় ।

যজ্ঞ সমাপ্তির পর আর একটি কার্য করিতে হয় ; তাহার নাম অবভৃথ স্নান । এই স্নান-কার্য্যটী মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হয় । পুরোহিত, বন্ধু, বান্ধব, সূত্রং এবং তাঁহাদের পত্নী-বর্গ, সকলে সমবেত হইয়া যজমানকে লইয়া স্নানার্থ কোন এক মহানদীতে, অভাবে পুণ্যজলাশয়ে গমন করিতে থাকেন । গমনকালে প্রস্তোতা নামক পুরোহিত অগ্রে অগ্রে সামগান করিতে করিতে যান, আর যজমান প্রভৃতি পুরুষেরা এবং তৎপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার নিধন বাক্য গাইতে থাকেন* । জল-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে অগ্রে একটা হোম করা হয়, পরে মহাসমারোহের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন । এই অবভৃথ স্নানটী সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অঙ্গ । এই স্নানে নাকি ব্রহ্মহত্যাदि সমস্ত পাপ অপনীত হইয়া থাকে ।

ঋক্সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ বেদশাস্ত্রের সাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়া এই সোমযাগ প্রস্তাবটী প্রকাশ করা গেল । বস্তুতঃ প্রত্যেক শাখাধ্যায়িদিগের সোমযাগানুষ্ঠান বিষয়ে কোন কোন অংশে বিশেষ ভাব আছে তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণ বোধায়নী অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি এবং সাম-

* গানের প্রত্যেক পর্যায়ে যেটী সমানরূপে গীত হয়, সামগানের সেই ভাগকে নিধন বলে । বর্তমানকালিক লৌকিক গানের “ধূয়া” তাহারই পরিণাম বা অনুকরণ । ইংরাজিতে ইহার নাম “কোরস্” ।

বেদীয় অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ।

অপিচ এই প্রবন্ধ বিমলভট্টের পুত্র ভট্ট ষষ্ঠেশ্বরের বিরচিত গ্রন্থ, গোপথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যাপক হৌগ প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিবিধ অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি, এবং ইংরাজী মিসেস্ ম্যানিং কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল ।

আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র ।

আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-
ছিলেন, তখন তাঁহাদের যে সমূহ উন্নতি হইয়াছিল এবং,
কি শিল্প, কি যুদ্ধ, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই যে তাঁহারা
পারদর্শী ছিলেন, তাহা আর্য্য শাস্ত্র দেখিলেই অনুভূত
হয়। তাঁহারা সর্বদা যাগ যজ্ঞ জপ হোমাদি পারলৌকিক
কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই অমনি
লৌহময় কবচে আবৃত-সর্বাস্ত্র হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ
পূর্ব্বক শত্রু জয়ার্থ বহির্গত হইতেন। সৈন্ত, সেনাপতি,
ইষু, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, রথ, সারথি, ইত্যাদি বহু সংগ্রামিক
শব্দ ঋগ্বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালেও যুদ্ধবিদ্যার
উৎকর্ষ ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রামা-
য়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে এই বিদ্যার সমধিক উন্নতি
হইয়াছিল। রামায়ণাদি গ্রন্থে যে সকল যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ
দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে কাল-কবলে কবলিত হইয়াছে। সে
সকল যে কি রূপ ছিল, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায়

নাই। ধনুর্বেদ, শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন-নীতি, অগ্নিপুৰাণ, কামন্দক প্রভৃতি প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থের দ্বারা এক্ষণে কতিপয়মাত্র অস্ত্রের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ আমোদ আছে বলিয়া অদ্য আমরা সেই লুপ্ত যুদ্ধাস্ত্রের স্বরূপাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

ধনু, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রঘণ, তোমর, নলিকা, (নাল, নালিক, এই দুই নামও আছে,) লণ্ড, পাশ, চক্র, দত্তকণ্টক, ভূমুণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লবিত্র, স্থগ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদগর, সীর, মুসল, পট্টিশ, পরিষ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু-অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্থাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ, জন্তুণ, প্রভৃতি শত শত অস্ত্রের নাম শুনা যায়, কিন্তু তত্তাবতের আকার প্রকার ও ব্যবহার প্রণালী কিছুই জানা যায় না। যাহা জানা যায়, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনু,—এটি অস্ত্র নহে, ইহা অস্ত্রক্ষেপক যন্ত্র। ইহার বৃত্তান্ত ধনুর্বেদ-নামক স্ততন্ত্র প্রস্তাবে বলা যাইবে।

ইষু—ইহা একটি ধনুঃক্ষেপ্য অস্ত্রের সাধারণ নাম। যাহা তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাহাই ইষু। ইহার বাণ, শর, খগ ও

সায়ক প্রভৃতি অনেক নাম আছে । পূর্ব্বকার লেখা দেখিলে জানা যায় যে, ইহা ৪০০ হস্ত পরিমাণ দূরে সবেগে যাইত । “নল্লমাত্রগতিস্তু সঃ ।” নীতি প্র-৪ অ] বাণের ৪০০ হাত গতি হওয়া বড় সহজ নহে ; অনেক বন্দুকের গতিও ৪০০ হাত হয় কি না সন্দেহ । শাস্ত্রধর লিখিয়াছেন যে, শিক্কার সময় ৬০ ধনু, ৪০ ধনু, অথবা ২০ ধনু পরিমিত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবেক । যথা—

“ষষ্টিঘন্বনরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

চত্বারিংশন্মধ্যমস্ত্র বিশতিস্ব কনিষ্ঠকম্ ।”

ভিন্দীপাল—ইহা এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র । ইহার আকার কিরূপ ? তাহা এক্ষণে বোধগম্য হইবার নহে । বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে ইহার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যে একটি কবিতা আছে, তাহা এই—

“মিচ্ছিবালস্তু বক্রাঙ্গী নম্রশীর্ষোহৃহচ্ছিরাঃ ।

হল্লমাত্রীত্বেষ্যযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ ॥”

‘ভিণ্ডিবাল, ‘ভিন্দিবাল, ‘ভিন্দিপাল, এই তিন পাঠই দৃষ্ট হয় । ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটি বাঁকা, মাথাটি নোয়ান, মস্তকটি যেমন নম্র তেমনি শরীর অপেক্ষা বৃহৎ । ইহার উচ্চতা এক হস্ত অর্থাৎ হস্তপরিমিত লম্বা এবং করপরিমিত অর্থাৎ মুঠা করিয়া ধরা যায় এরূপ ভাবের গোল গঠন । এই বর্ণনার দ্বারা অনুভব হয় যে,

ভিন্দিপাল অষ্টটী আধুনিক সোঁটার গায় হইলেও হইতে পারে । এই শত্রুঘাতী আয়ুধকে পদাদি সৈন্তেরাই ব্যবহার করিত । অন্যান্য তিনবার ঘুরাইয়া ইহাকে ছুড়িয়া ফেলিতে হয় । যথা—

“ত্রিধামণ্যং বিসর্গস্ব বাসপাদপুরঃসরম্ ।

পাদবাতাত্ রিপুহনীধার্য্যঃ পাদাতমঙ্গুলৈঃ” ॥

অগ্নিপূরণোক্ত ধনুর্কোদে ভিন্দিপাল ব্যবহারের প্রণালী ইহা অপেক্ষা অন্য রূপে লিখিত হইয়াছে । যথা—

“সংশ্রান্তমথ বিশ্রান্তং গীবিসর্গং সুদুর্ধরম্ ।

মিন্দিপালস্য কৰ্ম্মাণি লগুডস্য চ তান্যসপি ॥”

শক্তি—এই অস্ত্রের আকার সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাও লিখিতেছি ।

“শক্তির্হস্তব্রযীত্বেষা তিথ্যক্ গতিরনাকুলা ।

তীক্ষ্ণজিক্ণীঘনখরা ঘণ্টানাভয়ঙ্করী ॥

ব্যাদিতাস্যাতিনীলা চ শত্রুশোণিতরঞ্জিতা ।

অস্ত্রমালাপরিচ্ছিন্না সিংহাস্যা ঘোরদর্শনা ॥

বৃহৎসূর্য্যগমা পর্বতেন্দ্রবিদারিণী ।

ভুজদ্বয়প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয়বিধায়িনী ॥”

এ বর্ণনা দেখিয়া শক্তির প্রকৃত গঠন বা আকার স্থির করা যায় না । এক্ষণে আমরা যেরূপ ভাবের সংস্কৃত অবগত

আছি, তদনুরূপ প্রথায় ইহার বঙ্গানুবাদ করিলাম ; যদি কেহ পারেন ত বুঝিয়া লইবেন ।

শক্তি অনধিক দুই হাত লম্বা । সিংহের গায় মুখ । জিহ্বা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ । নখর আছে, তাহাও তীক্ষ্ণ । ২২সক অর্থাৎ ধরিবার মুট্ বা স্থানটী বৃহৎ । দেখিতে অতি ভীষণ, ঘণ্টানাদের দ্বারা ভয় জনক, শত্রুরক্তে রঞ্জিতাঙ্গ, অস্ত্রজালে বিজড়িত, গাড় নীলবর্ণ, অত্যন্ত দূরগামিনী, তির্যক্-গতিযুক্ত, এবং পর্বতেন্দ্রে হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সক্ষম, যুদ্ধে জয়দায়িনী, এতদ্রূপিনী শক্তিকে দুই হস্তে উঠাইয়া প্রেরণ করিতে হয় ।

এই ঘোররূপিনী শক্তি ছয় প্রকার মার্গ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রিত । প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন, দ্বিতীয় ভ্রামণ, অর্থাৎ ঘুরাণ, তৃতীয় বল্গন অর্থাৎ আশ্ফালন, চতুর্থ নামন অর্থাৎ উর্দ্ধে আশ্ফালিত করিয়া নীচুবাগে ধরা, পঞ্চম মোচন অর্থাৎ লক্ষ্যোপরি নিক্ষেপ, ষষ্ঠ ভেদন অর্থাৎ লক্ষ্যের অঙ্গ ভেদ । এই ছয় প্রকার শক্তিকার্য্য বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদেও লিখিত আছে । যথা—

“তীলনং ভ্রামণম্ভৈব বল্গনং নামনং তথা ।

মোচনং ভেদনম্ভৈব চন্দ্রমাগাঃ শক্তিসংস্রিতাঃ ॥”

দ্রুঘণ—এই অস্ত্রটী দুই প্রকার । দ্রু ঘণ বলিলে সাধারণতঃ মুদগর বিশেষ বুঝায়, কিন্তু বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের বচন

পর্যালোচনা করিলে ইহা এক প্রকার পরশু অর্থাৎ টান্ধী বা কুঠারাস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হয় । যথা—

“দ্রুঘণক্কায়ায়মাক্কাঃ স্যাৎ বক্রগ্ৰীবীহৃহচ্ছিরাঃ ।

পঞ্চাশৎকুলীতসেধী মুষ্টিসম্মিতমণ্ডলঃ ॥”

দ্রুঘণ অস্ত্রটী লৌহময়, ইহার গ্রীবাস্থানটী বাঁকা, শীর্ষ স্থান প্রশস্ত, ৫০ অঙ্গুল উচ্চ অর্থাৎ লম্বা, এবং মুষ্টিপরিমিত মণ্ডল অর্থাৎ গোল । এই দ্রুঘণ অস্ত্রের চারি প্রকার ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে । যথা—

“ভল্লামনং প্রপাতস্ব স্ফোটনং দারণং তথা ।

চল্যর্থ্যৈতানি দ্রুঘণে বল্গিতানি শ্রিতানি বৈ ॥”

উর্দ্ধে উঠান, প্রপাতন (ফেলিয়া মারা), স্ফোটন অর্থাৎ ফুটান, এবং দারণ অর্থাৎ বিদীর্ণীকরণ । এই চারি প্রকার কার্য্য দ্রুঘণের আশ্রিত ।

তোমার—এই তোমরাস্ত্র সম্বন্ধে তিন প্রকার উল্লেখ দেখা যায় । বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্বেদ অনুসারে ইহা এক প্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠদণ্ডযুক্ত তীর । শাঙ্গ ধরসংগৃহীত ধনুর্বেদের মতে ফলবিশিষ্ট শলাকাকার লৌহতীর এবং অগ্নি-পুরাণোক্ত ধনুর্বেদের মতে সরলপক্ষযুক্ত তীর । ফল সকল মতেই ইহা ধনুঃক্ষেপ্য তীরই হইতেছে । ইহার আকার সম্বন্ধে প্রথমোক্ত ধনুর্বেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

“তোমরঃ কাষ্ঠকাযঃ স্যাৎ লৌহশীর্ষঃ সুপুচ্ছবান্ ।

হস্তত্রয়োন্নতাক্ষঃ রক্তবর্ণঃ স্তবক্রাগঃ ॥”

তোমরের শরীরটি কাষ্ঠনির্মিত, তাহার শীর্ষক অর্থাৎ ফলা লৌহময়, হস্তত্রয়পরিমাণ লম্বা, রক্তবর্ণ ও পুচ্ছধারী । ইহার গতি অবক্র অর্থাৎ সরল । এই মর্শ্ব বজায় রাখিয়া শাস্ত্রধর একটা অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন । যথা—

“ক্ষণবৎ শীর্ষদেহঃ স্যাত্তোমরমল্লয়ায়মল্লয়া ।”

অর্থাৎ ফনিফণাকার ফলাযুক্ত লৌহতীরের নাম তোমর । অগ্নিপূরণোক্ত ধনুর্বেদে ইহার আকার বা গঠন ভঙ্গী লিখিত হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়াগুলি সমস্তই লিখিত হইয়াছে । যথা—

“দৃষ্টিঘাতং ভূজাঘাতং পার্শ্বঘাতং দ্বিজীতম ।

কৃজপল্লেষুড়া পাতং তোমরস্য প্রকীর্তিতম্ ॥”

বৈশম্পায়ন মুনির লিখিত তোমরাস্ত্রের কার্য্যও তিন প্রকার । যথা—

“ভদ্বানং বিনিযুক্তিস্থ বেধনম্বেতি তত্রিকম্ ।

বলংগিতং শস্ত্রতচ্ছিন্নাঃ কথয়ন্তি নরাধিপাঃ ॥”

শস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ রাজারা বলেন যে, তোমরের তিন প্রকার কার্য্য । প্রথমে উদ্ধান (উদ্ধীকরণ), দ্বিতীয় বিনিযুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তৃতীয় বেধন অর্থাৎ লক্ষ্যশরীরের ছিদ্রীকরণ ।

নলিকা।—এই অস্ত্রের নলিকা, নালীক, নাল, এই তিনটী নাম আছে। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্বেদ, অশ্বরাচার্য্য শুক্রে ঋষির নীতিশাস্ত্র, শাস্ত্রধর-সংগৃহীত ধনুর্বেদ ও বীর-চিন্তামণি প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে ইহার বিস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্বেদের মধ্যেও ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনেক স্থানেই এই নালিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে,* রামায়ণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়†; তাহাতে লিখিত আছে যে, পূর্বে অশ্বরেরা এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের আকার প্রকারের সহিত বড় অধিক ভিন্নতা থাকে না। যথা—

“নলিকা ऋजुर्देहा स्यात् तन्वङ्गी मध्यरन्ধ্রিকা ।

মর্মচ্ছ্দিদকরী নীলা— ॥”

[বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ ।] ‡

* বনপর্ব প্রভৃতি প্রত্যেক পর্বেই “তলী নালোকনারাচীঃ” ইত্যাদি প্রকার পাঠ আছে। এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণদিগ্বিজয়বর্ণনাস্থলে “নালীকী স্নাভ্যামাস” এইরূপ উল্লেখ আছে।

† ইহা নীতিপ্রকাশিকার এক অংশ। মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকায় যে ধনুর্বেদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থলে তদুক্ত ধনুর্বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তর গণ্টেভ্‌ওপাট মহোদয় উল্লিখিত গ্রন্থখানি অতিপরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত করিয়া আর্য্যসমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। তাহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা কতিপয় বৈদিকপ্রমাণ গ্রহণ করিলাম।

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ গোজা ও সরু (নলের ঞ্চার গঠন বলিয়া নলিকা) । ইহার মধ্যে রন্ধ্র আছে, বর্ণ কাল, এবং ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা তীরের ঞ্চার সবেগে প্রেরিত হইয়া শত্রুর মর্শ্বচ্ছেদ করিয়া থাকে । এই বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা এক প্রকার বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে । ইহার ক্রিয়া পর্যালোচনা করিলেও বন্দুক বলিয়া প্রতীত হইবে । যথা—

“গ্রহণং ধ্বাপনং চৈব স্মৃতস্ত্রীতি গতিত্রয়ম্ ।

নামাস্মিতং বিদিত্বা তু জীতাসন্নান্ বিদুন্ যুধি ॥”

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্বাপন অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করণ, পশ্চাৎ স্মৃত অর্থাৎ বিদ্রকরণ । এই ত্রিবিধক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকে অনায়াসে জয় করা যায় ।

শাস্ত্র ধর-সংগৃহীত ধনুর্বেদে ইহাকে নালীক-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহাও এই নলিকা বা বন্দুক ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়াই বোধ হয় । যথা—

“নালীকা লঘবীবাণা নলযন্ত্রীণা নীহিতাঃ ।

অত্যুচ্চদ রপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥”

নালীক বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু । এই লঘু-নালীক-নামক বাণ নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় । ইহা উচ্চ ও দূরলক্ষ্য স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বা প্রশস্ত ।

কোন কোন পুস্তকে “লঘবঃ শাণা নলয়ন্নে” এইরূপ পাঠ আছে । এই পাঠ গ্রাহ্য করিলে ও ব্যাখ্যা করিলে, শাণা-গ্নির দ্বারা ছুড়িতে হয়, এই অর্থও পাওয়া যায় ; সুতরাং শাস্ত্রধরের নালিকাস্ত্র আর বন্দুক এক বস্তু বলিয়া গ্রাহ্য ।

এই নালিকাস্ত্রের বৈদিক নাম “সূর্য্যী” । তৎকালের অসুরেরা সূর্য্যী লইয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিত । অনেক বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্টান্তবিধায় ইহার উল্লেখ আছে । আধুনিক কোষগ্রন্থে “সূর্য্যী” শব্দটী লৌহ-প্রতিমূর্ত্তি অর্থে নিবিষ্ট দেখা যায় ; কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে উহা লৌহ-সুণা বা সুণাকার যন্ত্রবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । (তান্ত্রিকদিগের মতে প্রতিমা ও যন্ত্র, এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন ; অর্থাৎ তাঁহারা পূজার আধারকে যন্ত্র বলেন, প্রতিমাও বলেন ; সুতরাং সূর্য্যী শব্দটী লৌহযন্ত্র-অর্থে ব্যবহার করা অসঙ্গত নহে) ।

কৃষ্ণযজুর্বেদে (১ । ৫ । ৬ । ৭) সূর্য্যী শব্দ আছে, তাহার ভট্টভাষ্করকৃত ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, পূর্বে এ দেশের অসুরেরা ও দেবতারা এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করিতেন । সে বন্দুক এখনকার মত আকার বিশিষ্ট নহে ; অগ্ৰ এক সামান্য আকার বিশিষ্ট । যথা—

“एषा वै सूर्या कर्णकावत्येतया ह स्त वै देवा असुराणां मृततर्हा

সংহন্তি যদেতয়া সমিধসাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানী
ভাটব্যায় প্রহরতি ।”

[কৃষ্ণযজুর্বেদ ১।৫।৬।৭। দেখ]

অত্র ভাষ্য—“জলন্তী লৌহময়ী স্মূণা সূর্মী । গৌরাঢ়ি-
ত্বাৎ ভীষ । কর্ণকাবতী অন্তঃসুধিরবতী অন্তর্জ্বলন্তী চেত্যর্থঃ ।
সাংহিতকং দৌর্ঘলম্ । তত্‌সদৃশা কৃগিত্যর্থঃ । দেবা এতয়া অসুরাণাং
মধ্যে শততর্হান্ একপ্রহারেণ শতস্য হন্তুন্ । তংহন্তি ঘ্নন্তি স্ম ।
তচ্ছ হিংসায়াং রৌধাটিকঃ । তস্মাদেতয়া কৃচা সমিধসাদধানী
যজমানঃ বজ্রং ইন্দ্রায়ুধসদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্বাং সূর্মীং ভাট-
ব্যায় শত্রুবে প্রহিণোতি ।”

এস্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ—

জলন্তী লৌহময়ী স্মূণা সূর্মী । সা চ কর্ণকাবতী হিঙ্গবতী ।
অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ । তত্‌সমানৈয়মৃক্ । একেন প্রহারেণ শতসং-
খ্যাকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ । অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্
(সূর্মীযোদ্ধান্) এতয়া কৃচা দেবা হিংসন্তি । অন্যথা সমিধা-
ধানেন শতঘ্নীমেনাং কৃচং বজ্রং কৃत्वा বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি ।”

অর্থ এই যে, সেই লৌহময়ী স্মূণা,—যাহার অভ্যন্তরে
ছিদ্র,—তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন,—যাহা বহিরাগত হয়
তাহাও জ্বলন্ত । এই ঋক্ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জ্বলন্ত
স্মূণার আয় জানিবে । অসুরগণের মধ্যে যাহারা স্মূর্মীর
দ্বারা যুদ্ধ করে,—এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে,—

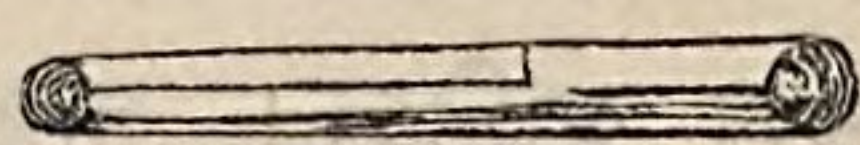
দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্ মন্ত্র সেই শতঘ্নী-বজ্রের বা সূর্য্যীর তুল্য। যে যজমান অর্থাৎ যে যজ্ঞ-কর্তা, এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতিদান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শতশত্রুনাশক বজ্র বা সূর্য্যী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহার প্রহার করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন অথর্ববেদের (১। ১৬। ৩। ৪।) এক স্থলে একটী উদাহরণ আছে, তাহাতে সীসক-দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। যথা—

“সীসায়াধ্যাহ বহুণঃ সীসায়াগ্নিরূপাবতি ।

সীসং ম হুন্দ্রঃ প্রাযচ্ছত্ তদহু যাতু চাতনম্ ।

যদি নী গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্ ।

তং হুলা সীসেন বিধ্যামি যথা নীঃসী অবীরহা ।”

এখন বিবেচনা করুন, লৌহনির্মিত সূর্য্যী অর্থাৎ লম্বা খোঁটা, তাহার মধ্যে সূর্য্যির বা রক্ত, তাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহিরাগত হয়, তাহা আবার এক কালে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসকের দ্বারা শত্রু বিনাশ। এরূপ বর্ণনার দ্বারা বন্দুক বা কামান ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? এই বর্ণনা দেখিয়া যদি সূর্য্যী বা নালিকাস্ত্রের আকার কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে,  এইরূপ আকার হয় কি, না দেখুন। ঐরূপ আকার দেখিলে বন্দুক

ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে ? অতএব বোধ হয়, এই
স্বর্শ্বী বা নালিকাস্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষেই আধুনিক বন্দুক ও
কামান হইয়াছে ; সুতরাং বন্দুককে বা কামানকে সম্পূর্ণরূপে
নবাবিস্কৃত বলা যায় না। ইহা যে কত পুরাতন—তাহা
নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেননা, অশ্বরথের মহর্ষি শুক্র এই
নালিকাস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা
দেখিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। কোন রূপ কল্পনা
করিতেও হয় না। বৈদিক গ্রন্থের ও ধনুর্বেদের বচনাবলি
তত স্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক অনুমানের বা কল্পনার সাহায্য
লইতে হয়, কিন্তু শুক্রনীতির বচনাবলি দেখিলে আর কিছুই
করিতে হয় না। যথা—

“অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্নিকং তথা ।

যদা তু মান্নিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহত্শুদ্রবিভেদনঃ ।

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্ ॥

মূলাংপ্রথীর্লচ্ছ্যভেদি-তিলবিন্দুযুতং সদা ।

যন্তাঘাতাশ্মিকত্যাঘচূর্ণধৃক্ কণ্ঠমূলকম্ ॥

সুকাষ্ঠীপাঙ্গবৃদ্ধমধ্যাকুলবিলান্তরম্ ।

স্বাক্ষীঃশ্মিচূর্ণসম্বাট-শলাকাসংযুতং বৃহৎ ॥

লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্য পতিসাতিभिঃ ।

যথা যথা তু লক্ষ্মারং যথা সুলবিলান্তরম্ ॥

যথাদীর্ঘং বৃহৎ গীলং দূরমেদি তথা তথা ।

মূলকীলধমাক্ষদ্য-সমসম্বানভাজি যত্ ॥

বৃহন্নালিকসংজ্ঞানত্ কাষ্ঠতুণ্ণবিবর্জিতম্ ।

প্রবাক্ষ্যং শকটাদৈশ্চ সুযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥”

[শুক্রনীতি ৪ । ৩ ।

অমরগুরু উশনার নীতিশাস্ত্র,—যাহার উল্লেখ মহাভার-
তেও আছে,—তাহার ৪ অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে নালিকাস্ত্রের
উত্তম রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় । অমরাচার্য্য শুক্র বলিতেছেন
যে, যুদ্ধাস্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার । নালিক ও মাস্তিক ।
যাহাদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিষ্ক্ষেপ করিতে হয়, তাহারা
মাস্তিক । মাস্তিকাস্ত্র না থাকিলে নালিকাস্ত্র ব্যবহার করি-
বেক । নালিকাস্ত্র কি রূপ ? তাহা বলা যাইতেছে । নালিক
দুই প্রকার । এক বৃহন্নালিক, অপর লঘু বা ক্ষুদ্রনালিক ।
লঘুনালিকের লক্ষণ এই রূপ ;—পঞ্চ-বিতস্তি-পরিমাণ
(৪ হাত লম্বা) একটী নাল বা নল (লৌহনির্ম্মিত), তাহার
মূলে তিষ্ঠ্যক্ দিকে (আড়ভাবে) একটী ছিদ্র, মূল হইতে
উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃস্থির (গর্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য
ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত
পাইবা মাত্র অগ্নি নির্গত হয় এরূপ প্রস্তুতকৃত যুক্ত, সেই
স্থানে অগ্নি চূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ,

উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুদ্ধ অর্থাৎ ধরিবার মুট,—এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ভের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ তর্জনী-নামক অঙ্গুলিটী প্রবেশ করিতে পারে এরূপ গর্ভ,—তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা;—এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক । এই লঘুনালিক পদাতি সৈন্য ও অশ্বরোহী সৈন্তেরাই ব্যবহার করিবেন ।

শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত নালিকাস্ত্রের এতদ্রূপ বর্ণনা দেখিলে সাবেক বন্দুকের আকার মনে আইসে কি, না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । পূর্বকালের বন্দুক আর অতি-পূর্বকালের লঘুনালিক এবং এক্ষণকার কামান আর অতি-পূর্বকালের বৃহন্নালিক সমান । মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে তিনটা শ্লোকের দ্বারা বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক কামান ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না । যথা—

উক্ত নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে ; তাহার গর্ভ যত স্থূল (মোটা) হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে,—সে ততই দূরভেদী হইবে । তাহার মূলদেশে কীলক, এবং কাষ্ঠ বুদ্ধ অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতির দ্বারা তাহা বাহিত হয় । ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয় । ইহার নাম বৃহন্নালিক ।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, শুক্রাচার্য্যের এই বৃহন্নালিক আর এক্ষণকার কামান সমান কি না। অপিচ, নালান্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে উহাকে আধুনিক বন্দুক ও কামান না বলিয়া থাকা যায় না। যথা,—

“নালান্ত্রং শীঘ্রমিদাদৌ দদ্যাত্ত্রাগ্নিচূর্ণকম্ ।

নিবেশয়েনু দৃষ্টেন নালমূলে যথাবদম্ ॥

ততঃ সুগীলকং দদ্যাত্ ততঃ কর্ণেঃগ্নিচূর্ণকম্ ।

যন্তচূর্ণাগ্নিদানেন গীলং লক্ষ্যে নিপাতয়েত্ ॥

লক্ষ্যমিদৌ যথা বাণী ধনুর্জ্যাবিনিয়োজিতঃ ।

ভবেত্তথা তু সম্বায——— ॥” ইत्याদি ।

প্রথমে নালান্ত্রের সংশোধন করিবেক। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবেক। অনন্তর দণ্ডের দ্বারা সেই প্রদত্ত বারুদকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবেক। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা প্রদান করিবেক। অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্তপ্রস্তরাগ্নি সংযোগপূর্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকে লক্ষ্য স্থানে পাতিত করিবেক।

উল্লিখিত অগ্নিচূর্ণ যে, “বারুদ” তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, কিরূপে অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়,

কিরূপে বা গুলি প্রস্তুত করিতে হয়, মহর্ষি তাহাও বলি-
য়াছেন । সে সকল দেখিলে নালাস্ত্রকে বন্দুক এবং অগ্নি-
চূর্ণকে “ বারুদ ” না বলিয়া থাকা যায় না । যথা—

“সুবর্চিলবণাত্ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্ ।
অন্তধূমবিপক্কার্কসুহ্মাদ্যঙ্গারতঃ পলম্ ॥
শুদ্ধাত্ সংগৃহ্য সম্বূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ ।
স্নেহকাণাং রসীনস্য শীঘ্ৰেদাতপেন চ ॥
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং সবেত্ খলু ॥”

প্রকারান্তরম্ ।

“সুবর্চিলবণাত্ ভাগা ষড়্ বা চল্লার এব বা ।
নালাস্ত্রার্থাগ্নিচূর্ণে তু গন্ধাঙ্গারৌ তু পূর্ববৎ ॥”

প্রকারান্তরম্ ।

“অঙ্গারস্যৈব গন্ধস্য সুবর্চিলবণস্য চ ।
শিলায়া হরিतालस्य तथा सीसमलस्य च ॥
हिङ्गुलस्य तथा कान्तरजसः कपूरस्य च ।
जतीनील्याश्च सरल-निर्यासस्य तथैव च ॥
समन्यनाधिकैरंशै-रগ্নিचूर्णान्यनेकशः ।
कल्पयन्ति च तद्विद्याश्चन्द्रिकाभादिमन्ति च ॥”

ইহার অর্থ এই যে, সুবর্চিলবণ অর্থাৎ সোয়ারা ৫ পল,

গন্ধক ১ পল, অন্তধূমবিপক স্নুহী অঙ্গার অথবা অর্কাদ্ভার* ১ পল সংশোধন পূর্বক পৃথক পৃথক চূর্ণ করিবেক । পশ্চাৎ একত্রিত করিয়া তাহা একরূপ ভাবে পেষণ করিবেক, যেন পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায় । অনন্তর সেই চূর্ণে, সিজ বৃক্ষের আটা বা রস, আকন্দের আটা বা রস ও রসুনের রস দিয়া পেষণ করিবেক । অনন্তর তাহাকে রৌদ্রশুক করিয়া পুনর্বার পেষণ করিবেক । পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার গ্ৰায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবেক ।

দ্বিতীয় প্রকার ।

গন্ধক ও পূর্বোক্ত প্রকারের অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সুবর্চি লবণ অর্থাৎ সোয়ারা মিশ্রিত করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নালাস্তের নিমিত্ত অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবেক ।

তৃতীয় প্রকার ।

তৃতীয় বিধিতে বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার, গন্ধক,

* সিজ বৃক্ষের নাম স্নুহী । আকন্দের নাম অর্ক । সিজ-বৃক্ষের কাষ্ঠ কিংবা আকন্দ কাষ্ঠ অথবা তদ্রূপ হাল্কা অথবা কোন কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায়, একরূপভাবে তাহাকে নির্বাচিত করিবে । কোন দ্রব্যের দ্বারা ঢাকিয়া দিলেই অঙ্গারগুলি অন্তধূম বিপক হইবে ।

সোয়ারা, মন্‌ছাল, হরিতাল, সীসকের মল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কপূর, জতু বা গালা, নীলী, ধুনা, এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সমভাগে, কোন কোন দ্রব্য অল্প ভাগে এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করণে পণ্ডিত, তাহারা উল্লিখিত দ্রব্যের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আভাযুক্ত বা নানাবর্ণের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন । *

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অগ্নিচূর্ণ আর বারুদ, একই বস্তু কি না। গোলা ও গুলিকা প্রস্তুত করণের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে তাহাও বলিতেছি ।

“গীলীলীহমযী গৰ্ভধুটিকঃ কীবলীঃপি বা ।

সীসস্য লঘুনালার্থ্যে হ্যন্যধাতুমবীঃপি বা ॥

লীহসারমযং বাপি নালাস্ত্রং লন্যধাতুজম্ ।

নিত্যসম্মার্জন স্বচ্ছ— ॥”

ইহার অর্থ এই যে, বৃহৎ নালিকের জন্ত লৌহের গোল প্রস্তুত করিবেক। তাহা সগৰ্ভ অথবা কেবল অর্থাৎ নিরেট্

* এই বিধি অনুসারে রঙ্‌দার আলোক ও বারুদ প্রস্তুত হয়। অঙ্গারের ভাগ না দিলেই তাহা উত্তম আলোক প্রস্তুত হইবে ।

উভয়বিধই করিবেক। সগর্ভ গোলের গর্ভে ক্ষুদ্রগুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা যাইতে পারে। আর লঘু নালিকের জন্ত সীসকের কি অন্য কোন ধাতুর দ্বারা নালছিদের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তুত করিবেক। নালাস্ত্র গুলি লোহসার দ্বারা কি অন্য কোন কঠিন ধাতুর দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করা আকর্শক।* দানবগুরু শুক্রাচার্যের নালিকাস্ত্র যখন ব্যাসের মহাভারতে

* এই সকল দেখিয়াও হয়ত অনেকের মনে ইহার পুৰাণত্বে বিশ্বাস হইবে না। সে জন্ত নিম্নে আরও কএকটি প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধশাস্ত্রধরকৃত বীরচিন্তামণিগ্রন্থে এই নালিক অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণিত আছে। যথা—

“নালিকা লঘবীবাণা নলয়ন্ত্রেণ নীদিনাঃ ।

অত্যুচ্চদূরপাতিষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥”

লঘুনালিক বাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা বিনিষ্কিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চস্থ ও দূরস্থ লক্ষ্যের ও দুর্গযুদ্ধের উপযুক্ত।

মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে লিখিত আছে। বনপর্বায় হিরণ্যপুর ধ্বংস প্রকরণে “নালিক” এই বিস্পষ্ট নাম আছে। যথা—

“নতীনালীকনারা চৈর্মল্লৈঃ শত্রুহিঁতীমরৈঃ ।

প্রত্যগ্নন্ দানবিন্দ্ৰা মাং ক্রুদ্ধাস্তীৱপরাক্রমাঃ ॥”

অর্জুন বলিলেন হে রাজন্ ! পরে সেই হিরণ্যপুরবাসী প্রভূতপরাক্রম ক্রুদ্ধ দানবেরা আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টী ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আহত করিতে লাগিল।

আছে, তখন ইহা কখনই আধুনিক নহে । মহাভারতের অন্য স্থানে এই নালিকাস্ত্র “অয়ঃকণপ ” ও “কণপ” নামে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হয় ; যথা—

“অয়ঃকণপ-চক্রাশ্ম-ভূষণদ্যুতবাহবঃ ।

দ্রুণপাথৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসম্মুচ্ছিতৌজসঃ ॥”

আদি পর্ব ২২৫, ২৫ ।

টীকাকার নীলকণ্ঠভট্ট এই “অয়ঃকণপ ” শব্দকে নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তল্লিখিত ব্যুৎপত্তি এই রূপ—

“অয়ঃ কণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তত্ তথা বিধং লৌহময়ং যন্ত যেন আগ্নেয়ৌষধবলেণ গর্ভসম্মৃতা লৌহগুলিকাঃ দ্বিষন্তে ।”

এতদ্ভিন্ন রামায়ণেও এই নালিকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—

“নালীকৈস্তাড়য়ামাস ।”

[উত্তরকাণ্ড, রাবণের দিগ্বিজয় ।]

এ সকল আলোচনা করিলে, বন্দুকের পূর্বাস্তিত্ব পক্ষে বুদ্ধির গতি উপস্থিত হয় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন । বীরচিন্তামণি, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, শুক্রনীতি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে যখন নালিকাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তখন আর ইহাকে কি বলিয়া আধুনিক

বলিতে পারি ? এ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুরাকালে ইহা সকলে জানিত না । দেবতারা ও প্রধান প্রধান আচার্য্যেরা উক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করায় কোন বিশেষরূপ পুরুষত্ব নাই বলিয়া এবং কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন । ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষিকে স্বকৃত ধনুর্ভেদের ৫ অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখা যায় । যথা—

“যন্তাণি লৌহসৌমানা গুলিকাক্ষেপকাণি চ ।

নথা স্ত্রীপলযন্তাণি ক্ত্রিমান্যপরাণি চ ॥

কূটযুদ্ধমহাযানি মবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ ।

অধম্ম'বৃদ্ধ্যা চৈতানি মবিষ্যন্ত্যনরোত্তরম্ ॥”

হে মহারাজ জনমেজয় ! কলিকালের পৌরুষহীন অধা-
র্শ্বিক রাজাদিগের সময় মদুত্ত গুলিকাক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তুত-
ক্ষেপক যন্ত্র, এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূট যুদ্ধের
উপকরণ হইবে । যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক
কূটযুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রহরণের আশ্রয় লইবেক ।

পূর্বকালের বীরেরা কূটযুদ্ধ করিতেন না বলিয়া এ অস্ত্র
তঁাহাদের নিকট পরিত্যক্ত প্রায় ছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের
মস্তকে ও রথের ভিত্তিতে বৃহন্নালিক সকল রক্ষিত থাকিত,
এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় । রামায়ণোক্ত রাবণের দুর্গবর্ণন, মহা-

ভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণন দেখিলে পাঠক
মাত্রেরই সংশয়চ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। বৃহন্নালিক
অর্থাৎ আধুনিক কামানের গ্রায় আগ্নেয়যন্ত্র যে পূর্বে ছিল,
তাহা বনপর্কোক্ত মাতলি-আগমন প্রস্তাব পাঠ করিলেই
সপ্রমাণ হইবেক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রটী তথায় “তুলাগুড়া”
নামে লিখিত আছে। যথা—

“নথৈবাহনযশ্চৈব চক্রযুক্তাং তুলাগুড়াঃ ।

বায়ুক্ষৌট্যঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্থা ॥”

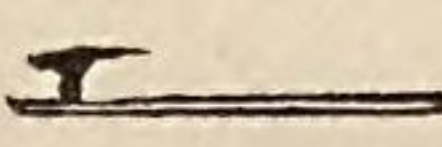
অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার স্বর্গগমন বৃত্তান্ত
বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত
জৈত্র-রথ গ্রহণ পূর্বক মৎসকাশে সমাগত হইলেন। সেই
রথে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, অশনি অর্থাৎ বজ্র, বায়ুক্ষৌট
যন্ত্র, * নির্ঘাত অর্থাৎ জলদুষ্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের গ্রায়
শব্দকারী চক্রযুক্ত “তুলাগুড়া” প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত
ছিল।

ব্যাক্যাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট এই “তুলাগুড়া” শব্দের যেরূপ

* বায়ুক্ষৌট শব্দ যদি তুলাগুড়ার বিশেষণ না হয়, তাহা হইলে উহা
এক স্বতন্ত্র যন্ত্র হইবেক। অর্থাৎ কোশলে বায়ুপূর্ণ করিয়া তদ্বারা গুলিকা
নিষ্ক্ষেপ করিবার যন্ত্র, এরূপ অর্থ হইবে।

অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তুলাগুড়াকে কামান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। যথা—

“তুলাগুড়াঃ মাণ্ডলিকাঃ । মাণ্ডানি অগ্নিযদ্রব্যবলেন গোল-
নিষ্কপদাণি “তুলান্” “বন্দুখ” ইত্যাदि স্তীচ্ছমাষাঙ্গসিদ্ধানি ।
বায়ুক্ষোভাঃ বেগবশাৎ বায়ু জনয়ন্ত্যঃ । সনির্ঘাটাঃ অগ্নিনিধ্বনি-
যুক্তাঃ মহামেঘস্বনাস্থ ।”

ভাবিয়া দেখুন যে, পূৰ্ব্বকালের তুলা নামক পরিমাণ-দণ্ডের  এতদ্রূপ আকার বিশিষ্ট গোলনিষ্কপক একটি পাত্র, তাহা আবার অগ্নেয়দ্রব্যবলে নিষ্কিপ্ত হয়, বায়ু উৎপাদন করে, বজ্রধ্বনির ত্রায় বা মেঘগর্জনের ত্রায় শব্দ হয়, তাহা আবার চক্রযুক্ত অর্থাৎ চাকাওয়ালা;—এরূপ বর্ণনা শুনিলে তাহাকে কামান ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? যাহাই হউক, উল্লিখিত শুক্রনীতি গ্রন্থখানি কত পুরাতন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে ।

শুক্রনীতি সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত গ্রন্থখানি মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন । কেন না, মহাভারতের শত শত স্থানে “শুক্রের নীতি” “শুক্রের বাক্য” “শুক্রের উক্তি” এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ যে সকল শ্লোক লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই আমরা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই । ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিতে

পারেন । দিক্‌প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাহার ২।৪ টি প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম ।

“অশিষ্টনিগ্রহো নিত্যং শিষ্টস্য পালনম্
এবং শূক্ৰোঽব্রবীদ্ধীমানাপত্সু মরতর্ষম ॥”

ভগ্ননাস্থৈব বী গাথৈ প্রক্লাদায়াব্রবীত্ পুরা ।”

“অপিচীশনসা গৌতঃ শ্রুয়তেঽয়ং পুরাতনঃ ।”

“শাস্ত্রং চীশনসা প্রীতমিদং শূণু মথেরিতম্ ।”

“ইত্যেতাং চীশনঃপ্রীত্বাঃ ।”

“কাব্যং নীতিং ন শূণৌষি ।”

[সভা, বন ও উদ্যোগ পর্বোক্ত বিদূর বাক্য সকল দেখ]

শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই মহর্ষিই নীতি-শাস্ত্রের আদি গুরু । শুক্রকৃত ও বৃহস্পতিকৃত নীতিশাস্ত্রের অনেক বচন মহাভারতে ও অন্যান্যপুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে । উপরোক্ত প্রতীক গুলির দ্বারা শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র থাকা সপ্রমাণ হইতেছে । ঐ সকল প্রতীক উচ্চারণের পরেই যে সকল নীতিকথা ততৎস্থানে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা শুক্রনীতিতে অবিকলরূপে লিখিত আছে । সুতরাং গ্রন্থখানিকে মহাভারত অপেক্ষা নবতর বিবেচনা করা যায় না । এ বিষয়ে আমরা এতদধিক বাক্যব্যয় করিতে চাহি না । এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক ।

লগুড় ।—ইহার পাদপ্রদেশ সরু মস্তক স্থূল, ঝক্ক মোটা, অগ্রভাগটী লোহের দ্বারা আবদ্ধ । অধিক লম্বা নহে পরন্তু উপযুক্ত রূপ মোটা । ইহার সর্বান্ন লোহার দণ্ড ও অত্যন্ত দৃঢ় । ইহা লম্বে ২ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে । যথা—

“লগুড়ঃ সুক্ষপাদঃ স্যাৎ পৃথুঁসঃ স্থূলশীর্ষকঃ ।

লৌহবদ্ধাগ্রভাগস্ত ক্লেদেহঃ সুপীবরঃ ॥

দণ্ডাকারীদৃঢ়াঙ্গস্ত তথা হস্তত্রয়ীন্নতঃ ।”

এই লগুড়াস্ত্রের ক্রিয়া চারি প্রকার । যথা—

উত্থানং পাতনঞ্চৈব পেষণং পীথনং তথা ॥

চতস্রীগতযস্তস্য পঞ্চমী নেহ বিদ্যতে ।

দৃঢ়কাযঃ পশ্চিমর্গো তেন যুদ্ধেহন শত্রুভিঃ ॥”

উত্থান, পাতন, বাহাতে পড়িবে তাহার পেষণ ও পীথন । লগুড়ের এই চতুর্বিধ ক্রিয়া ভিন্ন পঞ্চমী ক্রিয়া নাই । দৃঢ়শরীর পদাতি সৈন্তেরাই ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে ।

পাশ——বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে পাশাস্ত্র সম্বন্ধে ষে রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, আগ্নেয় ধনুর্বেদে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে । উক্তবর্ণনাদ্বয়দ্বারা অনুমান হয়, যে, পাশাস্ত্র দুই প্রকার ছিল । মহাভারতাদি গ্রন্থেও বারুণ পাশ ও পাশ, এই দুই পৃথক পাশের উল্লেখ আছে । বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের পাশ এইরূপ——

“পাশঃ সুসূক্ষ্মাবয়বীলৌহধাতুস্থিকোণবান্ ।

প্রাদেশপরিধিঃ সীসগুলিকামরণাশ্চিতঃ ॥

পাশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহের দ্বারা নির্মিত, ত্রিকোণ-
যুক্ত, প্রাদেশপরিমিত পরিধিযুক্ত ও সীসক-গুলিকার দ্বারা
সুশোভিত ।

এতৎ সম্বন্ধে আগ্নেয়-ধনুর্বেদের মত এইরূপ—

‘দশহস্তীভবেৎ পাশী বৃন্তঃ কামুখস্তথা ।

গুণকাপাসমুজ্জানাং মর্কস্তায়বচর্মণাম্ ॥

অন্যেণাং সুদৃঢ়ানাঞ্চ সুদৃঢ়তং পরিবেষ্টিতম্ ।

তথা ত্রিশতসমং পাশং বৃধঃ কুর্যাৎ সুবর্তিতম্ ॥”

বৃন্ত অর্থাৎ গোল ও লম্বায় ১০ হাত, এরূপ পাশ গুণ
রজ্জু, কাপাস রজ্জু, মুগ্ধ নামক তৃণের রজ্জু, পশুবিশেষের
শ্রাবু, আকন্দত্বকের সূত্র ও চর্ম্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া
থাকে । এতদ্বিন্ন অগ্ন্যাগ্ন দৃঢ় অথচ সূত্র প্রস্তুত হয়, এরূপ
পদার্থের দ্বারাও হইতে পারে । সূক্ষ্ম ৩০ তঞ্চ একত্রিত ও
সুবর্তিত করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে
হয় । এই পাশান্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—

কর্তব্যং শিচ্চকৈলস্য স্থানং কচ্চাসু বৈ সদা ।

বামহস্তেন সংগৃহ্য দক্ষিণেনোদ্বরেততঃ ॥

কুণ্ডলস্থাচ্যতিং কৃत्वा धाम्न्यैकं मलकीपरि ।

क्षिपेत्... ...

বল্গিতে চ স্তুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ ।
 সময়যোগবিধিं জালা প্রযুক্তীত সুশিচ্চিতঃ ॥
 বিজিত্বা তু যথান্যায়ং ততীবন্ধং সমাচরেৎ ।
 কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিনম্ ।
 দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেণ নিষ্কার্ষেহৃদ্বিধেন চ ॥”

অর্থাৎ ইহা কক্ষপ্রদেশে রাখা হয়, প্রয়োগের সময়
 কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ
 করিতে হয় । এই অস্ত্রপ্রয়োগের ৩ তিন প্রকার গতি আছে ।
 তাহাদের নাম বল্গণ, প্লবন ও প্রব্রজন । ইহার দ্বারা
 ইচ্ছানুরূপ বন্ধন পূর্ব্বক স্বসকাশে আকর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ
 কৃপাণ দ্বারা বধ করিতে হয় ।

এতদ্ভিন্ন ২৫০ অধ্যায়ে অনুরূপ ক্রিয়া লিখিত আছে ।
 যথা—

“পর্যটনমপ্যটনং গৃহীতং লঘুসংজ্ঞিতম্ ।
 কুর্দ্ধৃদ্বিপ্রমঘঃচিপ্রং সম্ভারিতবিধারিতম্ ॥
 শ্যেনপাতং গজপাতং গ্রাহগ্রাহ্যং তথৈব চ ।
 এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারणाः ॥”

বৈশম্পায়নোক্ত পাশ, যাহা প্রথমে উল্লেখিত হইয়াছে,
 তাহার কার্য্য এইরূপ—

“প্রসারণং বেষ্টনঞ্চ কৰ্ত্তনञ্চেতি তে ত্রয়ঃ ।
 যোগাঃ পাশাশ্রিতাঃ লোকে পাশাঃ চন্দ্রসমাশ্রিতাঃ ॥”

অগ্রে প্রসারণ, পশ্চাৎ তদ্বারা শত্রুকে বেঁধেন, অনন্তর
অস্ত্রান্তর দ্বারা কর্তন । পাশের এই তিন প্রকার প্রয়োগ
আছে এবং ইহা ক্ষুদ্রযোদ্ধার আশ্রিত ।

“কৃত্বজায়তং বিশালম্ভ নির্য্যকধামিতমেব চ ।

পশ্চকর্ম্ম বিনিহিষ্টং ব্যলি দাশী মহাত্মমিঃ ॥”

অত্র এক প্রকার পাশ আছে, মহাশয়গণ তাহার পাঁচ
প্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন । সে পাঁচ প্রকার প্রায়
প্রথমোক্তের তুল্য ।

চক্র—এই অস্ত্র কুণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল । প্রান্তভাগ
উত্তম কোণযুক্ত বা ধারাল । নীল-জলের ন্যায় বর্ণ এবং
মণ্ডল । পরিমাণে দুই প্রাদেশ অর্থাৎ এক হস্ত । যথা—

“চক্রন্তু কুণ্ডলাকারমন্তি স্বপ্তিসমন্বিতম্ ।

নীলীসলিলবর্ণং তন্ প্রাদেশদ্বয়মণ্ডলম্ ॥”

ইহার কার্য্য পঞ্চবিধ । যথা—

“অন্যনং ধামণং ত্রৈব ক্ষেপণং পরিবর্তনন্ ।

দলনম্ভিতি পশ্চৈব গত্যস্ত্রকর্ম্মসংশ্রিতাঃ ॥”

গ্রহন, ভ্রামণ অর্থাৎ ঘুরাণ, ক্ষেপণ, কর্তন ও দলিত
করণ । চক্রের এই পঞ্চবিধ কার্য্য আছে ।

আগ্নেয়-ধনুর্বেদে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ।
যথা—

“ছেদনং ভেদনং পাতীভ্রামণং নামনন্তথা ।

বিকর্তনং কর্তনঞ্চ চক্রকর্মদমেব চ ॥”

চক্রের কার্য ছেদন, ভেদকরণ, নিপাতন, ভ্রামণ, শমন
বা শায়ন অর্থাৎ শায়িত করা, বিকর্তন ও কর্তন ।

দণ্ডকণ্টক—ইহার গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে ।

যথা—

“দণ্ডকণ্টকনামাতু লৌহকণ্টকদেহবান্ ।

অগ্রে দৃশ্যঃ সূক্ষ্মপুঙ্খ-স্বাঙ্গারসান্নিভাক্রান্তিঃ ॥

বাহুন্নতঃ সুত্সরুশ্চ দণ্ডাকাশীগ্রলীচনঃ ।

পাতনং গ্রন্থনং চেতি হি গতী দণ্ডকণ্টকে ॥”

অর্থাৎ ইহার কায়া বা শরীর দণ্ডাকার, তাহার সর্বান্ত্রে
লৌহের কাঁটা, আগা মোটা ও গোড়া সরু । বাহুপরিমাণ
লম্বা, ধরিবার মুষ্টি অতি সুন্দর, এবং বর্ণ অঙ্গারতুল্য কৃষ্ণ-
বর্ণ । ইহার নিক্ষেপ ও গ্রন্থন অর্থাৎ গাঁথিয়া ফেলা, এই
দুই কার্য আছে ।

ভুসুগ্ধী—এই অস্ত্রের আকার প্রকার ও কার্য এইরূপ—

“ভুসুগ্ধী তু বৃহত্‌গ্রন্থি বৃহদেহঃ সুমত্সরুঃ ॥

বাজ্রত্ৰয়সমুৎসিধঃ কৃষ্ণসর্পোদবর্ণবান্ ।

পাতনং ঘূর্ণনম্বেতি হি গতী তত্সমাস্রিতে ॥”

অর্থাৎ ইহা বাজ্রত্রয় পরিমাণ লম্বা, বড় বড় গ্রন্থি অর্থাৎ
গাঁট আছে, স্থূল কায়া, মুষ্টিদেশ উত্তম, এবং ইহার বর্ণ

কৃষ্ণসর্পের গায় উগ্রদর্শন । পাতন ও ঘূর্ণন, এই গতিদ্বয়
ইহার অনুগত ।

এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ
সমস্তই মুক্তান্ত অর্থাৎ এ সমস্তই ফেলিয়া বা ছুড়িয়া
মারিতে হয় । যাহা অমুক্ত অর্থাৎ যাহা ফেলিয়া বা
ছুড়িয়া মারিতে হয় না,—সেই সকল অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা
এক্ষণে শ্রবণ করুন । অমুক্ত অস্ত্রের মধ্যে বজ্রই সর্ব-
প্রধান । বজ্র কি ? তাহা উত্তমরূপ বুঝা যায় না, সুতরাং
বুঝানও যায় না । তথাপি তদ্বোধক বাক্য গুলি অন্য প্রবন্ধে
বলা হইবে । এক্ষণে “ইলী” প্রভৃতি কএকটি অমুক্ত অস্ত্রের
বর্ণনা করা যাউক ।

ইলী—ইহা উচ্চে দুই হাত, ইহার অগ্রে ভূগ্ন অর্থাৎ
কোল কুঁজা, লৌহ ফলক আছে, তাহার বিস্তার ৫ অঙ্গুলি,
বর্ণ শ্যাম, মুষ্টিদেশ করত্র-বর্জিত । (তরবারি প্রভৃতির
মুষ্টিতে যে হস্তবেষ্টনার্থ এক প্রকার বেষ্টন বা প্যাঁচ থাকে,
তাহার নাম করত্র) । ইহার কার্য্য সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ
ও প্রগ্রহ । যথা—

“ইলী হস্তবধীতসেধা করত্ররহিতত্মকঃ ।

শ্যামা ভূগ্নাফলকা পঞ্চাঙ্গুলিসুবিম্বৃতা ॥

সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা ।

ইলীমেতানি চত্বারি বল্লগিতানি স্তিতানি বৈ ॥”

পরশু—বৈশম্পায়নীয় ধনুর্বেদে ইহার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তদনুসারে ইহাকে এক প্রকার টাঙ্গী বলিলেও বলা যায় । যথা—

“পরশুঃ সূক্ষ্মযষ্টিঃ স্যাৎ বিশালাস্র্যঃ পুরীমুখঃ ।

স্রুপাদঃ সশিখরীবাভ্রমাচ্রান্নতাক্রান্তিঃ ।

পাতনং ছেদনং চেতি গুণৌ পরশুমাশ্রিতৌ ॥”

অর্থাৎ একটী যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লৌহ ফলক, তাহার আশ্রু বিস্তৃত, সম্মুখে মুখ, মুখ চক্চকে, কিন্তু অঙ্গ মলিন । মূলদেশে সরু অর্থাৎ মুট্ আছে, এবং মস্তকে শিখা আছে । ইহার পরিমাণ বাহু অর্থাৎ বাহু-পরিমিত লম্বা । পরশুর কার্য্য পাতন ও ছেদন । কিন্তু আগ্নেয়-ধনুর্বেদে ইহার আরও কএকটী কার্য্যের উল্লেখ আছে । যথা—

“করালমবঘাতস্ব দংশীপল্লতমেব চ ।

ক্ষিপ্তহস্তং স্থিরং শূন্যং পরশীক্সু, বিনির্দ্দিশেৎ ॥”

গৌশীর্ষ—ইহার আকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ।

“গৌশীর্ষং গৌশিরঃপ্রস্থ্যং প্রসারিতপদদ্বয়ম্ ।

অধস্তাঙ্গ্যকুণ্ডলাদ্যং জঙ্ঘায়ঃ ফলকাস্ত্রিতম্ ॥

নীললীহিতবর্ণং তত্ চিরশ্রি চ সুসম্পদম্ ।

দীড়শাঙ্গুল্যুন্নতস্ব তীক্ষ্ণাং পৃথুমধ্যকম্ ॥

সম্প্রত্য মনবে দত্তং মহেন্দ্রিণ সমুদ্রিকম্ ।

প্রমূলসূচকে লীকে রাজ্ঞাং গৌশীর্ষমুদ্রিকৈ ॥”

অর্থ এই যে, দেখিতে গোমস্তকতুল্য গোশীর্ষ নামক অস্ত্রের দুইটি পদ আছে । তাহার নীচে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সংলগ্ন থাকে এবং তাহার উর্দ্ধকায় লৌহফলকে আবদ্ধ থাকে । মধ্যাঙ্গ ত্রিরশ্মি অর্থাৎ তে-শিরে, এবং তাহার ধারণের মুট্ অতি সুন্দর । তাহার বর্ণ কৃষ্ণরক্ত । ইহার উচ্চতা ১৬ অঙ্গুল অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন এক হস্ত । ইহার মধ্যভাগ স্থূল, কিন্তু অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ । পূর্বের মহেন্দ্র এই অস্ত্র এবং এতদ্বিধ মুদ্রিকা নামক অস্ত্র মনুকে শিখাইয়াছিলেন । পরে তাহা এই মানবলোকে আসিয়াছে । যে রাজার এই অস্ত্রদ্বয় থাকে, ইহলোকে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার হয় । ইহার ক্রিয়া এইরূপ—

“মুষ্টিগ্রহঃ পরিচ্ছেদঃ পরিধিঃ পরিকুল্লনম্ ।

চলার্য্যৈতানি গোশীর্ষে বল্গিতানি প্রচলন্তে ॥”

মুষ্টিগ্রহ অর্থাৎ মুট্ধরা, পরে পরিচ্ছেদ, পরিধি ও পরিকুল্লন বা পরিকুল্লন । কুল্লন পক্ষে বিদ্ধকরণ এবং কুল্লন পক্ষে ছেদন করা, অর্থ এইরূপ অর্থ হয় ।

অসিধেনু বা খড়্গপুত্রিকা—ইহার আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

“অসিধেনুঃ সমাখ্যাতা হস্তৌন্নত্যপ্রমাণতঃ ।

অনলব্রত্সব্দযুতা শ্যামা কীটিব্রযাপ্রিতা ॥

অঙ্কুলিহয়বিস্তীর্ণা ছ্যাসন্নরিপুঘাতিনী ।
 মেখলাগ্রথিনি সা তু প্রীচ্যতে খড়্গপুত্রিকা ॥
 মুষ্টিগ্রহণং চৈব পাটনং কুল্লনং তথা ।
 বল্লগিতনয়বল্যেণা সদা ধার্যা নৃপীন্দ্রমৈঃ ॥”

অর্থাৎ অসিধেনু নামক অস্ত্রটী হস্তপ্রমাণ লম্বা, তলত্র-
 রহিত কিন্তু ৭সরু অর্থাৎ মুট্ আছে । বর্ণ শ্যাম । ত্রিধার
 ও বিস্তীর্ণতায় দুই অঙ্গুল । ইহার দ্বারা আসন্ন অর্থাৎ
 নিকটগত শত্রু বিনষ্ট করা যায় । এই অসিধেনু যদি মেখ-
 লায় প্রথিত (মেখলা=চেইন্) থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে
 খড়্গপুত্র বলা যায় । এই দুই অস্ত্রের ক্রিয়া ত্রিবিধ । মুষ্টি-
 গ্রহণ, বিদারণ ও বিদ্ধকরণ । প্রধান প্রধান রাজারা ইহা
 ধারণ করিয়া থাকেন ।

লঘিত্র—এই অস্ত্রটীর আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

“লঘিত্রং ভূগ্নকাযং স্যাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃশিতম্ ।
 শ্যামং পদ্মাক্কুলিবিয়াসং সার্বহস্তসমুন্নতম্ ॥
 ত্মরুণা গুরুণা নদ্ধং মহিষাদিনিকর্তনম্ ।
 বাজ্জহয়ীযমীন্দ্রপৌ লঘিত্রে বল্লগিতে মতে ॥”

লঘিত্রের কায়াটী ভূগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো) ।
 পৃষ্ঠভাগ স্থূল ও গুরুভারযুক্ত । সম্মুখ ভাগ তীক্ষ্ণ অর্থাৎ
 ধারাল । ইহার ব্যাস ৫ অঙ্গুল, এবং বর্ণ কাল । ইহার

মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কৰ্ত্তিত করা যায় । দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই ।

আস্তর—ইহার পদদেশ গ্রন্থিল, মস্তক দীর্ঘ, কর অর্থাৎ পাতা বিস্তীর্ণ, হস্ত, উদর ও মস্তক বক্র, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিমাণ ২ হস্ত । ঘুরাণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ, এই কএক প্রকার ক্রিয়া ইহাতে সাধিত হয় । ইহার দ্বারা যুদ্ধে শত্রু-বিনাশ করিবেক এবং অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্তেরাই ইহা ধারণ করিবেক । যথা—

“আস্তরীগ্রন্থিপাদঃ স্যাৎ দীর্ঘমৌলির্ঘট্টকরঃ ।

মুগ্ধহস্তোদরশিরঃ শ্যামবর্ণোদ্বিহস্তকঃ ॥

ধামণ্যং কর্ণাণ্যং চৈব ত্রীটনং তত্ ত্রিবল্লগিতম্ ।

জালা শত্রুন্ রণে হন্যাৎ ধার্য্যঃ সাদিপদাতিभिঃ ॥”

কুন্ত—এই অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, শৃঙ্গ অর্থাৎ অগ্র-ভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ষড়শ্রি অর্থাৎ ছয় পোয়ালে । ৫ হাত লম্বা এবং পদদেশ বৃত্ত অর্থাৎ গোল এবং দেখিতে ভীষণ, উড্ডীন, অবডীন, নিডীন, ভূমিলীন, তির্য্যক্লীন, ও নিখাত অর্থাৎ খনন,—এই ছয় প্রকার ক্রিয়া ইহার আশ্রিত । উড্ডীন নিডীন প্রভৃতি সঞ্চরণ বিশেষের নাম । এই অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ পক্ষিজাতির গায় গতি অব-লম্বন করিতে হয় । যথা—

“কুন্তস্বয়ীমযাঙ্গঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণপৃষ্ঠঃ ষডশ্চিমান্ ।

পঞ্চহস্তসমুৎসেধী বৃন্তপাদীভয়ঙ্করঃ ॥

উড্ডীণমবডীনঞ্চ নিডীনং ভূমিলীনকম্ ।

তির্য্যকলীন নিখাতঞ্চ ষন্মার্গাঃ কুন্তমাশ্রিতাঃ ॥”

অশুরাচার্য্য শুক্রও স্বকৃত নীতিগ্রন্থে ইহার আকার প্রকা-
রের বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র ।
শুক্রপ্রোক্ত কুন্ত আর বর্ষা বা বড়শা সমান । যথা—

“দৃশ্যহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালায়ঃ শঙ্কুবৃদ্ধকঃ ।”

লম্বে ৭ হাত এক গাছ বাঁশ—তাহার মস্তকে লোহার
তীক্ষ্ণ ফলা,—মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা, ফলের নীচে
ও মূলে রেশম স্তবকে সুশোভিত । এতদ্রূপ কুন্ত অস্ত্রের
৪ প্রকার ক্রিয়া আছে । আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন অর্থাৎ
ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ যথা—

“প্রাসন্তু সপ্তহস্তঃ স্যাদৌন্নতীন তু বৈণবঃ ।

লৌহশীর্ষসৌন্দ্রপাদঃ কৌশেয়জবকাস্তিতঃ ॥

আকর্ষণঞ্চ বিকর্ষণঞ্চ ধূননং বেধনং তথা ।

চতস্র এতা গত্যৌরক্তপ্রাসং সমাশ্রিতাঃ ॥”

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থেও প্রাস অস্ত্রের বর্ণনা আছে । তাহার
সহিত ইহার প্রায় ঐক্য আছে । যথা—

“প্রাসাস্ত্রন্তু চতুর্দশীদণ্ডবৃদ্ধঃ দুরাননঃ ॥”

অর্থাৎ প্রাস অস্ত্র লম্বে ৪ হাত, তাহার দাগিও বেণুদণ্ড-নির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার ।

পিণাক— ইহা শূলান্তের নামান্তর মাত্র । যাহাকে আমরা ত্রিশূল বলি, তাহাই পিণাক । যথা—

“পিণাকস্তু ত্রিশীর্ষঃ স্যাৎ সিনাশ্রঃ ক্রুরলীচনঃ ।

কাংস্যকাযোলৌহশীর্ষশ্চতুর্হস্তপ্রমাণবান ॥

ঘননং প্রোতনং ত্রিশূলং স্মৃতে গম্যী ॥’

অর্থাৎ ইহার কায়া কাংসুদণ্ডে নির্ম্মিত, মস্তকে ত্রিশীর্ষ লৌহফলক, তাহার প্রান্ত বা অগ্রভাগ সুশোণিত এবং তাহার চক্ষু অতি ক্রুর । ভল্লকের লোমের স্তবকাতির দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোণিত । ইতস্ততঃ সঞ্চালন ও প্রোতন অর্থাৎ ফুঁড়িয়া ফেলা তাহার কার্য্য । উক্ত দুইটী মাত্র ক্রিয়া ত্রিশূলের আশ্রিত । আগ্নেয়ধনুর্কেন্দ্রে ইহার অন্য কএকটি ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । যথা—

“আস্কীটঃ দ্বেভনম্ভিৎ প্রাসান্দীলিতকৌ তথা ।

শূলকর্মাণি জানীহি ষষ্ঠমাখ্যানসংশ্লিতম্ ॥”

গদা—গদা নামক শস্ত্রের আকার ও ক্রিয়া এইরূপ ।

“অষ্টাশ্রা পৃথুবুধ্মা তু গদা হৃদয়সম্মিতা ॥”

অর্থাৎ মুষ্টিস্থান শূল, অবয়ব অষ্টাশ্র অর্থাৎ আট পোয়ালে এবং হৃদয় পরিমাণ লম্বা । এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নোক্ত

ধনুর্বেদে অণু এক প্রকার ঘোরদর্শন গদার বর্ণনা আছে ।
যথা —

“গদা শৈক্যায়সমযৌ শতাবৃথশীর্ষকাঃ ।

শঙ্কুপ্রাবরণা ঘোরা চতুর্হস্তসমুন্নতাঃ ॥

রথাক্ষমাচকায়া চ কিরীটাস্চিতমলকা ।

সুবর্ণমেখলাগুপ্তা গজপর্বতভেদিনী ॥

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ।

অত্র যন্তাণি চিত্তানি স্থানানি বিবিধানি চ ॥

পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্ ।

অভিঙ্গবণমাচ্চিপমবস্থানং সবিগ্রহম্ ॥

পর্যবৃত্তং সন্নিবৃত্তমবল্লতমুপল্লতম্ ।

দক্ষিণং মণ্ডলম্ভৈব সখ্যং মণ্ডলমেব চ ॥

আবিদ্ধম্ প্রবিদ্ধম্ স্ফীটনং জ্বালনন্তথা ।

উপন্যস্তমপন্যস্তং গদামার্গাশ্চ বিংশতিঃ ॥”

এই লৌহময়ী গদা শিকার দ্বারা বাহিত হয়। ইহার
শীর্ষদেশ শূল ও গাত্র শতার অর্থাৎ শতপোয়াল-বিশিষ্ট।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণ্টকে ইহার সর্বাঙ্গ আচিত, লম্বে ৪ হাত
এবং স্থলতায় রথচক্রের নাভির তুল্য। দেখিতে ভয়ঙ্কর,
মস্তকে কিরীট অর্থাৎ পাগড়ির আয় বেড় থাকে, এবং ইহা
সুবর্ণ শৃঙ্খলে রক্ষিত বা গ্রথিত। ইহা গজ ও পর্বত চূর্ণ
বিচূর্ণ করিতে সক্ষম। ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে
বিবিধ গতি শিক্ষা করিতে হয়। সে সকল গতির অর্থাৎ

নিজের সঞ্চরণ ও গদার পরিচালন বিংশতি সংখ্যক । যথা—
বিচিত্রমণ্ডল, গতিপ্রত্যাগতি, পরিমোক্ষ বর্জন, পরিধাবন,
অভিভ্রবণ, আক্ষেপ, নিগ্রহযুক্ত অবস্থান, পরাবর্তন, সন্নিবর্তন
অবপ্লুতি, উপপ্লুতি, দক্ষিণমণ্ডল, বামমণ্ডল, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ,
ক্ষেপটন, জ্বালন, উপপ্লাস, ও অপপ্লাস । মহাভারতোক্ত
ভীমের গদা আর এই বৈশম্পায়নোক্ত গদা তুল্য বা এক
বলিয়া অনুমিত হয় । এতদিন্ন আগ্নেয় ধনুর্বেদে যে গদার
উল্লেখ আছে, তাহাও এইরূপ । এরূপ গদার সদ্যবহার
অত্যন্ত বলসাধ্য ।

“মুদ্রারঃ সূক্ষ্মদাঃ স্যান্ হোনশীর্ষল্লিহস্তবান্ ।

মধুবর্ণঃ পৃথক্কন্দস্বাষ্টমারগুরুস্ব সঃ ॥

স্বস্ত্যর্ঘ্যন্ত, লীনোলঃ পরিধ্যা করসন্মিতঃ ।

ধামণ্যং দাতনস্ব নি দ্বিবিধং মুদ্রৈ শ্রিতম্ ॥”

মুদ্রারের মূলদেশ কৃশ, স্কন্ধদেশ স্থূল, মস্তকে শীর্ষক থাকে
না । লম্বে ৩ হাত, গুরুত্বে অষ্টভার ।* ৫সরু অর্থাৎ
মুটযুক্ত, আকার বর্তূল বা গোল । ইহার পরিধি এক হস্ত ।
ইহার ঘূর্ণন ও নিপাতন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে । পরন্তু
আগ্নেয় ধনুর্বেদে ইহার ৪ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে ।
যথা—

* ২০ তোলা ও ৮০০ তোলায় এক “ভার”, পরন্তু এস্থলে ৮০০০
তোলা অর্থই গ্রাহ্য এবং তাহার ৮ গুণে ২০ মোন । ২০ মোন লোহার
গদা লইয়া যুদ্ধ করিত, এ কথা মনে করিতেও ভয় হয় ।

“তাড়নং ক্বেদনং বিপ্র ! তথা চূর্ণনমেবচ ।

মুদ্ররস্য তু কৰ্ম্মাণি তথা শবনঘাতনম্ ॥”

হে ব্রাহ্মণ ! তাড়ন, ছিন্নভিন্নকরণ চূর্ণিতকরণ ও শবন-ঘাত,—মুদ্রারের এই চতুর্বিধ কার্য জানিবে ।

সীর—

“সীরীদ্বিবক্রী বিশিখীলৌহপাদমুখঃ ক্রপন্ ।

পুংপ্রমাণঃ স্নিগ্ধবর্ণ স্লামাকর্ষণে নিপাতনবান্ ॥”

সীর বা লাক্ষল অস্ত্রটী দ্বিবক্র অর্থাৎ দুই স্থানেই বাঁকা ও শিখাশূন্য । মূলদেশ ও মুখ লৌহবদ্ধ । সার্কিত্রিহস্ত-পরিমিত দীর্ঘ এবং স্নিগ্ধ । আকর্ষণ ও নিপাতন এই ক্রিয়াদ্বয় ইহাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

মুসল—

“মুসললল্লিশীর্ষাভ্যাং করৈঃ পাদৈর্বিবর্জিতঃ ।

মূলে চান্তেঃতিসম্বদ্ধঃ পাতনং পোথনং দ্বয়ম্ ॥”

মুসলের চক্ষু, মস্তক, হস্ত ও পদ কিছুই নাই । অর্থাৎ, সর্বদিক সমান এবং ইহার নিপাতন ও পোথন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে ।

পাটিশ—ইহা এক প্রকার তরবারি বিশেষ । আগ্রের ধনুর্কোদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্কোদ ও শুক্রনীতি, এই তিন পুস্তকেই সমান বর্ণনা দৃষ্ট হয় । যথা—

“পট্টিশঃ পুং প্রমাণঃ স্যাৎ বিধারস্তীক্ষ্ণশৃঙ্খলকঃ ।

হস্তবান্ধবমাযুক্তীমুষ্টিঃ স্বল্পসহোদরঃ ॥

(বৈশম্পায়ন ।)

অর্থ এই যে, পট্টিশ নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার । ইহা পুরুষ-প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি অর্থাৎ মুট্ হস্তবান্ধব যুক্ত । শুক্রনীতির বর্ণনাও এই রূপ । যথা—

“পট্টিশসীঃসি সমী হস্তবান্ধবমাযুক্তীমুষ্টিঃ ।”

(যুক্তনীতি)

ইহার ক্রিয়া খড়্গক্রিয়ার ত্রায় অনেক বিধ ।

মৌষ্টিক—এই মৌষ্টিক অস্ত্রটী কেবল বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে দৃষ্ট হয় । যথা—

“মৌষ্টিকং স্তুতস্বয়ং যথ্যং প্রাদেশীন্নতিমূষণম্ ।

সিতাশ্রমুন্নতগ্রীবং পৃথুদ্রসিতং তথা ॥”

মৌষ্টিক অস্ত্রের ৭সক অর্থাৎ মুষ্টিস্থান অতি উৎকৃষ্ট । ইহার উচ্চতা প্রাদেশ অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত । অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ বা শাণিত এবং গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ । উদর প্রদেশ স্থূল ও সূক্ষ্মশাণিত । এই মৌষ্টিকাস্ত্রের কার্য্য খড়্গকার্য্যের ত্রায় বিচিত্র ও বহুবিধ ।

পরিঘ—

“পরিঘীবন্তু লাকারস্তালমাতঃ স্তুতারবঃ ।

বলৈকসাধ্যসম্পাতস্তলস্মিন্ জীযৌ বিচলন্ত্যে ॥”

পরিষ অষ্টটী বর্তুল অর্থাৎ সূগোল । লম্বে পুরুষপ্রমাণ অর্থাৎ সার্কি ত্রিহস্ত । ইহা কেবল বলপূর্বক নিষ্ক্ষেপ করিতে হয় ।

ময়ুখী—এ অস্ত্রের অণ্ড নাম কি ? তাহা জানি না । ফল, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ ভিন্ন অণ্ড কোন গ্রন্থে এ নাম দৃষ্ট হয় না । উল্লিখিত গ্রন্থে ইহার যেরূপ বর্ণনা আছে, পাঠকবর্গ তাহা দৃষ্ট করুন ।

“ময়ুখী ক্রতযষ্টিঃ স্যাৎ মুষ্টিযুক্তা নরীন্দ্রতা ।

কিঙ্কিণীসবতা চিত্রা ফলিকাসহকারিণী ॥

আঘাতস্ত প্রতোঘাতং বিঘাতং পরিমোচনম্ ।

অভিভ্রবণমিত্যেতি ময়ুখীং পঞ্চ সংশ্রিতাঃ ॥”

পুরুষপ্রমাণ এক দীর্ঘ যষ্টি, তদগ্রে ফলা ও তদগাত্রে কিঙ্কিণীজাল এবং ইহার মুষ্টি আছে । আঘাত, প্রতিঘাত, এবং বিঘাত, পরিমোচন ও অভিভ্রবণ, এই পাঁচ কার্য্য ইহার আশ্রিত ।

শতঘ্নী—এই শতঘ্নী সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন । কেহ বলেন, আধুনিক কামান্ আর পূর্বকালের শতঘ্নী একই বস্তু । কেহ বলেন, পূর্বকালে এক প্রকার প্রস্তর-নিষ্ক্ষেপক কাষ্ঠযন্ত্র ছিল, তাহাই তৎকালের শতঘ্নী । বস্তুতঃ এই দুই মতের কোন মতেরই পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না । পরন্তু “শতঘ্নী” এই নামের ব্যুৎপত্তি

প্রতি দৃষ্টি করিলে উক্ত উভয় মতই যথার্থবাদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে । নীলকণ্ঠ ভট্ট মহাভারতের টীকায় উক্ত উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ স্বামী ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদগর বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন । বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের ৫ম অধ্যায়ে আমরা রামানুজের মতের পোষক প্রমাণ দেখিতেছি ; যথা—

“শতদ্বী কণ্টকযুতা কালায়সমযী দৃঢ়া ।

মুদগাভা চতুর্দ্বী বর্তুলা ত্বেদা যুতা ॥

গদাবল্লিগতবল্যেষা মযেনি কথিতা তব ॥”

(মযেনি কথিতা ভুবি, এরূপ পাঠও আছে)

কণ্টকাচিত, লৌহসার নির্ম্মিত, মুদগরকল্প, সূদৃঢ় ও বর্তুল শতদ্বী নামক আয়ুধের প্রমাণ ৪ হাত এবং তাহার ৫সকল অর্থাৎ মুট আছে । গদাযুদ্ধের বল্লন অর্থাৎ প্রয়োগ কালীন আঞ্চালন যেরূপ, ইহারও বল্লন সেই রূপ ।

বৈশম্পায়নের এই বচন শতদ্বীকে মুদগরবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও তন্নামক আগ্নেয়-অস্ত্রবিশেষ যে ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না । কেন না ইহার দ্বারা এক কালে শত পুরুষের হনন সিদ্ধি হয় না এবং অগ্নিপ্রদীপ্তও হয় না । সূতরাং শতদ্বী নামক অন্য কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলিয়াই অনুমিত হয় । মহাভারতে অন্য একটী বচন আছে, তদুপে এ অনুমান নিঃশয়িত হইতে পারে । যথা—

“মুদগৈঃ কূটপাশৈশ্চ শুলীলুখলপর্জ্বতৈঃ ।

শতঘ্নীমিশ্র দীপ্যামির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ ॥”

এবচনে মুদগর হইতে ভিন্ন এক প্রকার প্রদীপ্ত শতঘ্নী পাওয়া যাইতেছে । এতদ্ভিন্ন মহাভারতের মধ্যে এরূপ শত শত বাক্য আছে, যাহার অর্থ ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে মুদগরকল্প শতঘ্নী হইতে ভিন্ন অন্য একরূপ আগ্নেয়-শতঘ্নী ছিল বলিয়া নির্ণয় হইতে পারে । সেই জগুই টিকা-কার নীলকণ্ঠ ভট্ট ইহাকেও সেই সেই স্থানের শতঘ্নীকে আগ্নেয়দ্রব্যবলপ্রযোজ্য “কামান” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন । ফল, (শতঘ্নী-শব্দের দ্বারা কামানের পূর্বাস্তিত্ব সিদ্ধ না হউক, পূর্বে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বারা কামানের পূর্বাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই ।

শ্লোক—স্মৃণুল রক্তদেহঃ স্যাৎ সমীপদৃষ্টপূর্বকঃ ।

পুংসমাণ ঋজুস্মিন্ ভ্রামণং পাতনং দ্বয়ম্ ॥”

রক্তবর্ণ, ঘনগ্রন্থিল, পুরুষপ্রমাণ লম্বা ও ঋজু অর্থাৎ সোজা লৌহবাণের নাম শ্লোক । ইহার ভ্রামণ ও নিপাতন, এই দুইটি মাত্র ক্রিয়া আছে ।

বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্কর্ষেদে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দেবাস্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রের উল্লেখ আছে । সে সকলের স্বরূপ কি ? তাহা বর্ণিত হয় নাই, স্মৃতিরূপ কেবল মাত্র নামের উল্লেখ করায় তদ্বারা কোন রূপ জ্ঞান লাভের বা

আকৃতি কল্পনার সম্ভাবনা নাই ; কাষেকাষেই সে সকল উদ্ধৃত হইল না ।

মধুসূদন সরস্বতী, স্বকৃতপ্রস্থান ভেদ গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্বেদের অর্থ সংগ্রহস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রযুক্ত অস্ত্র সমূহের আকার, মন্ত্র ও তাহার সিদ্ধি বা সাধনা-প্রকার উক্ত-বেদের ৩য় অধ্যায়ে উপদিষ্ট আছে । কিন্তু সে গ্রন্থ আমরা পাই নাই । সুতরাং মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পরিলাম না । বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্বেদের সর্বশেষে লিখিত আছে যে, যে সকল অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সকল যুগে যুগে বিকৃত হইয়া যায় । তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্তনে মনুষ্যের দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়া থাকে । দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির বিকার বশতঃ লৌহ গুলিকা কিস্বা সীসক গুলিকার নিক্ষেপক লৌহাদিনির্মিত যন্ত্র সকল এবং উপলযন্ত্র অর্থাৎ প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্র সকল এবং অগ্ন্যাগ্নি বিবিধ প্রাণিসংহারক যন্ত্র-সকলের দ্বারা কলিকালের লোকেরা কুটযুদ্ধ করিবেক । যথা—

“এতানি বিকৃতিং যান্তি যুগপর্য্যায়নীন্দ ।

দেহদান্যনুসারেণ তথা বুদ্ধ্যানুসারতঃ ॥

যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাশ্চৈদকাণি চ ।

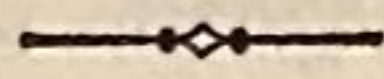
তথা চীপলযন্ত্রাণি ক্লান্তিমাণ্যপরান্যদি ॥

কুটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ ।

তপ্ততৈলং সর্জরসীগুড়লালোগ্রবালুকা ॥
 ময়ুমাশীবিষঘটাঃ শীলকানি ঘৃহচ্ছিলা ।
 ক্রকচা ধূমগুলিকা শুদ্ধাঙ্গারাদিকং তথা ॥
 অধর্মঘৃহা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্ ।
 সাধনানি মহোপাল কূটযুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥
 চূণাঃ পুলিন্দাঃ শবরাঃ বর্বরাঃ পল্লবাঃ শকাঃ ।
 মালবাঃ কীড়নাঃ ছ্যান্বাশ্বীলাঃ পাণ্ড্যাঃ সকেরলাঃ ॥
 স্তুচ্ছা গীযীনয়স্বান্যে চণ্ডালাঃ স্বপচাঃ খশাঃ ।
 মাবেল্লকা ললিত্যাস্ব কিরাতাঃ কুকুরালুথ্য ॥
 পাপা হ্যেতে কথং ধর্মং বেত্স্যন্তি চ বিয়ীনয়ঃ ।
 মাৎস্য্যর্দীপনিরতা ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে ॥”

মহাভারত ও রামায়ণাদি গ্রন্থে, এতদ্ভিন্ন নানা অস্ত্রনাম
 আছে । সে সকলের তাৎপর্য এক্ষণে বুঝা যায় না । ফল,
 প্রত্যেক অস্ত্রের ২৩ বা ততোধিক নাম আছে, ইহা জানা
 আবশ্যক । নচেৎ নানা স্থানে নানা নাম দেখিয়া তাহাদের
 প্রত্যেককে স্বতন্ত্র অস্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে ।

ধনুর্ষেদ ।



ধনুর্বিদ্যা-বোধক শাস্ত্রের নাম ধনুর্ষেদ, এক্ষণে ইহা সর্বভক্ষক কালের করাল জঠরে ভস্মীভূত হইয়াছে । আমরা মনে করি, ভীল্ কোল্ সাঁওতালেরা যেমন তীর ধনুক লইয়া এলো-থেলো যুদ্ধ করে—আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তেমনি পূর্বে তীর ধনুক লইয়া এলো থেলো যুদ্ধ করিতেন—তাহাতে কোন বিদ্যা-সংযোগ ছিল না—পরন্তু নিপুণতার সহিত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে যে, উহাতে বিলক্ষণ বিদ্যা-সংযোগ ছিল । এই বিদ্যা অতি আদিম কালে “বখনাগাস্বদন্তীনাং যীধাংস্বাশ্রিত্য কীৰ্ত্তনম্” রথারোহী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি বোদ্ধাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল । তৎকালে রাজা, রাজপুত্র এবং অগ্ৰ্য বীরপুরুষেরা বহুকাল-সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অবস্থিত থাকিয়া গুরুর নিকট এই বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিতেন । স্থানে স্থানে এই বিদ্যার রীতিমত মঠ ছিল । নানাস্থানসমাগত ছাত্রেরা

তথায় থাকিয়া রীতিমত অধ্যয়নও করিত । মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও গৃহীত হইত । শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু রাজাদিগের ব্যয়ে “রত্নবাট” নিৰ্ম্মাণ করাইয়া শুভ দিনে রাজা, রাজপুত্র ও মাত্ৰ গণ্য পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন । সভা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলে কুমারগণ ও অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহাদের সমক্ষে যথাসাধ্য শিক্ষিত বিদ্যার অভিনয় প্রদর্শন করিতেন । মহাভারতস্থ কুরু-গুরু দ্রোণাচার্য্য ও কুরু-বালকগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহা সপ্রমাণ হইবে । পূর্বে ক্ষত্রিয়গণ যে-বিদ্যার বলে মাত্র ধনুকের সাহায্যে শত শত সহস্র সহস্র বীর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন—সে বিদ্যা কি তুচ্ছ ? না মিথ্যা ? সে ধনুক কি সাঁওতালদিগের ধনুক ? না তাহাতে অণু কিছু রহস্য আছে ? ভাবিতে গেলে মস্তিষ্ক বিকল হয়, বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয়, মস্তক অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায় । এখন আর সে ব্যাস নাই, সে বৈশম্পায়ন নাই, সে রাম নাই, সে পরশুরাম নাই, সে বিশ্বামিত্র নাই, দ্রোণ নাই, অশ্বথামা নাই, কৃপ নাই, অর্জুনও নাই, কেহই নাই । তবে আর আমাদের কে উহা বুঝাইয়া দিবে ? ব্রহ্মার ধনুর্বেদ নাই, শিবের ধনুর্বেদ নাই, বিশ্বামিত্রের ধনুর্বেদও নাই । তবে আর কোন পুস্তকের দ্বারা আমরা উহার মর্ম্ম-গ্রহ বা রহস্য শিক্ষা অন্বেষণ করিব ? কাষে কাষেই সে

সকল এখন আমাদের নিকট উপকথা বা রূপক কাব্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে । যদি বলেন, তবে এ চাপল্য কেন ? প্রবন্ধ শীর্ষে “ধনুর্বেদ” মুকুটার্পণ করাই বা কেন ? ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, মনের আবেগ । বহুকাল হইতে আমার চিতে যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ উপশম করাই এ চাপল্যের বা ধনুর্বেদশীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য ।

আমি বাল্যকালাবধি ধনুর্বেদের অনুসন্ধান ও তৎপুস্তক লাভার্থ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া অবশেষে যে কিছু অত্যল্প গ্রন্থ ও তন্নিহিত জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছি, অদ্য সহৃদয় পাঠকগণকে সে গুলি উপহার দিয়া সেই চিরসঞ্চিত সংকল্পের উদ্‌ঘাপন করিব ।

ধনুর্বেদ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় কি-না, সন্দেহ । পরন্তু ধনুর্বেদের সংগ্রহকারক আচার্য্যগণ বলেন যে, প্রথমে ব্রহ্মা ও মহাদেব এই বেদ প্রচার করেন সুতরাং ব্রহ্মার কৃত ধনুর্বেদ ও শঙ্করকৃত ধনুর্বেদ পূর্বে ছিল বলিয়া অনুমিত হয় । তৎপরে বিশ্বামিত্র মুনি ও ব্যাস তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া দুই খানি ধনুর্বেদ রচনা করিয়া ছিলেন । তৎপরে আর কেহ নিরবচ্ছিন্ন ধনুর্বেদ বলেন নাই । যাহারা যাহারা বলিয়াছেন, তাহারা প্রসঙ্গ ক্রমে অত্যল্প কথাই বলিয়াছেন । সেই প্রাসঙ্গিক

সংগ্রহ গুলিই এক্ষণে পাওয়া যায়, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার নাম এই—

মহর্ষি উশনা কৃত নীতিসার, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ, আগ্নেয় ধনুর্বেদ, বৃদ্ধশার্ঙ্গধর, বীর চিত্তামণি, লঘুবীর চিত্তামণি, কামন্দক, নীতি ময়ূখ ও যুদ্ধ জয়ার্ণব । এতদ্ভিন্ন মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্কলনও আছে ।

মধুসূদন সরস্বতী কৃত প্রশ্নানভেদ পাঠে জানা যায় যে, বিশ্বামিত্রকৃত মূল ধনুর্বেদ তিনি দেখিয়াছিলেন । কেননা উক্ত গ্রন্থে যত অধ্যায় আছে তাহা তিনি বলিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহাও তিনি স্বকৃত প্রশ্নানভেদে বর্ণন করিয়াছেন ।*

* মধুসূদন কৃত প্রশ্নান ভেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

“যজুর্বেদস্বীপবেদী ধনুর্বেদঃ পাৎচতুষ্টয়াত্মকৌ বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ ।
তত্র প্রথমোদীচাপাদঃ । দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ । তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ ।
চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ । তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং অধিকারি নিরূপণঞ্চ কৃতম্ । তত্র ধনুঃশব্দস্বাপি রুদ্রীঃপি চতুর্বিধায়ুধবাচী
বর্তন্তে । তত্র চতুর্বিধম্ । মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্তমুক্তম্ । তত্র
মুক্তং চক্রাদি । অমুক্তং খড়্গাদি । মুক্তামুক্তং শল্যাবান্तरभेदादि ।
यन्त्रमुक्तं शरादि । तत्र मुक्तमस्त्रमित्युच्यते । अमुक्तं शस्त्रमित्युच्यते ।
तदपि ब्राह्म वैष्णव पाशुपत प्राजापत्याग्नेयादि भेदादनेकविधम् ।

গ্রন্থ না দেখিলে তিনি কোন ক্রমেই এতাদৃশ সংকলন করিতে সমর্থ হইতেন না। মধুসূদনের আয়ু এক্ষণে অনধিক ৬০০ বৎসর। অতএব ৬০০ বৎসর সময়ে যদি বিশ্বামিত্রের ধনুর্বেদ থাকা সত্য হয়, তবে তাহা এখনও কোথাও না কোথাও আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরন্তু আমরা বহু চেষ্টাতেও উহার অস্তিত্ব সন্ধানে সমর্থ হই নাই। কাষে কাষেই উল্লিখিত গ্রন্থ নিচয় একত্রিত করিয়া ধনুর্বেদের অধিকার যত দূর দেখান যাইতে পারে তাহা এতৎ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতে খড়্গাস্ত্রই সর্বাদিম। ধনুক ও তৎক্ষেপ্য বাণাদি তাহার পরে, বেণপুত্র পৃথু রাজার সময়ে আবিষ্কৃত হয়। চতুর্শ্লখ ব্রহ্মা আদি রাজা পৃথুকে

एवं साधिदैवतेषु समन्तेषु चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारः क्षत्रिय-
कुमाराणां तदनुयायिनाञ्च ते सर्वे चतुर्विधाः । पदाति रथ गज
तुरगारूढाः । एवं दीक्षाभिषेकशाकुन मङ्गलकरणादिकञ्च सर्वमपि
प्रथमे पादे निरूपितम् सर्वेषामस्त्रशस्त्रविशेषाणां आचार्यस्य लक्षण-
पूर्वकं संग्रहणं संग्रहपादे द्वितीये दर्शितम् । गुरुसम्प्रदायसिद्धानां
शस्त्रविशेषाणां पुनः पुनरभ्यासी मन्त्रदेवता सिद्धिकरणादिकं तृतीये
पादे । एवं देवतार्चनाभ्यासादिभिः सिद्धानां अस्त्रशस्त्रविशेषाणां
प्रयोगश्चतुर्थे पादे निरूपितः ॥”

ধনুর্বেদ প্রদান করিলে তিনিই তাহা লোক মধ্যে প্রচারিত
করিয়াছিলেন । যথা—

“ অসিঃ পূর্ব ময়া সৃষ্টো দুষ্টনিগ্রহকারণাত্ ।
 ভবাতৃশসমীপস্থো লোকান্ শিচ্চন্ চরত্যসৌ ॥
 ধনুরায়াযুধব্যক্তৌ লম্বেবাঙ্গিঃ স্মৃতো ময়া ।
 তস্মাত্ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি দদানি তব পুত্রক ॥”

ব্রহ্মা পৃথু সমীপে আবিভূত হইয়া বলিলেন, পূর্বে
আমি দুষ্টদমনের নিমিত্ত অসির সৃষ্টি করিয়াছিলাম । সেই
অসি তোমার আয় ব্যক্তির নিকট থাকিয়া দুষ্ট লোকদিগকে
শিক্ষা দান করিতেছে । এক্ষণে আমি মনে করিয়াছি,
তোমাকে আমি ধনুক প্রভৃতি আয়ুধ প্রচারের আদি কারণ
করিব । হে পুত্র ! সেই হেতু তোমাকে আমি অস্ত্র ও
শস্ত্র সকল প্রদান করিব ।

রাজশাস্ত্রের আদি বক্তা ।

“ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচৈতসী মনুঃ !
 যুহস্যতিশ্ব শক্রস্ব ভারতাজী মহাতপাঃ ॥
 বেদব্যাসস্ব ভগবান্ তথা গৌরশিরা মুনিঃ ।
 এতে হি রাজশাস্ত্রাণাং প্রণেতারঃ পরম্পরাঃ ॥
 एवमन्येऽपि मुनयो बहवः परिकीर्त्तिताः” ॥

আদিদেব ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়, দেব-
রাজ ইন্দ্র, প্রচেতা, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ভরদ্বাজ ঋষি, বেদ-
ব্যাস, গৌরশিরা,—এবং অন্যান্য মুনিগণও রাজশাস্ত্রের উপ-
দেষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন । ধনুর্বেদও সেই সকল রাজ-
শাস্ত্রের অন্তর্গত । তাহাতে ধনুক কি ? এবং তৎসম্বন্ধে
কি কি বিধি আছে, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে ।

ধনুর লক্ষণ ।

যদ্বারা বাণ কি প্রস্তর খণ্ডাদি নিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম
ধনু । ইহার অন্য নাম চাপ, ধনু, শরাসন, কোদণ্ড, কাম্যুক,
ইষাস, গুণী, শরাবাপ, ত্রিণতা, ভৃগতা ও অস্ত্র । এ গুলি
সাধারণতঃ শরনিক্ষেপক যন্ত্রের নাম । এতদ্ভিন্ন বিশেষ
বিশেষ নামও আছে । সে সকল নাম ও তাহাদের লক্ষণ
বর্ণিত হইতেছে ।

“প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়কম্ ।

নিজবাক্তবলীন্মানাত্ কিञ্চিদূনং শুমং ধনুঃ ॥

বরং প্রাণীধিকী ধন্বী ন তু প্রাণাধিকং ধনুঃ ।

ধনুষা দীপ্যমানস্তু ধন্বী লভ্যং ন পশ্যতি ॥”

(বৃ, শা, ধ ।

প্রথমে শিক্ষা ধনু ; পশ্চাৎ যুদ্ধ ধনু গ্রহণ করিবেক ।
যে ধনুক নিজের বাহুবলের পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

ন্যূনবল সেই ধনুই উত্তম । অর্থাৎ যাহা সহজে ব্যবহার করা যায় তাহাই ভাল । ধনুকের বল অপেক্ষা ধনুর্দ্ধারীর বল অল্প হইলে ধনুর্দ্ধারী তদ্বারা কাতর বা ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন ; সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ভঙ্গ হইয়া যায় ।

“অতী নিজবলীন্মানং চাপং স্যাৎ শুভকারকম্ ॥”

(বৃ, শ্রা, ঘ ।

সেই জন্তই আপন বলের অনুরূপ ধনুই শুভদায়ক হয় । বস্তুতঃ ধনুক আকর্ষণ করিতে যদি কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে তদ্বারা যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । আবার ধনুকের বল নিতান্ত অল্প হইলেও বাণের বেগ অল্প হইবে এবং বাণের বেগ অল্প হইলে তদ্বারা ছেদভেদও যথাযোগ্য হইবে না ।

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ । দৈব ও মানব । দৈব ধনু অপেক্ষা মানব-ধনু কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণ । দৈব-ধনু সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানবধনুর পরিমাণাদি বর্ণন করা যাইতেছে ।

ধনুর প্রমাণ ।

“চতুর্বিংশাঙ্গুলীহস্তশ্চতুর্দশং ধনুঃস্মৃতম্ ।

নল্পবেন্মানবং চাপং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥”

হৈ ।

২৪ অঙ্গুল পরিমাণে ১ হস্ত পরিমাণ হয় । তাহার চারি হাত লম্বা মানব-ধনুর উত্তম পরিমাণ । তাহা লক্ষণাঙ্কিত হইলেই গ্রাহ্য । ৮টী যব সারি সারি সাজাইলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণকে অঙ্গুল পরিমাণ বলে । এবং ২৪ আঙ্গুলিতে এক হস্ত ।

“চতুর্হস্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্ব্বান্তু মধ্যমম্ ।

কনিষ্ঠন্তু ত্রয়ঃ প্রীক্লং নিত্যমিহ পদাতিনঃ ॥”

[আগ্নেয় ধনুর্বেদ ।

৪ হাত পরিমাণ ধনুই উত্তম । ৩ হাত ধনু মধ্যম । এবং তিন হাত ধনু অধম । এই ক্ষুদ্র ধনু পদাতি সৈন্যের নিত্য ব্যবহার্য্য ।

ধনুকের জাতি বা প্রকার ভেদ ।

“ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রীক্লং শার্ঙ্গবংশং তথৈব চ ।”

[যু, কল্য ।

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ । এক শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গবিকার-জাত, দ্বিতীয় বাংশ অর্থাৎ বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত । এই দ্বিবিধ ধনুর আকার একরূপ নহে ।(১)

(১) । মহিষাদির শৃঙ্গ গলাইয়া পশ্চাৎ তাহা জমাট করিয়া তদ্বারা যে ধনুক নির্ম্মিত হইত, শাস্ত্রে তাহা শার্ঙ্গ ধনু নামে খ্যাত ।

“শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈশ্বং সর্বনামিতম্ ।”

(ধনুর্বেদ ।

শার্ঙ্গিক অর্থাৎ শৃঙ্গজাত ধনু ত্রিণত অর্থাৎ ৩ স্থান নত বা বাঁকান এবং বৈশ্ব বা বংশজাত ধনু সর্বনামিত অর্থাৎ সর্বস্থানে ক্রম-নম্র বা বাঁকান ।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনু ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে । পরন্তু সে শার্ঙ্গ ধনুঃ মনুষ্যের দুস্ত্রাপ্য ও দুর্ধার্য্য । মানবদিগের শার্ঙ্গ ধনু তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট । যথা—

“শার্ঙ্গং পুনর্ধনুর্দ্বিষ্যং তদ্বিশ্বাণোঃ পরমায়ুধম্ ।

বিতস্তি সপ্তমং মাণং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥

ন স্বর্গে নচ পাতালে ন ভূমৌ কস্য চিত্বরে ।

তদ্বনুর্বশমাযাতি ত্যক্ত্বৈকং পুরুষোত্তমম্ ॥

পৌরুষেয়ন্তু যচ্ছার্ঙ্গং বজ্রবৎসরশীমিতম্ ।

বিতস্তিभिঃ সার্ব্বপঙমি-নির্মিতং ধনুচৌঃঘমম্ ॥

প্রাযী যৌজ্যং ধনুঃ শার্ঙ্গং গজযৌঘাস্বসাদিনাম্ ।

রথিনাশ্চ পদাতীনাং বাশং চাপং প্রকীর্তিতম্ ॥”

(বৃ, শার্ঙ্গ ।

এক্ষণে যাহা কাঁচকড়া নামে খ্যাত, সেই বস্তুর দ্বারাই পূর্বের শার্ঙ্গ ধনু প্রস্তুত হইত । ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এদেশীয় পুরাতন লোকেরা শৃঙ্গ দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবহার্য্য বস্তু নির্মাণ করিতে জানিত ।

ইহার অর্থ এই যে, দৈব শাস্ত্রধনু বিষ্ণুর পরমাস্ত্র । তাহার প্রমাণ ৭ বিতস্তি । কনিষ্ঠাঙ্গুলিবর্জিত হস্তকে বিতস্তি বলে । ইহার লৌকিক ভাষা মুটুম্হাত । ইহা বিশ্বকর্মার নিশ্চিত । ইহা বিষ্ণু ব্যতীত স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী, এই ত্রিলোক মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বশীভূত হয় না । যাহা মনুষ্যের নিমিত্ত, তাহার পরিমাণ ৬৥ বিতস্তি । এই ধনু প্রায় গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য্য । রথী ও পদাতি সৈন্তের জন্ত বাংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে ।

বাংশ ধনুর বিবরণ ।

প্রথমতঃ বাংশ ধনুর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট গুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক ।

“ত্রিপর্বং পঞ্চপর্বং বাস্পদ্যপর্বং প্রকীর্তিতম্ ।

নবপর্বঞ্চ কীদৃশং চতুর্ধা শুভকারণম্ ॥

চতুষ্পর্বঞ্চ ষট্পর্বং অষ্টপর্বং বিবর্জयेत् ।”

(বৃ, শ্রাঙ্গ ।

ধনুকের বাস্পটীতে ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ গাঁইট থাকিলে ভাল হয় । ৪, ৬ ও ৮ পর্ব অর্থাৎ গাঁইট থাকিলে তাহা পরিত্যাজ্য ।

“অতিজীর্ণমপকঞ্চ জ্ঞাতিঘৃষ্টং তথৈব চ ।
 দগ্ধং ছিद्रं ন কৰ্ত্তব্যং বাহ্যাম্যন্তরহস্তকম্ ॥
 গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তুদোষসমন্বিতম্ ।
 গলগুণ্যির্ন কৰ্ত্তব্যো তলমধ্যে তথৈব চ ॥”

(বৃ, শা ।

অতিজীর্ণ, অপক ও জ্ঞাতিঘৃষ্ট বাঁশের ধনুক ভাল নহে ।
 বাহিরেই হউক, আর অভ্যন্তরেই হউক, আর হস্ত স্থানেই
 হউক, তাহা দৃষ্ট কি ছিद्रিত থাকিবে না । ধনুককে গুণ-
 হীন বা গুণাক্রান্ত করিবেক না । বাস্তুদোষ বা কাণ্ডদোষ
 না থাকে, গলগ্রন্থি ও তল গ্রন্থি রাখাও কৰ্ত্তব্য নহে ।

“অপকং ভঙ্গমায়াতি অতিজীর্ণন্তু কৰ্কশম্ ।
 জ্ঞাতিঘৃষ্টন্তু সীদেগং কলহী বান্ধবৈঃ সহ ॥
 দগ্ধেন দহ্যতে বৈশ্ম ছিद्रং যুদ্ধবিনাশনম্ ।
 বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যেত তথৈবাম্যন্তরেऽপি চ ॥
 হীনে তু সম্বিতে বাণে সংগ্রামে ভঙ্গকারকম্ ।
 আক্রান্তে তু পুনঃ কাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃढম্ ॥”
 “গলগুণ্যি তলগুণ্যি ধনহানিকরং ধনুঃ ।
 এমির্দোষৈর্বিনির্মুক্তং সৰ্বকার্যকরং স্মৃতম্ ॥”

(বৃ, শাঙ্ক ।

অপক বাঁশের ধনুক ভাঙ্গিয়া যায় । অতিপক বাঁশের
 ধনুক কৰ্কশ হয় অর্থাৎ তাহার উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক গুণ

থাকে না । জ্ঞাতিস্বষ্ট অর্থাৎ যাহা অন্য বাঁশের দ্বারা স্বষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে রূপ বাঁশের ধনুক উদ্বৈগ ও কলহ-জনক । দক্ষ ধনুক ধারণে গৃহদাহ হইবার সম্ভাবনা । ছিদ্ৰিত বা রক্তযুক্ত বাঁশের ধনুকে যুদ্ধহানি হয় । অর্থাৎ তদ্বারা তুমুল যুদ্ধ করা যায় না । (নীরেট্ বাঁশের ধনুকই ভাল ।) বাহুহস্ত ও অভ্যন্তরহস্ত ধনুকে লক্ষ্যের ব্যাঘাত হয় । হীন হইলে বাণ সন্ধান কালে ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা । গুণাক্রান্ত হইলে লক্ষ্যলাভ হয় না । ধনুকের গলদেশে কি তলস্থানে গাঁইট থাকিলে ধনহানি হয় । অতএব, যাহাতে এই সকল দোষ নাই—সেই ধনুকই উত্তম ও কার্যসাধক হয় । বস্তুতঃ—

“কৌমল্যং বর্ণদৃঢ়তা তথৈব চ তদাহতঃ ।”

উত্তম রঙদার অর্থাৎ সুপক্ক, কোমল অথচ দৃঢ় অর্থাৎ উপযুক্ত স্থিতি-স্থাপক-শক্তি-বিশিষ্ট হইলেই তাহা শাদ্র ও বৈণব ধনুর সদৃশ বলিয়া উক্ত হয় ।

উপলক্ষ্যপক ধনু অর্থাৎ গুলতী বাঁশ ।

“উপলক্ষ্যপকং চাপং বৈণবং তদ্বিরজ্জকম্ ।

ত্রিহস্তোত্তমধর্মহীনং ব্রাহ্মণীবিহীনং তু নত ॥”

উপলক্ষ্যপক ধনুক অর্থাৎ যদ্বারা ক্ষুদ্র পাষণ বর্ষণ করিতে হয়, সে ধনুক ও হাত লম্বা এবং বিরজ্জু অর্থাৎ

২ অঙ্গুল কি তাহার কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত হয় এরূপ নিয়মে রজ্জুদ্বয় যোজিত করিতে হয় । যে ধনু লইয়া এক্ষণকার ব্যাধেরা বাঁটুল চালায় তাহা এক্ষণে গুল্‌তী বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ । এইরূপ ধনুকের দ্বারা তৎকালে ক্ষুদ্র পাষণ বর্ষণ করা হইত । পূর্বকালের লোক সকল কিরূপ বলশালী ছিল—তাহাও এই ধনুর্লক্ষণের দ্বারা এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায় । নিরেট আস্ত বাঁশের ধনুক আকর্ষণ করা সামান্য বলের কার্য্য নহে । এক্ষণকার সাঁওতালেরাও অথগু অর্থাৎ আস্ত বাঁশের ধনুক নোয়াইতে পারে না । তাহারা এক্ষণে বাঁশ্ চিরিয়া আন্দাজ তাহার ৩ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা ধনুঃ প্রস্তুত করে । তাদৃশ খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের সাহায্যে তাহারা তীর দ্বারা ছোট ছোট বৃক্ষকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয় । এক্ষণকার খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের বলের সহিত পূর্বকালের অখণ্ডিত নিরেট বাঁশের ধনুকের বলের তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বকালের লোক সকল কিরূপ অসাধারণ বলবীৰ্য্য-শালী ছিল এবং তাদৃশ ধনুকের বেগ এক্ষণকার সামান্য বন্দুকের বেগ অপেক্ষা কত অধিক ছিল—তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে ।

গুণরজ্জু বা ধনুর ছিল ।

“গুণানাং লক্ষণং বহু যাদৃশং কারয়িত্বগুণম্ ।

দৃষ্টমূত্রৈঃ গুণঃ কার্য্যঃ কনিষ্ঠামানসম্মিতঃ ॥

ধনুঃপ্রমাণী নিঃসন্ধিঃ শুদ্ধৈল্লিগুণতন্তুমিঃ ।

বর্জিতঃ স্যাৎগুণঃ স্ফুটঃ সর্বকর্মসহীযুধি ॥”

(৮, শা ।

* পাটের সূতার দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিত স্কুল (মোট) ও ধনুঃপ্রমাণ লম্বা অর্থাৎ ধনুকের সমান লম্বা গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক । উহা নিঃসন্ধি অর্থাৎ উহাতে বোড় থাকিবে না । শুদ্ধ অর্থাৎ বর্জিত, মার্জিত ও নিঃসন্ধিত হইবে । তিনটী তন্তু একত্রে বর্জিত করিয়া (তেতার করিয়া) সরু মোটা না হয়, অথচ মৃণ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিত স্কুল হয়, এইরূপ গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক । এই ছিলা যুদ্ধ-কালে সর্বপ্রকার ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ ।

অন্যপ্রকার ।

অভাবে পটমূত্রস্য হারিণী স্নায়ুরিচ্ছতে ।

গুণার্থমপিবা গ্রাহ্যা স্নায়বী মহিষীগবাস্ ॥

তৎকালহনগী * * * চর্মণা ছাগলেন বা ।

নির্লীমতন্তুমূত্রেণ কুর্যাদ্বা গুণমুত্তমম্ ॥”

* পট শব্দের অর্থ রেশম । কেহ বলেন, কুল্পোকার গুঁটীর সূতা । কেহ বলেন, শণনামক পাট্ গাছের ছালের সূতা । কেহ বলেন, তিসির ছালের সূতা, যাহার অপর ভাষা টৌন ।

পটস্থত্রে অভাবে পশুর স্নায়ু ও চর্মের দ্বারাও উত্তম গুণ প্রস্তুত হইতে পারে। গুণের নিমিত্ত হরিণের স্নায়ু, মহিষের স্নায়ু ও বৃষের স্নায়ু গ্রাহ্য। সদ্যোহত গাভির ও ছাগের চর্ম লোমশূন্য করিয়া তাহার স্তন বা তন্তু (তাইত) প্রস্তুত করণ পূর্বক তদ্বারা উল্লিখিত প্রকারের গুণ প্রস্তুত করিবেক। এই স্নায়ব ও চার্ম গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর ।

“পল্লবংশলচঃ কার্য্যগুণলযা বরীহৃদঃ ।

পটস্থত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্বকর্ম্মসহায়ুধি ॥”

(বৃ, শা ।

পাকা বাঁশের ত্বক্ (টাঁচাডী) লইয়া তদ্বারা উল্লিখিত প্রণালীর গুণ প্রস্তুত করাও যায়। পরন্তু তাহার সর্বাস্থ পটস্থত্রে দ্বারা সন্নদ্ধ করিতে হয়। এই বাঁশের ছালের ছিল অতি দৃঢ়, সর্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ, স্মৃতরাং উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর ।

“ প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসে লগর্কস্য প্রশস্যতে ।

নস্যাস্তদ্বদগুণঃ কার্য্যঃ পবিত্রঃ স্যাবরীহৃদঃ ॥

হৃদ্যার্কসূত্রনলূনাং হস্তালযাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।

তদ্ব্যক্তং ত্রিগুণং কার্য্যং প্রমাণীঃ গুণঃ স্মৃতঃ ।

এবং সৰ্ব্বালোচ্যাত্মজাতীগুণঃ স্যাৎগুণবহুতঃ ॥”

(৮, শা ।

ভাদ্র মাসে আকন্দ বৃক্ষের ত্বক সুপক্ব হয় । সেই সময়ে তাহার ছাল লইয়া তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূত্র সকল বাহির করিবে । সেই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মে গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবে । ইহাও স্থায়ী ও দৃঢ় । মূৰ্খা অর্থাৎ সূচ্মুখ নামক ক্ষুপের পত্রে যে সূত্র পাওয়া যায়, তদ্বারাও উক্ত রূপ গুণ প্রস্তুত করা যায় । ইহার নাম জ্যা । ইহাও মন্দ নহে ।

শর বিধি ।

ধনুক, ধনুকের জ্যা বা ছিলার বিধান বলা হইল ।
এক্ষণে শরবিধান শ্রবণ কর ।

“অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শরাণাং লক্ষণং শুভম্ ।

স্থূলঞ্চ নানি সূক্ষ্মঞ্চ ন পক্বা ন কুম্ভমিজম্ ॥

হীনগ্রন্থিঁ সুপক্বাঞ্চ পাণ্ডরং সমযাদৃতম্ ।

হীনগ্রন্থিঁ বিদীর্ণাঞ্চ বর্জয়েচ্চাটুশ্চ শরম্ ॥”

(৮, শা ।

অতঃপর তীরনির্মাণের শর অর্থাৎ স্বনামপ্রসিদ্ধ তৃণ বিশেষের উত্তম লক্ষণ সকল বলিতেছি । অধিক স্থূল না

হয়, অধিক সূক্ষ্ম বা সরু না হয়, অপক্ক না হয়, সুপক্ক হয়, অথচ কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হয়, গ্রহি না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, একরূপ শর, (ইহা খড়ী কাটীর আয় একপ্রকার বৃহৎ তৃণ) উপযুক্ত সময়ে আহরণ করিবে। (যে সময়ে উহা সুপক্ক হয় ও বর্ষা না থাকে, সেই সময়েই শর উত্তোলনের সময়।) হীন-গ্রহি ও ফাটা একরূপ শর আহরণ করিবে না।

“কঠিনং বর্তুলং কাণ্ডং গৃহীয়াৎ সুপ্রদেশজন্ম।”

কঠিন, বর্তুল অর্থাৎ সূগোল, এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন (জলবহুল, তৃণবহুল ও ছায়াবহুল প্রদেশে যে শর জন্মে— তাহা তত দৃঢ় হয় না এবং কীটাকুলিত হয়। রোদ্র বহুল ও অল্পবালুক উর্বর ক্ষেত্রে যে শর জন্মে—তাহাই সর্বদা সূন্দর হয়।) এই রূপ কাণ্ড অর্থাৎ শর, তীর নির্মাণার্থ গ্রহণ করিবেক।

“দ্বী হস্তৌ মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ঘ্যে স্ম্যৌল্যে কনিষ্ঠিকা।

বিধেয়া শরমাণেষু যন্ত্ৰীজ্বাকর্ষযেতনঃ ॥”

(বৃ, শা।

উল্লিখিত প্রকারের উত্তম শর আহরণ করিয়া, ২ হাত কিসা এক মুষ্টি ন্যূন ২ হাত লম্বা ও স্থূলতায় কনিষ্ঠাঙ্গুলি

পরিমাণ এরূপ শর গ্রহণ করিবেক । যদি কোথাও বক্রতা থাকে, তবে তন্নাশার্থ যন্ত্রে আকর্ষণ করিবেক । অর্থাৎ শরগুলি ২ হাতের অধিক লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না, এবং সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হওয়া আবশ্যক । দুই হাতের অধিক লম্বা না হইবার কারণ এই যে, মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত প্রসারিত করিলে মুষ্টির অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ কর্ণের মূলদেশ পর্যন্তের পরিমাণ বা মাপ দুই হস্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্প । সুতরাং মুষ্টিহীন ২ হাত বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ষণ আকর্ষণ সহজে সম্পাদিত হয় । অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তাহার গতিভঙ্গতাও জন্মে । অপিচ, বাণ ছাড়িয়া দিলে বায়ু তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এজন্য তাহার মূলে পাখীর পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয় । তাহার নিয়মও প্রণালী এইরূপ ।

“ কাকহংসশাঙ্গীনাং মত্স্যাৎকৌশ্ব কেকিনাম্ ।

গৃধ্রানাং কুরাণাঞ্চ পক্ষা এতে সুশীমনাঃ ॥

একৈকস্য শরস্যৈব চতুঃপক্ষানি যীজয়েৎ ।

ষড়ঙ্গুলি প্রমাণেন পক্ষচ্ছৈদ্র কারয়েৎ ।

দশাঙ্গুলিমিতিং পক্ষং শাঙ্গী চাপস্য মার্গনে ।

যোজ্যা দৃঢ়াশ্বতুঃ সংস্থাঃ সন্নদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ ॥

(বৃ, শা ।

পক্ষ যোজনা ব্যতীত বাণের ঠিক্ সরল গতি হয় না । পক্ষ সংযোগ করায় বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং বাণও ঠিক সোজা যায়, কোনোদিক্ বাঁকিয়া যায় না । শর যদি বাঁকিয়া না যায়, ঠিক সোজা যায়, তাহা হইলে ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পড়িতে পারে, নচেৎ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায় । এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানটী নিতান্ত সহজ-বোধ্য নহে । ফল, বাণের সরল গতির নিমিত্ত যে তদগ্রে বা তন্মূলে পক্ষ যোজনা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে ।

কাক, হংস, শশ, মাচ্ছাঙ্গা, বক, ময়ূর, গৃধ ও কুরর,— এই সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম । প্রত্যেক শরে ৪টী করিয়া পালক (সমান্তর করিয়া) সংযোজিত করিবে । পালকগুলি ঠিক্ ৬ অঙ্গুল প্রমাণে লইবে । যে সকল বাণ শাস্ত্রধনুকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে, কেবল সেই সকল বাণে ১০ অঙ্গুল পরিমাণ পক্ষ যোজনা করা আবশ্যিক । বৈণব ধনুর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুল প্রমাণ এবং শাস্ত্রধনুর নিমিত্ত ১০ অঙ্গুল প্রমাণ গৃধাদি পক্ষীর পক্ষ লইয়া (ঠিক সমান আকার ও ওজনে) তাহার ৪টী করিয়া পক্ষ (সমান্তরাল নিয়মে) প্রত্যেক শরে স্নায়ু তন্তুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ করিবেক ।

ধনু নির্মাণ ও শর কল্পনার কথা বলা হইল । ইহার শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে, বাণের নিমিত্ত সুপক্ক শর আহরণ করা কর্তব্য । মুষ্টি ন্যূন দুই হস্ত পরিমাণ লম্বা,

কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য স্থূল ও পর্ব বা গাঁইট্ গুলি সন্নত থাকা আবশ্যক । পক্ষি পক্ষ সংযোজিত তাদৃশ শরের অগ্রভাগে ফলা পরাইতে হয় । নচেৎ তাহা যুদ্ধোপযোগী হয় না । যে শরের অগ্রভাগ স্থূল অর্থাৎ আগার দিকটা মোটা—ধনুর্বিৎ পণ্ডিতেরা তাদৃশ শরকে “স্ত্রী” জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করেন । আর পুঙ্খদেশ যদি স্থূল হয়—তবে তাদৃশ শর “পুরুষ” জাতি বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহার অগ্র পশ্চাৎ সকল ভাগই সমান—তাহা “নপুংসক” জাতি বলিয়া গণ্য । নারীজাতীয় শর অধিকতর দূরগামী হয় । পুরুষ জাতীয় শর দূর বস্তু ভেদের যোগ্য এবং নপুংসক জাতীয় শর লক্ষ্য সাধনার্থ প্রযোজ্য । এই সকল বিধান কেবল বৃদ্ধ শাস্ত্রধর-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় । যথা—

“শরাংশ্বিবিধা স্ত্রীয়া স্ত্রীপুমাংশ্ব নপুংসকাঃ ।

অগ্নী স্তূল্যা ভবেন্নারী পশ্চাৎ স্তূলী ভবেৎ পুমান্ ॥

সমং নপুংসকং স্ত্রীযং তল্লক্ষ্যার্থং নিযীজয়েৎ ।

দূরপাতং যুবত্যাশ্চ পুরুষী ভেদয়েৎ তদম্ ॥”

ইহার বঙ্গানুবাদ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, দেখুন ।

ফল-কল্পনা ।

পূর্বোক্ত প্রকারের স্থূলক্ষণ সম্পন্ন শরের অগ্রভাগে যে ফলা পরাইতে হয়—তাহার বিধান এইরূপঃ—

“ফলন্তু শুদ্ধলৌহস্য সুধারং তীক্ষ্ণমন্নতম্ ।

যীজয়েত্ বজ্রলেপেন শরে পদ্মানুমানতঃ ॥”

(বৃ, শা ।

“অসি” নামক প্রবন্ধে নানাবিধ লৌহের বর্ণনা করিব । শুদ্ধ, বজ্র ও কান্ত প্রভৃতি নাম ও তত্তাবতের লক্ষণ বা পরীক্ষা প্রকারও বর্ণন করিব । সেই সকল লৌহের মধ্যে শুদ্ধ এবং বজ্র এই দুই প্রকার লৌহ অস্ত্রনির্মাণের উপ-যুক্ত । তন্মধ্যে শুদ্ধ লৌহটী তীরের ফলার বিশেষ উপযুক্ত । এজন্য শুদ্ধ লৌহের দ্বারা বিবিধাকার ফলা প্রস্তুত করিবেক । সে সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক । ফলা প্রস্তুত হইলে তদগাত্রে “বজ্রলেপ” প্রদান করা উচিত । ফলাগুলি পক্ষ প্রমাণের অনুরূপ প্রমাণ বিশিষ্ট করিতে হয় । পশ্চাৎ তাহা প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরে সংযোজিত করিতে হয় । শরের ফলা নানা প্রকার । ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রয়োজন আছে । যথা—

“আরামুখং ক্ষুরপ্রস্ত গৌপুচ্ছং চার্দ্বচন্দ্রকম্ ।

সূচীমুখস্ত মল্লস্ত বল্লদন্তং দ্বিমল্লকম্ ॥

কর্ষিকং কাকতুণ্ডস্ত তথান্যান্যান্যনেকশঃ ।

ফলানি দেশে দেশেষু भवन्ति বজ্ররূপতঃ ॥”

আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধ চন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল,

বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুণ্ড ইত্যাদি অনেক আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা প্রস্তুত হয় । *

প্রয়োজন ।

ফলের আকার গত বৈলক্ষণ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে । নিম্নপ্রয়োজনে বা সূদৃশতার জন্য আকারের ভিন্নতা সাধিত হয় না । যে যে আকারের বাণ দ্বারা যে যে কার্য সাধিত হয়, তাহার ২।৪টী নিদর্শন দেখান যাইতেছে ।

“আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্ ।

আরামুখেন বৈ চর্ম দুরপ্রেণ চ কার্মুকম্ ॥

মল্লেন হৃদয়ং বিধ্য দ্বিমল্লেন গুণঃ শূরা ।

লৌহস্ত্র কাকতুণ্ডেন বিধ্য চতুর্ভুজসম্মিতম্ ॥

অন্যত্ গোপুচ্ছকৈ রীযং ।

মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যমস্ত্রুলসম্মিতম্ ॥”

(বৃ, শূ ।

আরামুখ নামক শরের দ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম বা সাঁজোয়া ভেদ করা যায় । অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা প্রতিষোদ্ধার যন্তুক

* আরা—চর্ম ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকাকার যন্ত্র । “টেকো” ইতি ভাষা ।

ছেদন সাধিত হয় । আরামুখ অথবা সূচীমুখ বাণের দ্বারা চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করা যায় । কার্ম্মুক অর্থাৎ ধনুক ছেদন করিবার জন্য ক্ষুরপ্র নামক বাণ প্রস্তুত করিতে হয় । হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ভল্ল অস্ত্রই প্রযোজ্য । ধনুকের গুণ ও আগম্যমান শর কাটিবার জন্য দ্বিভল্ল নামক বাণই উত্তম । কাকতুণ্ডাকার ফলার দ্বারা তিন অঙ্গুল পরিমিত লৌহ বিদ্ধ করা যায় । গোপুচ্ছাকার শরের দ্বারা অগণ্য অনেক কার্য সাধিত হয় এবং লৌহকণ্টকমুখ শরের দ্বারা অঙ্গুলত্রয় পরিমিত ছিদ্র উৎপাদন করা যায় ।

ফলপায়ন অর্থাৎ ফলায় পান দিবার বিধি ।

ছেদ ভেদাদি বহুবিধ কার্যের উপযুক্ত বহুবিধ আকারের ফলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রবিদ্যার মতানুসারী পান্ দিতে হয় । পানের গুণেই অস্ত্রের ধার উত্তম হয়, আবার পানের দোষেই তাহার ধার মন্দ হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন । পরন্তু কিরূপ পান দিলে অস্ত্রের ধার ভাল হয়, দৃঢ়ভেদী হয়, তাহা হয়তো এক্ষণকার শস্ত্রকারগণের অবিদিত আছে । ফল, অবিদিত থাকা উচিত নহে । যাহাই হউক, বৃদ্ধ শাস্ত্রধর প্রোক্ত পায়ন বিধিটী বঙ্গভাষায় আনীত করা উচিত বোধ হইতেছে । তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের পায়ন বিধান গুলি আমরা

“অসি” নামক প্রবন্ধে লিখিব, এক্ষণে তীরের ফলার পায়ন-
বিধিটী এতৎপ্রবন্ধে ব্যক্ত করিব । তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান
আছে ;—

“ফলস্য পায়নং বক্ষ্যে বনৌষধিবিলিপনৈঃ ।

যেন দুর্ভেদ্যবর্মাণি মেদয়েত নরুপর্যবত্ ॥”

(হৃ, শা ।

উৎকৃষ্ট ঔষধি (উদ্ভিজ্জ) লিপ্ত করিয়া যে ফলপায়ন
বিধান আছে,—যে বিধানে পান দিলে দুর্ভেদ্য লৌহবর্ষকেও
বৃক্ষপত্রের গ্ৰায় ভেদ করা যায়,—সেই বিধানটীই বলি-
তেছি ।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং গৌমূত্রেণ তু পেষয়েত্ ।

অতিশীত মনাবিদ্ধং পীতং নষ্টং তথৌষধম্ ॥

অনেন লেপয়েচ্ছত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েত্ ।

ততো নির্বাপিতং তৈলে লৌহং তত্র বিশিষ্যতে ॥

পঞ্চাভিলবণৈঃ পিষ্টং মধুসিক্তাঃ সসর্ষপৈঃ ।

এभिঃ প্রলেপয়েচ্ছত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েত্ ।

শিখিগ্রীবানুবর্ণাভং তপ্তপীতং তথৌষধম্ ।

ততস্তু বিমলং তীয়ং পায়য়েচ্ছত্রমুত্তমম্ ॥”

পিপুল, সৈন্ধব লবণ, কুড় (বণিক দ্রব্য), এই তিন দ্রব্য
গোমূত্রের সহিত পিষ্ট করিবে । এরূপ পিষ্ট করিবে যে
ঔষধগুলির অবয়ব যেন নষ্ট হইয়া যায় । তাদৃক পিষ্ট হইলে

শীত গুণবিশিষ্ট, অনাবিক্ত ও পীতবর্ণ হইবে । অনন্তর তাহার দ্বারা শরের ফলা কি অণু কোন শস্ত্র প্রলিপ্ত করিবে । অনন্তর তাহা অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে অর্থাৎ উত্তমরূপে দন্ধ করিবে । পশ্চাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠাইয়া শস্ত্রের দৃশ্য অগ্নি যখন নির্বাপিত হইবে, অথচ উত্তাপ সম্পূর্ণ থাকিবে, তখন তাহা তৈলে নিক্ষিপ্ত করিবে । এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা শস্ত্রের লৌহে স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হইবে ।

দ্বিতীয় প্রকার ।

পঞ্চ লবণ, * সর্ষপ, ও মধু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পিষ্ট করিয়া শস্ত্রকার তাহাতে প্রলেপ দিবেন, পরে সেই প্রলিপ্ত শস্ত্রকে অগ্নি দন্ধ করিবেন । যখন তাহাতে ময়ুর পুচ্ছের রঙ দেখা যাইবে, তখন জানিবেন যে, শস্ত্র সেই

* “সৌবর্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিভ্রমীদ্ধিহমেব চ ।

সামুদ্রেন সহৈতানি দশ্চ স্যুর্লবণানি চ ॥”

(বৈদ্যক ।

সৌবর্চল—সচর লবণ । সৈন্ধব—স্বনামপ্রসিদ্ধ লবণ । উদ্ভিদ্—ক্ষারী লবণ অর্থাৎ বৃক্ষাদি দন্ধ করিয়া যাহা প্রস্তুত হয় । সামুদ্র—সামর লবণ ।

ঔষধ পান করিয়াছে । ইহার পরেই তাহাকে নিশ্চল জল পান করাইবেন অর্থাৎ স্বচ্ছ সলিলে নিষ্কিণ্ট করিবেন । এত-
ত্তিন্ন বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থে আরও কএক প্রকার শস্ত্র-
পায়নের বিধান আছে তাহাও এস্থলে সন্নিবিষ্ট করা গেল ।

“বড়বীটুকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পানেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিঃ ।
অপ্যপিত্তমৃগাস্থ বস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদ্যে সতাল গমৈঃ ॥
আকং পয়ী উড়ু, বিষাণমসীসমেতং
পারাবতাখু শক্ৰতা চ যুতং প্রলিপঃ ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ ॥
চারে কদল্যা মথিতেন যুক্তৈ
দিনীষিতে পায়িতমায়সং যত্ ।
সম্যক্ শিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং
ন চান্যলৌহেষুপি তস্য কৌণ্ড্যম্ ॥”

বড়বা—ঘোটকী । উড়ু—উট্ । করেণু—হস্তিনী ।
এই সকল পশুর দুগ্ধ পান করাইলে তীরের ফলার অতি
উৎকৃষ্টে ধার হয় । মাছের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ
ও ছাগী দুগ্ধ পান করাইলে হস্তিশুও ছেদন করিবার উপ-
যুক্ত ধার হয় ।

অর্কক্ষার অর্থাৎ আকন্দের আটা, ছুড়ু শৃঙ্গের অঙ্গার, পায়রার ও ইন্দুরের বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া (পেষণ পূর্বক) তদ্বারা অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবেক । পশ্চাৎ তাহাতে তৈলসেক পূর্বক দক্ষ করিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে পান দিবেক । অনন্তর তাহাকে শাণিত করিবেক । এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তুত্রে ভাঙ্গিবে না । প্রত্যুত প্রস্তুত্রেই তদ্বারা বিদীর্ণ হইবেক ।

লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র কদলী ক্ষারে প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন পরে পান দিয়া উত্তম শাণিত করিলে তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিবে না এবং অগ্নি লৌহেও তাহার ধার বা তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইবে না ।

নারাচ ও নালীক ।

শর বিধান বলা হইল । পরন্তু নারাচ ও নালীক, এই দুই বাণ উহার অন্তর্গত নহে । সুতরাং এই দুই বাণের কথা স্বতন্ত্র বলা আবশ্যক ।

“সর্বলৌহাস্তু যি বাণা নারাচাস্তি প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

দশমিঃ চতুর্লৈঃ পদ্বৈঃ যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ ॥”

(বৃ. শ্রা ।

যে সকল বাণ সর্বলৌহ অর্থাৎ যাহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম “নারাচ” । শরের বাণে যেমন ৪ টা

পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ বাণে তেমনি ৫টা পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না।

নালীকাস্ত্র ।

লঘবী নালিকা বাণা নলয়ন্ত্রেণ নীহিতাঃ ।

অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥”

(হ, শা ।

লঘু নালীক নামক বাণ সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়। এই নালিক বাণ উচ্চ, দূর, ও দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার কালেই প্রশস্ত। এই নালিক যে আধুনিক বন্ধুক অস্ত্রের অনুরূপ তাহা আমরা “আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র” নামক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি।

বিবিধ ধনুক ও বিবিধ শরনির্মাণের পদ্ধতি বর্ণিত হইল, এক্ষণে তদুভয়ের ব্যবহার প্রণালী বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থান, পরে মুষ্টি, পশ্চাৎ আকর্ষণের কথা বলিব।

স্থান ।

স্থান শব্দের অর্থ অবস্থান। কখন দাঁড়াইয়া, কখন বক্র হইয়া, কখন বা নত হইয়া, যুদ্ধ করা আবশ্যক হয়। একজন্ত আবশ্যক অনুসারে দাঁড়াইবার, বসিবার, বক্র হইবার, ও নত হইবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম, কৌশল, “কাএদা”

আছে। সেই সকল কায়দার নাম “স্থান”। এই স্থান নামক কাএদা গুলি আয়ত্ত ও অভ্যস্ত করিতে হয়, নচেৎ যুদ্ধ করা যায় না। “কাএদায়” না থাকিলে, শরীর বিচলিত হইয়া গিয়া, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্মায় ও শীঘ্রই প্রান্ত হইতে হয়। এজন্য ধনুর্যোদ্ধার পক্ষে অগ্রে স্থানগুলি অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই স্থান বৃদ্ধ শাস্ত্র-ধরের মতে আট প্রকার। যথা—

আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, বিশাখ বা বিশাল, সমপদ বা সমপাদ, বিষমপাদ, দূরক্রম, গরুড়ক্রম ও পদ্মাসনক্রম। ইহার অগ্ৰ নাম স্থানক। স্থানকের লক্ষণগুলি যথাক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

আলীঢ়—

“অগ্রতী বামপাদে দক্ষিণে স্থানুকুচ্চিতম্ ।

আলীঢ়ন্তু প্রকর্তব্যং হস্তদ্বয়মুবিস্তরম্ ॥”

বাঁ পা সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ পা পিছুদিকে কুঞ্চিত করিয়া আলীঢ় নামক স্থানে অবস্থান করা কর্তব্য। পরন্তু তাহা যেন পদদ্বয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত না হয়।

প্রত্যালীঢ়—

“প্রত্যালীঢ়ং প্রকর্তব্যং সম্যঙ্গৈবানুকুচ্চিতম্ ।

দক্ষিণে পুরস্তদন্তু দূরপাতে বিশিষ্টম্ ॥”

আলীঢ়কে বুৎক্রম করিলে তাহা প্রত্যাালীঢ় হইবে । এই প্রত্যাালীঢ়ে করিতে হয় কি ? না বাঁ পা পিছুদিকে কুক্তিত ও দক্ষিণ পা সম্মুখে হস্তদ্বয় পরিমাণ বিস্তারে স্থাপন । এই প্রত্যাালীঢ় স্থানটী দূরে শরনিক্ষেপ করিবার বিশেষ উপযোগী । বস্ত্ততঃ একভাবে অধিকক্ষণ থাকিলে শরীর শ্রান্ত হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে স্থিতি করিতে হয় । সেই জন্তই যুদ্ধতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিবিধ স্থান ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । যিনি যত অধিক স্থান অভ্যস্ত করেন— তিনি তত অধিক কাল বিনা শ্রান্তিতে যুদ্ধ করিতে পারেন ।

বিশাখ—

“পাদৌ স্তুবিস্তরৌ কার্যৌ সমৌ হস্তদমাণতঃ ।

বিশাখস্থানকং স্নিযং কুটলক্ষ্যস্য বেধনে ॥”

দুই পা সমায়ত ও হস্তপ্রমাণ অন্তরিত করিয়া দাঁড়াইলে তাহা বিশাখ নামক স্থান বলিয়া জানিবে । কুট লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার সময় এই রূপ স্থানই উৎকৃষ্ট ।

সমপদ—

“সমপদে সমৌ পাদৌ নিঃকম্যৌ চ স্তুসংগতৌ ॥”

উত্তমরূপ মীল থাকে অথচ না কাঁপে এই রূপ ভাবে দাঁড়াইলে সমপদ বা সমপাদ নামে খ্যাত হয় ।

বিষমপদ—

“অসমস্ত্র পুরী বাসং হস্তমানেণ তং বিদুঃ ।”

বামপদ যদি হস্তমাত্র পরিমিত অন্তরে নিশ্চলরূপে
বিশ্রান্ত রাখা যায় তাহা হইলে তাহা অসম পদ বা বিষমপদ
আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।

দদু'রক্রম—

“আকুञ্চিতীৰু হৌ যত্র জানুভ্যাং ধরণীং গতৌ ।

দদু'রক্রমমিত্যাঙ: স্থানকং দৃढমেদনে ॥”

যে অবস্থানে দুই উরু আকুञ্চিত ও জানুদ্বয় ভূতলে ন্যস্ত
করিতে হয়, ধনুর্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে দদু'রক্রম
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । দৃঢ়লক্ষ্য ভেদ কালে এইরূপ অব-
স্থান বিশেষ উপযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

গরুড়ক্রম—

“স্বয়ং জানুগতং ভূমৌ দক্ষিণে স্তুকুञ্চিতম্ ।

অগ্রতী যত্র দানব্যাং তং বিদ্যাৎ গরুড়ক্রমম্ ॥”

বামজানু ভূপাতিত করিয়া, দক্ষিণজানু কুञ্চিত করতঃ
সম্মুখে রাখিলে, তাহাতে যে অবস্থান নিষ্পন্ন হইবে তাহাকে
গরুড়ক্রম বলিয়া জানিবে ।

পদ্মাসনক্রম—

“পদ্মাসনং প্রসিদ্ধং স্যাৎ উপবিষ্ট্য যথা ক্রমম্ ।

ঘন্বনাং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং স্থানকং শুভলক্ষণম্ ॥”

পদ্মাসন কি ? তাহা সকল ব্যক্তিই জানেন । ধনুর্ধারী যদি সেই সুপ্রসিদ্ধ আসনের নিয়মে উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে তাহা পদ্মাসন ক্রম বলিয়া জানিবে ।

আগ্নেয় ধনুর্বেদে এই স্থান সম্বন্ধে অত্র রূপ বিধি দৃষ্ট হয় । এতলে সে গুলিও প্রদর্শিত হইল, পাঠকগণ দৃষ্ট করুন ।

সমপদ—

“অঙ্গুষ্ঠ গুল্ফপাণীভ্রুয়ঃ স্লিষ্টাঃ স্যুঃ সহিতা যদি ।

দৃষ্টং সমপদং স্থানমেতল্লক্ষণতস্তথা ॥”

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ অর্থাৎ পায়ের গোড়, পাণি ও পদ যদি একত্রিত ও প্রস্লিষ্ট হয় তবে তাহা “সমপদ” নামক স্থান ।

বৈশাখ—

“বৃদ্ধাঙ্গুলিস্থিতৌ পাদৌ স্তম্ভজানুবলাবুভৌ ।

ত্রিবিদস্তান্তরা স্থানমেতদ্বৈশাখমুচ্যতে ॥”

জানুদ্বয় স্তম্ভ এবং পাদদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া তিন বিতস্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বসিলে কি দাঁড়াইলে তাহাকে বৈশাখ নামক স্থান বলা যায় ।

মণ্ডল—

“হংস পঙ্ক্ত্যা কৃতিসমৌ দৃশ্যেতে যত্র জানুনী ।

চতুর্বিদস্তল্লিবিচ্ছিন্নে তদেন্মণ্ডলং স্মৃতম্ ॥”

মধ্যে যদি চারি বিতস্তি বিচ্ছেদ থাকে এবং জানুদ্বয় যদি হংস শ্রেণীর আয় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ স্থিতিকে মণ্ডল সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় ।

আলীঢ়—

“হলাক্ৰান্তিময়ং যচ্চ সন্ধ্যজানুদক্ষিণম্ ।

বিতস্ত্যঃ পঞ্চ বিস্তারে তদালীঢ়ং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

দক্ষিণ জানু ও উরু স্তব্ধ করণ পূর্বক লান্ধলাকৃতি রূপে স্থিত হইলে তাহা আলীঢ় নামে কথিত হয় ।

প্রত্যালীঢ়—

“এতদেব বিপর্য্যস্তং প্রত্যালীঢ়ং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

এই আলীঢ় যদি বিপরীতক্রমে কৃত হয় তবে তাহার নাম প্রত্যালীঢ় হইয়া থাকে ।

দণ্ড—

“তির্য্যগ্ভূতী ভবেদ্বামী-দক্ষিণীঃপি ভবেদ্রজুঃ ।

গুল্ফৌ পাণিগ্রহী চৈব স্থিতৌ পঞ্চাঙ্গুলান্তরৌ ।

স্থানং দণ্ডং ভবেদিতন্ দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্ ॥”

বামপদ বক্রীকৃত এবং দক্ষিণ পদ ঋজু অর্থাৎ সোজা করিবে । গুল্ফ দ্বয়ও ৫ অঙ্গুলি অন্তরে স্থাপিত করিবে । এইরূপ করিলে তাহাকে দণ্ড নামক স্থান বলিবে ।

বিকট—

“অথবা দক্ষিণং জানু কুজং ভবতি নিশ্চলম্ ।

দৃষ্টায়তী ভবেদেধী চরণঃ সহ জানুনা ॥

এবং বিকটমুদ্রিতং দ্বিহস্তান্নরমাযতম্ ॥”

দক্ষিণ জানু কুজ (কুঁজো) ও নিশ্চল করতঃ বামজানু ও বামপদ যষ্টির আয় আয়ত করিবে । এইরূপ করিলে তাহা বিকট নামক স্থান হইবে ।

সম্পূট—

“জানুনী দ্বিগুণে স্যাতা-মুতানৌ চরণাবুভৌ ।

অনেন বিধিযোগেন সম্পূটং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

জানুদ্বয় দ্বিগুণ অর্থাৎ ভুগ্ন করিবে এবং চরণদ্বয় উত্তান করিবে । করিলে তাহা সম্পূট নামক স্থান হইবে ।

স্বস্তিক—

“কিञ্চিত্ বিবৰ্ত্তিতৌ পাদৌ সমদৃষ্টায়তৌ স্থিরৌ ।”

“দৃষ্টমেব যথান্যায়ং ষোড়শাঙ্গুলমাযতম্ ।

স্বস্তিকেনাচ কুব্ধীত প্রণামং প্রথমং দ্বিজ ॥”

পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত করিয়া সমান ও দণ্ডাকারে স্থাপন পূর্বক তাহা নিশ্চল রাখিবে । তাহা হইলে তাদৃশ স্থিতি স্বস্তিক বলিয়া গণ্য হইবে । স্বস্তিকাখ্যস্থানকে স্থিত

হইয়া প্রথমতঃ প্রণাম করিতে হয় ।* এতদ্বিন্ন বৈশম্পায়নীয় ধনুর্বেদে অন্য পাঁচ প্রকার স্থানকের উল্লেখ আছে । যথা—

“প্রত্যালাদিক মালাদং তথা সমপদং স্মৃতম্ ।

বিশালং মণ্ডলং চৈতি পঞ্চ ধানুস্কটনয়ঃ ॥”

প্রত্যালাদিক, মালাদিক, সমপদ, বিশাল বা বিশাখ ও মণ্ডল,—
এই পাঁচ প্রকার ধনুর্যোদ্ধার রূতি অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থানের নিয়ম
বিশেষ । পরন্তু উক্ত পাঁচ প্রকার স্থানের লক্ষণ গুলি সম-
স্তই বর্ণিত হইয়াছে ।

মুষ্টি ।

মুষ্টি শব্দের অর্থ “মুট” অর্থাৎ ধরিবার নিয়ম বা
“কাএদা” । ধনুর্যুদ্ধে যেমন দাঁড়াইবার কাএদা আছে,
তেমনি, ধনুক ও বাণ ধরিবারও কাএদা আছে । তন্মধ্যে
গুণে অর্থাৎ ধনুকের ছিলায় বাণ স্থাপন করিয়া, তাহা
ষে রূপ কাএদায় ধরিতে হইবে, সে সমস্তই ধনুর্বেদে বর্ণিত
আছে । দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা ধনুকের ছিলা ও
বাণের পুঙ্খ একযোগে ধৃত করিবার নিয়মের নাম “গুণমুষ্টি”
এবং বাম হস্তে ধনুকের মধ্যভাগ ধারণ করিবার নাম “ধনু-
মুষ্টি” । এই মুষ্টির লক্ষণ ও নাম এইরূপঃ—

* আগ্নেয় ধনুর্বেদের শ্লোকগুলি উত্তমরূপে বোধগম্য করিতে না
পারায় যথাশ্রুত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, উত্তমরূপে বুঝাইতে পারিলাম না ।

“পতাকা বজ্রমুষ্টিস্ব সিংহকর্ণস্তথৈবচ ।

মৎসরী কাকতুণ্ডী চ যীজনীয়া যথাক্রমম্ ॥”

(বৃ, শা।)

গুণ মুষ্টি পাঁচ প্রকার। পতাকা মুষ্টি, বজ্র মুষ্টি, সিংহকর্ণ মুষ্টি, মৎসরী মুষ্টি ও কাকতুণ্ডী মুষ্টি। এই সকল মুষ্টি যথা-যোগ্য কার্যে যোজনা করিবেক।

পতাকা মুষ্টি।

“দীর্ঘা তু তর্জনী যত্র আশ্রিতাঙ্গুষ্ঠমূলকম্ ।

পতাকা সা চ বিহীয়া নলিকা দূরমীচয়ে ॥”

যে স্থলে তর্জনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল দেশ অবলম্বন পূর্বক দীর্ঘ বা আয়ত রাখিতে হয়, সে স্থলে তাদৃশ মুষ্টির নাম “পতাকা”। এই পতাকা মুষ্টি নালিকাস্ত্র প্রয়োগ কালে ও দূরনিষ্ক্ষেপ কালে বিশেষ উপযোগী।

বজ্র মুষ্টি।

“তর্জনী মধ্যমা মধ্যমঙ্গুষ্ঠী বিশতে যদি ।

বজ্রমুষ্টিস্তু সা হ্যেয়া স্মূলনারাচমীচয়ে ॥”

তর্জনী ও মধ্যম এই অঙ্গুলিদ্বয়ের অন্তরালে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবিষ্ট করতঃ মুষ্টি বন্ধন করিলে তাহা “বজ্র মুষ্টি” বলিয়া অভিহিত হইবে। এই মুষ্টি স্মূল বাণ ও নারাচ বাণ পরিত্যাগ কালে বিধেয়।

বৈশম্পায়িনোঃ
আছে। যথা—

স্বতম্।

হুতমঃ ॥

ল বা বিশাখ ও মণ্ডল,-
খাঁৎ যুদ্ধাবস্থানের নিয়ম
স্থানের লক্ষণ গুলি সম-

১২ ধরিবার নিয়ম বা
ইবার কাএদা আছে,
এদা আছে। তন্মধ্যে
স্থাপন করিয়া, তাহা
মস্তই ধনুর্বেদে বর্ণিত
রা ধনুকের ছিলা ও
মের নাম “গুণমুষ্টি”
করিবার নাম “ধনু-
পঃ—

বোধগম্য করিতে না
বুঝাইতে পারিলাম না।

সিংহ কর্ণ ।

“উন্নানাক্ষুণ্ঠমূলেন সর্বাঙ্গুল্যঃ প্রপীড়িতাঃ ।

কুচ্ছিতাঃ সিংহকর্ণঃ স্যাৎ ধনুঃ সম্পীড়নে স্মৃতঃ ॥”

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সিংহ কর্ণের আয় উত্থাপিত করিয়া তাহার মূলদেশ দ্বারা সমুদয় অঙ্গুলি কুচ্ছিত ও সম্পীড়িত অর্থাৎ চাপিয়া ধরিবেক । এতাদৃশ মুষ্টির নাম সিংহ কর্ণ এবং ইহা ধনুক ধারণ কালে প্রশস্ত । কেহ কেহ বলেন, ইহা গুণাকর্ষণেই প্রযোজ্য ।

মৎসরী ।

“অঙ্কুশনখমূলী তু তর্জ্জন্যং সুসংস্থিতম্ ।

মৎসরী সা চ বিহ্রীয়া চিত্রলক্ষ্যস্য বেধনে ॥”

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের মূলস্থানে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সূদৃঢ়রূপে সংস্থাপন পূর্বক মুষ্টি প্রস্তুত করিলে তাহা “মৎসরী” নাম প্রাপ্ত হয় । এই মুষ্টি চিত্র লক্ষ্য বেধ কালে বিধেয় । (চিত্র লক্ষ্য কি ? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ।)

কাকতুণ্ডী ।

“অঙ্কুশাগ্রে তু তর্জ্জন্যা মুখমত্র নিবেশিতম্ ।

কাকতুণ্ডী চ সা হ্রীয়া সূক্ষ্মলক্ষ্যেষু যীজিতা ॥”

বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনীর মুখ যদি দৃঢ় সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা কাকতুণ্ডী নামক মুষ্টি হয় । এই মুষ্টি গুণ ধারণ কালে ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধকালে প্রযোজ্য ।

ধনুমুষ্টি ।

শুণ ধারণ মুষ্টির ত্রায় ধনুর্ধারণের মুষ্টির নিয়ম অর্থাৎ বিশেষ কাএদা আছে । ধনুর্ধারণের মুষ্টিগুলি বাম হস্তের দ্বারা বিধেয় এবং তাহা তিন প্রকার । তাহার নামান্তর ধনুমুষ্টি ও সন্ধান । যথা—

সম্মানং ত্রিবিধং প্রোক্তং অধ জঙ্ঘনং সমং সদা ॥

যীজয়েৎ ত্রিপ্রকারং হি কার্য্যেণ্বপি যথাক্রমম্ ॥

অধস্ব দূর পাতিলে সমং লক্ষ্যে সুনিশ্চল ।

দৃঢ়াঙ্গীটে প্রকুর্ঝীত জঙ্ঘনং সম্মানযোগতঃ ॥”

(বৃ, শা ।

যোগ্যতা অনুসারে মুষ্টি সন্ধান তিন প্রকার । অধঃ-সন্ধান, উর্দ্ধসন্ধান ও সমসন্ধান । এই তিন প্রকার সন্ধান যথাযোগ্য কার্য্যে যোজনা করিবে । দূরপাতন কালে অধঃ-সন্ধান, নিশ্চললক্ষ্য স্থলে সমসন্ধান এবং দৃঢ়াঙ্গীটকালে উর্দ্ধসন্ধান প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

ব্যয় বা শরাকর্ষণপ্রণালী ।

শরের পুঞ্জ দেশটি ধনুকের ছিলায় বসাইয়া দিয়া তাহার কায়াটি ধনুকের মধ্যগাত্রে ধৃতস্থানের পাশ্বে শায়িত রাখিয়া আকর্ষণ করিবেক । যতই আকর্ষণ করিবে, ধনুক ততই নম্র হইয়া আসিবে । প্রসারিত বাম হস্তের মুষ্টি স্থির বা

অবিচলিত অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকিবে । পরন্তু দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধৃত শরপুঞ্জ ও জ্যা ক্রমে আকর্ষিত হইয়া কর্ণ পর্যন্ত আসিবে । আকৃষ্ট গুণ কর্ণ পর্যন্ত আসিলেই শরের দীর্ঘতার শেষ হয় এবং ধনুকেরও বক্রতা পূর্ণ হইয়া অর্ধচন্দ্রাকার ধারণ করে । এতদ্রূপ ধনুরাকর্ষণের নাম “ব্যয়” । এই ব্যয় নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটি সমধিক বলসাম্য । ধনু-ধারী বীর এই ক্রিয়ায় দক্ষ হইলেই বাণ যুদ্ধে পারগতা লাভ করিতে পারেন । পরন্তু এই ব্যয় অথবা আকর্ষণ ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা কাএদা আছে । সেই সকল বিশেষ বিশেষ নিয়মের বা কাএদার নাম ‘কৈশিক’ ‘সাত্ত্বিক’ ‘বৎসকর্ণ’ ‘ভরত’ ও ‘স্কন্ধ’ । এই পঞ্চবিধ ব্যয় বা ধনুরাকর্ষণ পঞ্চবিধ যুদ্ধের উপযোগী । যথা—

“কৈশিকঃ কেশমূলে বৈ শরঃ শূটঙ্গৈ চ সালিকঃ ।

শ্রবণে বৎসকর্ণস্ব গ্ৰীবায়াং भरतीभवेत् ॥

अंशके स्कन्धनामा च व्यथाः पञ्च प्रकीर्तिताः ।

कैशिकश्चित्तयुद्धेषु अधीलक्ष्येषु सালिकः ॥

तिर्यक्लक्ष्ये वत्सकर्णे भरती दृढभेदने ।

दृढभेदे च दূरे च स्कन्धनामानमिष्यते ॥”

(বৃ, শা ।

অর্থাৎ কেশমূল পর্যন্ত শরাকর্ষণ করিলে তাহার নাম ‘কৈশিক’ । শৃঙ্গ পর্যন্ত শরাকর্ষণ “সাত্ত্বিক” । শ্রবণে অর্থাৎ

কর্ণস্থান পর্যন্ত আকর্ষণ করিলে, তাহা “বৎসকর্ণ” । গ্রীবার দিকে আকর্ষণ করিলে তাহা “ভরত” । অংশ অর্থাৎ স্বক-সংলগ্ন আকর্ষণের নাম “স্বক” । ধনুর্বিদগ্গণ এই পাঁচ প্রকার ব্যয় অর্থাৎ আকর্ষণ প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন । আরও বলিয়াছেন, যে চিত্রযুদ্ধকালে কৈশিক ব্যয় আবশ্যিক । লক্ষ্য যদি অধঃস্থ হয়, তবে সাত্ত্বিক ব্যয় গ্রাহ্য । তির্যক্ লক্ষ্যস্থলে বৎসকর্ণ এবং দৃঢ়-বেধন-কালে “ভরত” । দৃঢ় ভেদন ও দূর পাতন স্থলে “স্বক” নামক ব্যয় অবলম্বন করিবেক ।

উল্লিখিত প্রকারে আকর্ষণ পূর্বক তাহা লক্ষ্যের উপর পরিত্যাগ করিতে হইবেক । সূতরাং বাণ পরিত্যাগ সম্বন্ধেও কএক প্রকার বিধান লিখিত হইয়াছে । বামহস্তে যে ধনুক ধরিতে হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে বাণের পুঙ্খ অর্থাৎ গোড়াটী ধরিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও কএক প্রকার উপদেশ আছে । যথা—

“ধনুর্বেদবিধানেন নাম্য বামকরেণ তত্ ।

দক্ষিণেন জ্যয়া যীজ্যং পৃষ্ঠে মধ্যম গৃহ্য তত্ ॥

বামাঙ্গুষ্ঠং তদুদরে পৃষ্ঠে তু চতুরঙ্গুলীঃ ।

পুঙ্খমধ্যে জ্যয়া যীজ্যং স্বাঙ্গুল্যবিরেণ তু ॥

আকর্ণন্তু সমাক্রম্য দৃষ্টিং লক্ষ্যে নিবেশ্য চ ।

লক্ষ্যাৎ লক্ষ্যং যন্তু ততপুঙ্খঃ প্রয়োগবিন্ ॥

যদা মুञ্চেত্ শরং বিধীত্ কৃতহস্ত মুদীচ্যতে ।

এবং বাণাঃ প্রযোক্তব্যে হ্যাত্মা রক্ষ্যা প্রযতনতঃ ॥”

(বৈ, ধনু ।

ধনুর্বেদোক্ত বিধি অনুসারে, বাম হস্তের দ্বারা ধনুক নত করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহাতে জ্যা অর্থাৎ গুণ যোজনা করিবেক । অনন্তর ধনুকের পৃষ্ঠদিক অবলম্বন করিয়া মধ্যস্থলটী ধারণ করিবেক । ধনুকের পৃষ্ঠদেশে ৪টা অঙ্গুল ও তাহার উদরে অর্থাৎ কোলের দিগে বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ় বা নিশ্চলরূপে থাকিবেক । বাম হস্তের দ্বারা এতদ্রূপ মুষ্টিবন্ধনে ধনুর্ধারণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তে শরগ্রহণ করতঃ তাহার পুঙ্খ দেশটী জ্যায় অর্থাৎ ছিলায় বসাইবেক, এবং তাহা এক্রপ ভাবে ধরিবেক যে, যেন তাহা অঙ্গুলির অন্তরালে থাকে অর্থাৎ বাণের পুঙ্খ ও ধনুকের ছিলা যেন অঙ্গুলীর মধ্যে থাকিয়া দৃঢ়নিষ্পীড়িত হয় । পশ্চাৎ তাহা কর্ণপর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যের উপর মন ও দৃষ্টি রাখিয়া, সেই বাণ প্রয়োগ করিবে এবং যত্ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিবে । যখন দেখিবে যে দৃষ্টি ও মন লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কিছুতে যায় না, তখনই জানিবে, ধন্বী কৃতহস্ত হইয়াছেন ।

ধনুক, শর, শরের ফলা, জ্যা, মুষ্টি ও ধনুকের ছিলা বা বাণ-প্রয়োগ-প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষিতব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে ধরিবার পদ্ধতি,

লক্ষ্য ও শ্রমক্রিয়া প্রভৃতি কতিপয় ধানুর্বেদ্য বস্তুর
বর্ণনা করিব ।

লক্ষ্য বা বেধ্য ।

শর দ্বারা যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে তাহাই লক্ষ্য ।
যাহাকে বিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিবে তাহাও লক্ষ্য । যুদ্ধ-
কালে নানা প্রকার লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হয় । কোন বস্তু চক্র-
বৎ ঘুরিতেছে ; তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে । কেহ
বায়ুবেগে দৌড়িতেছে—তাহাকেও বিদ্ধ করিতে হইবে ।
কোন বস্তু অত্যন্ত কঠিন—তাহারও ভেদসাধন করিতে
হইবে । কোন পদার্থ অতি বৃহৎ তাহাকেও ছিন্ন ভিন্ন
করিতে হইবে । কেহ লুক্কায়িত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ
বাণ পরিত্যাগ করিতেছে অথচ দেখা যাইতেছে না—
এইরূপ ব্যক্তিকেও বিদ্ধ করিতে হইবে । এ সকল দুঃসাধ্য
কার্য্যে সহজে সিদ্ধ হওয়া যায় না, অনেক যত্নে ও অনেক
পরিশ্রমে উক্তবিধ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করা যায় । ভবিষ্যৎ
যুদ্ধে উক্তবিধ বিবিধ লক্ষ্য সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে
জানিয়া অগ্রে তাদৃশ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত
সত্তরংগ শিক্ষা করা আবশ্যিক । ধনুর্বেদবিৎ পণ্ডিতগণই
তাহার উপযুক্ত শিক্ষক । তাঁহাদের নিকট, তাঁদের কৃত
গ্রন্থের নিকট লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য-সমুদ্র-সত্তরংগের প্রণালী শিক্ষা

করিবে । ধনুর্বেদবিৎ আচার্য্যগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে, শিক্ষাকালে চারি প্রকার মাত্র লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের বেধ শিক্ষা করিতে হয় । সেই লক্ষ্যে নৈপুণ্য লাভ করিলে সমুদায় লক্ষ্যই আয়ত্ত হইতে পারে । যথা—

“অবিচাল্যস্ব সূক্ষ্মস্ব সুকুমারমখী গুরু ।

চাতুর্বিধ্যস্ব লক্ষ্যস্য ধনুর্বেদবিদী বিদুঃ ॥

ভূমুদ্রীদৃষ্টাবিচাল্য' সূক্ষ্ম' গুজ্জাদিভেদনম্ ।

কুক্কুটান্ধীদকুম্ভানাং ভেদনং সুকুমারকম্ ॥

রক্ষীগজাদিদ্বেহানাং পাতনং গুরুচ্যতে ।

এবস্ব লক্ষ্যবিহৃতিবিহ্নেয়া নীতিমত্तरैः ॥” (বৈ, ধনু ।

১ অবিচাল্য অর্থাৎ স্থির ; যেমন পাষণ প্রভৃতি । ২ সূক্ষ্ম ; যেমন গুজ্জা অর্থাৎ কুচ ও সর্ষপ প্রভৃতি । ৩ সুকুমার অর্থাৎ কোমল ; যেমন ডিম্ব ও জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি । ৪ গুরু অর্থাৎ বৃহৎ ; যেমন রাক্ষসশরীর হস্তিশরীর প্রভৃতি ।

প্রথমে স্থির ও স্থূল লক্ষ্য অভ্যাস করিতে হয় । ক্রমে যত অভ্যাস দৃঢ় হইবে, ততই সূক্ষ্ম ও কোমল লক্ষ্যে যাইয়া তাহাতে নিপুণ হইবার চেষ্টা করিতে হয় । দূরে একটী ডিম্ব রাখিয়া তাহাকে কণ্ঠিত করা আরও কঠিন কার্য্য । দূরে একটী জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া তাহাকে ছিড় করা তদপেক্ষাও দুঃসহ জনিবে । আগ্নেয় ধনুর্বেদেও প্রধান কল্পে চারি প্রকার লক্ষ্যের কথা আছে । যথা—

“লক্ষ্যং যযীজযেতত্ত, পবিত্রদগতং বৃদ্ধম্ ।

স্থানং প্রচলিতম্ভৈব স্থিরং যচ্চ ভবেদিতি ॥”

ধনুর্বিদ্যার্থিগণ দূরে চতুরশ্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে পক্ষ-
চিহ্নিত দৃঢ়, ভ্রান্ত, প্রচলিত ও স্থির, এরূপ বেধ্য স্থাপন করি-
বেন । এস্থলে ভ্রান্ত শব্দের অর্থ ঘূর্ণমান, আর প্রচলিত
শব্দের অর্থ সরল গতিবিগ্নিষ্ট । বৃদ্ধ শাস্ত্রধর শিবোক্ত
ধনুর্বেদের উল্লেখ করিয়া প্রধানকল্পে চারি প্রকার বেধ্যের
বা লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু প্রোক্ত লক্ষ্য হইতে
বিভিন্নবিধ যথা—

“লক্ষ্যং চতুর্বিধং জীযং স্থিরাভৈব চলনযা ।

চলাচলং দ্বয়চলং বেধনায় ক্রমণা তু ॥”

শিক্ষাকালের লক্ষ্য বা বেধ্য চারি প্রকার জানিবে । স্থির,
সচল, চলাচল ও দ্বয়চল । এই চারিপ্রকার লক্ষ্য যথাক্রমে
আয়ত্ত করিতে হয় । প্রথমে স্থির লক্ষ্য, স্থির লক্ষ্য আয়ত্ত
হইলে পশ্চাৎ চল লক্ষ্য, তাহাতে সুপ্রসিক্ত হইলে চলাচল
লক্ষ্য এবং সর্বশেষে দ্বয়চল লক্ষ্য শিক্ষা করিবে ।

“স্থানানং সুস্থিরং স্থানা লক্ষ্যম্ভৈব স্থিরং বৃদ্ধঃ ।

বেধায় ত্রিপ্রকারন্তু স্থিরবেধী স ভদ্রত ॥”

সম্মুখে কোন এক স্থির অর্থাৎ নিশ্চল বস্তু স্থাপন করিবে,
আপনিও স্থির অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে । অনন্তর

ক্রমে তাহা তিন প্রকারে বিদ্ধ করিবে । (তিন প্রকার কি কি ? তাহা পশ্চাৎ বলিব ।) যখন সেই অচল তাদৃশ লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, তুমি স্থিরবেধী হইয়াছ ।

“চলং যী বেধযবেধ্যং আत्मনা স্থিরসংহিতঃ ।

চললক্ষ্যন্তু নত্প্রীতং আচার্য্যেণ সুধীমতা ॥”

স্থিরবেধিতা সিদ্ধ হইলে পশ্চাৎ অদূরে ও ক্রমে দূরে কোন এক সচল লক্ষ্য (সরলগতি যুক্ত, কিম্বা ভ্রমিযুক্ত) স্থাপন করিবে । পরন্তু নিজে তাহার সম্মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইবে । স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আচার্য্যের উপদেশ ক্রমে সেই চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে । এই চল লক্ষ্য যখন আয়ত্ত হইবে তখন তুমি চলবেধী বলিয়া গণ্য হইবে ।

“ধন্বীতু চলতে যত্র স্থিরলক্ষ্যে সমন্ততঃ ।

চলাচলং ভবেত্তত্র অপ্রমেয়মচিন্তিতম্ ॥”

ধনুর্ধারণ পূর্বক কোন এক স্থির লক্ষ্যের চতুর্দিকে পাদ-চারেই হউক আর অশ্বারোহণেই হউক ভ্রমণ করিবে । ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থির লক্ষ্যটী বিদ্ধ করিবে । এই-রূপ লক্ষ্যের নাম “চলাচল” এবং ইহা অচিন্তনীয় ব্যাপার । চল লক্ষ্য বেধ উত্তম আয়ত্ত না হইলে এই চলাচল লক্ষ্য আয়ত্ত করা যায় না ।

“ভ্রমাবেব চলী যত্র লক্ষ্যস্বাপি ধনুর্ধরঃ ।

নদ্বিস্ময়ং দ্বয়চলং শ্রমেণ বক্তৃ সাধ্যতে ॥”

যখন দেখিবে যে, চলাচল লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন এই দ্বয়চল লক্ষ্যে শ্রম করিবে । দ্বয়চল লক্ষ্য কি ? তাহা শুন । বেধ্য বস্তুটী প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, ধরীও প্রবল বেগে ঘুরিতেছেন, এমত অবস্থায় ধরী সেই চলমান লক্ষ্য বলদ্বারা বিদ্ধ করিবেন । ইহার নাম দ্বয়চল । এই দ্বয়চল লক্ষ্য বহুপরিশ্রমে ও বহুকাল অভ্যাসের পর আয়ত্ত হয় ।

শ্রমের বা অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই । অভ্যাস যোগে না হয় এমত কার্যই নাই । ধনুর্বেদবিৎ আচার্য্য শাস্ত্রধর বলিয়াছেন যে,—

“শ্রমেণাস্বলিতং লক্ষ্যং দূরং বক্তৃমীদনম্ ।

শ্রমেণাস্বলিতাকৃষ্টিঃ শীঘ্রসম্বানমাশ্রুতে ॥

শ্রমেণ চিত্রযীধিত্বং প্রাপ্যতে শ্রমতীজয়ঃ ।

তস্মাত্ গুরুসমলং হি শ্রমঃ কার্য্যো বিজানতা ॥”

শ্রম বা অভ্যাস করিলেই লক্ষ্য অশ্লিত হয়, দূর লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায় এবং বহু লক্ষ্যও যুগপৎ বিদ্ধ করা যায় । অভ্যস্ত হইলেই জ্যা আকর্ষণ শ্লিত হয় না এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাণ যোজনা ও বাণ পরিত্যাগ করা যায় । শ্রম বা

অভ্যাস দ্বারাই মনুষ্য চিত্রযোদ্ধা হয় এবং শ্রমের দ্বারাই মনুষ্য সংগ্রামে জয় লাভ করে। এজ্ঞ, সকল বিষয়ই উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া গুরুর সমক্ষে শ্রম বা শিক্ষিতব্য বিষয়ের অভ্যাস করিবে। চিত্রযুদ্ধ কিরূপ? তাহা পশ্চাৎ বলা হইবে। পরন্তু তিন প্রকার লক্ষ্যাভ্যাস কি কি? অগ্রে তাহাই বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ বাম হস্ত দ্বারা, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, অনন্তর উভয় হস্তদ্বারা বাণ আকর্ষণ, যোজন ও পরিত্যাগ করা শিখিতে হয়। অথবা প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত, পশ্চাৎ বামহস্ত, অনন্তর উভয় হস্ত বশীভূত করা কর্তব্য। যাহার বামহস্ত দক্ষিণ হস্তের তুল্যবল ও তুল্যাভ্যাস যুক্ত হয়, সে ব্যক্তি “সব্যসাচী” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সব্যসাচী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভারত যুদ্ধের সময় একমাত্র অর্জুনই সব্যসাচী ছিলেন, অন্ত্রে নহে। সব্যসাচী না হইতে পারিলেও হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। আচার্য্য শান্স ধরও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা;—

“প্রথমং বামহস্তেন যঃ শ্রমং কুরুতে নরঃ ।

মস্য চাপক্রিয়া সিদ্ধিরবিবাদেন লায়তে ॥

বামহস্তে তু সংসিদ্ধি পদ্মাহুতিণমারম্ভেৎ ।

ভমাম্যাস্ত্র শ্রমং কুর্যাৎ নারাদৈশ্চ শরৈস্তথা ॥

কসেনৈব শ্রমং কুৰ্য্যাৎ সুসিদ্ধি দক্ষিণে করে ।

বিশেষেণাসেনৈব তথা ব্যয়ে চ কৈশিকে ॥

সখ্যেনাপি করৈষৈব সচিতুং ক্রমতে যতঃ ।

সব্যসাচীতি বিজ্ঞেয়ী ধনুর্বেদবিশারদৈঃ ॥”

যে ব্যক্তি প্রথমে বামহস্তে শরনিষ্ক্ষেপ করিতে অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার ধনুর্যুদ্ধ সিক বা আয়ত্ত হয় । বামহস্ত উত্তমরূপ আয়ত্ত হইলে পর দক্ষিণ হস্তে শর নিষ্ক্ষেপ করা আরম্ভ করিবে । অনন্তর উভয় হস্তের দ্বারা নারাচ ও শর নিষ্ক্ষেপ বিষয়ে শ্রম করিবে । দক্ষিণ হস্ত উত্তমরূপ বশীভূত হইলে পুনর্বার বামহস্তের দ্বারা পরিশ্রম করিবে । বিশেষতঃ কৈশিক নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটী সম বিষম উভয় প্রকারেই অভ্যস্ত করিবে । যিনি বামহস্তকে দক্ষিণহস্তের সমান করিতে পারেন, দক্ষিণহস্তের দ্বারা বামহস্তেও নারাচাদি বাণ নিষ্ক্ষেপ করিতে পারেন, ধনুর্বিদ্যানিপুণ যোদ্ধৃগণ তাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানেন ।

লক্ষ্যস্থাপন বিধি ।

শিক্ষাকালে যেরূপ বিধানে লক্ষ্য বা বেধ্য স্থাপন পূর্বক তাহার বেধশিক্ষা করা উচিত—তাহাও এস্থলে বক্তব্য । তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয় ।

“উদিত্তে ভাস্করে লক্ষ্যং পশ্চিমায়াং নিবেশয়েৎ ।
 অপরাহ্নে তু কৰ্ত্তব্যং লক্ষ্যং পূৰ্বদিগাশ্রিতম্ ॥
 উত্তরেণ সদাকাৰ্য্য-সবশ্যমবরোধকম্ ।
 সংগ্রামেন বিনা লক্ষ্যং ন কাৰ্য্যং দক্ষিণামুখম্ ॥”
 (হ, শা ।

যে দিন প্রাতঃকালে শরাভ্যাস করিবে—সে দিন পশ্চিম দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে এবং যে দিন অপরাহ্নে শরাভ্যাস করিবে,—সে দিন পূর্ব দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে, পরন্তু উত্তরদিকটী উভয় সাধারণ ; অর্থাৎ কি প্রাতঃকাল কি বিকাল উভয়কালেই উত্তরদিকে লক্ষ্যস্থাপন করা যায় । অপিচ, সংগ্রাম কাল ব্যতীত অন্য সময়ে দক্ষিণ-দিকস্থিত লক্ষ্যে শর নিপাতন অবৈধ ।

আপনার স্থিতি-স্থান হইতে কতদূরে লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত তাহাও বিবেচ্য । তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রধর যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

“ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্তিতম্ ।
 চল্লারিংশান্মধ্যমস্ত্রং বিংশতিস্ব কনিষ্ঠকম্ ॥”

৪ হাত পরিমাণকে ধনু বলে,* সূতরাং ৬০ ধনুতে ২৪০

* “চতুর্বিংশাঙ্গুলী হস্ত-স্তম্বতুচ্ছাং ধনুঃ স্মৃতম্ ।”

ইতি জ্যোতিষম্ ।

হাত । এই ২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া বিদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ । ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা মধ্যম । আর ২০ ধনু অর্থাৎ ৮০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা অধম । শরবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধেই এই দূরত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু নারাচবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে । যথা—

“শরাণাং কথিতং হ্যেনন্ নারাচানামধীচ্যতে ।

চলারিংশস্তথা ত্রিংশন্ ধীড়ম্বৈব ভবে ননঃ ॥”

শর সম্বন্ধে উক্ত দূরত্ব বলা হইল, এক্ষণে নারাচ সম্বন্ধীয় দূরত্বের কথা বলা যাইতেছে । যে বাণ সর্বলৌহ—তাহা নারাচ নামে খ্যাত । সেই নারাচ সমধিক ভার বলিয়া তাহার শরের ত্রায় দূরগতি হইবার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং তাহার গতি-পরিমাণ অনুসারেই তদ্বৈধ্য লক্ষ্যের দূরগত উত্তমাধম মধ্যম ভাব ব্যবস্থিত হয় । নারাচ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা কালে ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত অন্তরে লক্ষ্য স্থাপন করাই উত্তম, ৩০ ধনু বা ১২০ হাত দূরে স্থাপন করা মধ্যম এবং ১৬ ধনু বা ৬৪ হাত দূরে স্থাপন করা অধম ।

২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবে এই বিধির দ্বারা পূর্বকালের লোকের শারীর বল ও তাহাদের বাণের বেগ কত অধিক ছিল একথা পাঠক মাত্রেরই ভাবিয়া

দেখা উচিত। সেই সকল বীরপুরুষের হস্তনিষ্কিপ্ত তীর ২৪০ হস্ত দূরে গিয়াও সবেগ থাকিত—এ বড় সাধারণ কথা নহে। অত্র এক স্থানে লিখিত আছে “নল্লমাত্রগতিস্ত সঃ।” তীর ৪০০ শত হাত পর্যন্ত যায়। যে ৪০০ হাত যায়—সে যে ২৪০ হাত স্থানে অবস্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া পর পারে যাইবে—তাহা আর বিচিত্র কি? এক্ষণে সামান্য বন্দুকের গুলি বোঝ হয় ৪০০ হাত যায় না, কিন্তু তাঁহাদের বাহুবল প্রেরিত বাণ ৪০০ হাত যাইত, ইহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যবেধে পরিশ্রম করিতে হইবে তাহাও বিধিবিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

“চতুঃ শনৈশ্চ দানানাম্ যী হি লভ্যং বিসর্জ্যেত্ ।

সূর্য্যোদয়ে চাশ্বময়ে স জ্যৈষ্ঠী ধন্বিনাং মবেত্ ।

ত্রিশনৈর্মধ্যমী বায়ে দ্বিশনাম্যাম্ কনিষ্ঠকঃ ।”

পূর্বাঙ্কে ও অপরাঙ্কে যে ৪০০ শত বার বিদ্ধ করিয়া লক্ষ্য পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ শ্রমক্রিয়া হইতে বিরত হয়, সে উত্তম ধনুর্ধারী হয়। ৩০০ বাণ ত্যাগের পর ক্ষান্ত হইলে সে মধ্যম এবং ২০০ বাণ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইলে সে অধম। ফল, “নাৰদৈব শ্রমঃ কুর্য্যান্ যাবন্নায়াসসম্ভবঃ ।” ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রম করিবে—যতক্ষণ শরীরে ও মনে ক্লান্তি না জন্মে।

লক্ষ্যের পরিমাণ ।

শিক্ষাকালে যে পরিমাণ উচ্চ লক্ষ্য বিস্তৃত করিতে হইবে—তাহার এবং তাহার অবান্তর বিধান এইরূপ—

“লক্ষ্যস্ত পুষ্কোন্মানং কুৰ্য্যাম্বন্দ্রকসংযুতম্ ”

(হ, শা ।

পুরুষ-প্রমাণ অর্থাৎ ৩।০ হাত উচ্চ কাষ্ঠ-নির্মিত অথবা লৌহ-নির্মিত দণ্ডের মস্তকে চন্দ্রক অর্থাৎ চন্দ্রবৎ গোলাকার কাষ্ঠফলক যোজিত করিবে, তদগ্রে কিংবা তন্মধ্যে বেধ্য বস্তুটী স্থাপন পূর্বক দূর হইতে তাহা বিদ্রু করিতে শিখিবে । অথবা সেই চন্দ্রকযুক্ত পুরুষোন্মান লক্ষ্যের উর্দ্ধ, নাভি ও পাদদেশ বিদ্রু করিতে থাকিবে ।

“উর্দ্ধবেধী ভবেচ্ছ্রী নাভিবেধী চ মধ্যমঃ ।

যঃ পাদবেধী লক্ষ্যস্য স কনিষ্ঠঃ স্মৃণী বুধৈঃ ॥”

(হ, শা ।

তন্মধ্যে উর্দ্ধবেধী শ্রেষ্ঠ, নাভিবেধী মধ্যম এবং যিনি লক্ষ্যের পাদবেধী তিনি কনিষ্ঠ ইহা জানিতে হইবে ।

চিত্রবেধিতা ।

যুদ্ধকালে কখন কিরূপ লক্ষ্য বিদ্রু করা হইবে তাহা পূর্বে জানা যায় না । এ নিমিত্ত শিক্ষা কালে নানাপ্রকার চিত্র-

লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিত্রবেধিতা শিক্ষা করিতে হয় । পরন্তু চিত্রবেধিতায় সিদ্ধ হওয়া সমধিক কষ্টসাধ্য ও নানাপ্রকার উপায়সাধ্য । সেই সকল বহু উপায়ের মধ্যে শাস্ত্রধর প্রোক্ত ও অগ্নিপুராণধত কতিপয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল । যথা—

“বাণভঙ্গং কৃতাবর্তং কষ্টভেদনমিহ চ ।

বিন্দুকং গোলকযুগং যৌবেতি স যুগী ভবেৎ ॥”

বাণ ভঙ্গ, কৃতাবর্ত, কষ্টভেদন, বিন্দুক ও গোলকযুগ,— ইহা যে জানে সে যুগী হয় । বাণ ভঙ্গ কি ? তাহা শুনুন ।

“লক্ষ্য স্থানি দৃষ্টং কাণ্ডং সম্মুখং ছেদয়েন্নতঃ ।

কিञ্চিন্মুষ্টিং বিধায় স্বাং নির্য্যক্ দ্বিফলকেষুণা ॥

সম্মুখং বা সমায়াতি নির্য্যক্বাণেন সম্বরেৎ ।

শ্বরং শুরিণ যশ্চিন্দ্যাৎ বাণহুদী স জায়তে ॥”

ধনুকে যেরূপ ভাবে বাণ যোজিত হয়, সেইরূপ করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত চন্দ্রকযুক্ত লক্ষ্যদণ্ডের মস্তকে বাণ স্থাপন করিবে । বাণের ফলাটী যেন সম্মুখ হইয়া থাকে । অনন্তর আপনার মুষ্টি অতাল্প পাশ্ব বক্র করিয়া দ্বিফলক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিবে । ধনুর্মুষ্টি ও গুণমুষ্টি যদি ঠিক সোজা থাকে, কিঞ্চিৎ বক্র না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বাণ ছিন্ন হইবে না । হয় মুখোমুখি ঠেকিয়া বাণটী ব্যর্থ হইবে, না হয় ঠেকিবা মাত্র বাঁকিয়া যাইবে ।

অন্য প্রকার ।

লক্ষ্য দণ্ডের মধ্য হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাণ পরিত্যাগ করিলে বাণ যখন সম্মুখে আসিতে থাকিবে তখন আপনি তির্যক্ হইয়া ও আপনার বাণটী তির্যক্ করিয়া তদ্বারা তাহা ছিন্ন করিবে ।

প্রকারান্তর ।—এক ব্যক্তি সম্মুখবর্তী হইয়া বাণ ত্যাগ করিবে—অন্য ব্যক্তি তাহা বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে । যিনি ক্রমে এই তিন প্রকার ক্রিয়া অভ্যস্ত করিতে পারেন, তিনি বাণচ্ছেদী হন । কৃতাবর্ত নামক চিত্রলক্ষ্য অনেক প্রকার বটে ; কিন্তু তন্মধ্যে বরাটিকাবর্ত নামক প্রক্রিয়াটীর লক্ষণ বলা যাইতেছে ।

“কাষ্ট’ সকেষং সংযম্য তত্র বদ্ধা বরাটিকাম্ ।

হস্তেন ধাম্যমানাস্ত্র যী হি হন্তি স ধনুর্ধরঃ ॥”

এক খণ্ড কাষ্ঠের অগ্রভাগে কেশবন্ধন পূর্বক তদগ্রে একটী বরাটী অর্থাৎ একটা কড়ী বাঁধিয়া তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে থাকিবে । যিনি সেই ঘূর্ণমান কড়িটী বিদ্ধ করিতে পারেন তিনিও উত্তম ধনুর্ধর ।

অন্য প্রকার ।

“লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাষ্ট’ সান্দ্র’ গোপুচ্ছসন্নিভম্ ।

যস্মিন্ধ্যাত্ তত্চুরগ্রেণ কাষ্টচ্ছ্বেদী স জায়তে ॥”

লক্ষ্য বিস্তার স্থানে এক খণ্ড গোপুচ্ছাকৃতি আর্দ্র কাষ্ঠ রাখিবেক । অনন্তর তাহা দূর হইতে ক্ষুরপ্র নামক বাণের দ্বারা ছেদন করিতে শিখিবেক । উক্তবিধ কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে ক্রমে কাষ্ঠচ্ছেদী হওয়া যায় । যুদ্ধকালে ব্রথাদির ধ্বজদণ্ডাদি ছেদন করা আবশ্যক হয়, তজ্জন্তু এতদ্রূপ অভ্যাস করা শ্রেয়স্কর জানিবে ।

অন্যপ্রকার চিত্রবেধিত্ব ।

“লহ্যে বিন্দুং ন্যসেৎ শুম্ভং শুম্ভবন্ম, কপুষ্পবৎ ।
হুন্নি তং বিন্দুকং যস্তু চিত্রবধী স জায়তে ॥”

লক্ষ্য স্থানে বা লক্ষ্যের গাত্রে শ্বেত বাঁধুলী ফুলের গ্রায় একটী শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠ নির্মিত বিন্দু প্রোথিত করিবেক । অনন্তর সেই বিন্দুটী বিদ্ধ করিতে শিখিবেক । যে ব্যক্তি তাদৃশ বিন্দু বেধ করিতে পারে—সেই ব্যক্তিই চিত্রবেধী হয় ।

অন্য প্রকার ।

“কাষ্ঠগোলযুগং দ্বিপ্রং দূরমূর্ছং পুরঃ স্থিতৈঃ ।
অমম্প্রায়ং শরং স্পৃশ্যেৎ তত্ গোপুচ্ছমুখেণ হি ॥
যীহন্নি শরযুগ্মেণ শৌর্যসম্মানযোগতঃ ।
সঃ স্যাৎ ধনুর্মহতাং শ্রেষ্ঠঃ পূজিতঃ সর্বপার্থিবৈঃ ॥”

দূরে ও সম্মুখে থাকিয়া এক জন কাষ্ঠনির্মিত দুইটা গোলা প্রক্ষিপ্ত করিবেক । ধনুর্ধর সেই দুই গোলা নিকটে না আসি ত আসিতে গোপুচ্ছাকৃতি বাণ দ্বারা স্পর্শ করিবেন অথবা শীঘ্র সন্ধান পূর্বক পৃথক দুই বাণে পৃথক পৃথক দুইটা গোলককে বিদ্ধ করিবেন । এতদ্রূপ গোলকাভ্যাস করিতে পারিলে ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় । এই ধনুর্ধর সকল রাজার পূজ্য ।

“রথস্থেন গজস্থেন হযস্থেন চ পত্তিনা ।

ধাবতা বৈ শ্রমঃ কার্য্যো লভ্যং হন্তাং সুনিশ্চিতম্ ॥”

উক্ত প্রকারের শ্রমক্রিয়া অর্থাৎ বাণাভ্যাসাদি কেবল দণ্ডায়মান হইয়া শিখিবে না । কখন রথস্থ হইয়া, কখন গজারোহী হইয়া, কখন অশ্বারোহী হইয়া, কখন বা পদাতি হইয়া অভ্যাস করিবেন । কখন স্থির বা অচল থাকিয়া, কখন বা ধাবমান হইয়া, লিখিত প্রকারের বাণাভ্যাস বা শ্রম ক্রিয়া করিবেন । তাহার কারণ এই যে, যুদ্ধকালে সকল প্রকারই আবশ্যক হইতে পারে ; সুতরাং সর্ব বিষয়ে নিপুণ হওয়াই ভাল ।

শব্দবেধিতা ।

রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণের দ্বারা গজভমে অন্ধ শূনির পুত্র সিন্ধু নামক শিশুকে বিনাশ করিয়াছিলেন

রাবণপুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে শব্দভেদী বাণের দ্বারা তাড়না করিয়াছিলেন । রামায়ণ পাঠকালে আমরা যখন এই সকল কথা পাইতাম, তখন মনে করিতাম যে শব্দভেদী বাণ না জানি কত দুজ্জের ও কত আশ্চর্য্য । অথবা উহা অমানব কার্য্য ; কিন্তু আজ আমরা ধনুর্বেদ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, উহা অমানব কার্য্য নহে । উহা কেবল অভ্যাসের প্রভাবেই সম্পাদিত হয় । তবে কিনা ইহা অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা কিছু অধিক কঠিন । বৃদ্ধ শাস্ত্রধর কৃত ধনুর্বেদ সংগ্রহ মধ্যে ইহার একটী সুগম উপদেশ আছে । শব্দভেদী বাণ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । সকল বাণই শব্দভেদী হইতে পারে । শিক্ষার কৌশল ও অভ্যাসের প্রভাব একত্র হইলেই প্রত্যেক বাণকে শব্দভেদী করা যায় । শব্দবেধের শিক্ষা কি রূপ ? তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ।

“লক্ষ্যস্থানি ন্যসেৎ কাংক্ষ্যদাত্রং হস্তব্রযান্তরে ।

নাড়্যেচ্ছকরামিস্তাত্ শব্দঃ সম্ভাযতে ততঃ ॥

যত্রৈবীত্যথ্যে শব্দঃ সম্যক্ তত্র বিচিন্তয়েৎ ।

কর্ণেন্দ্রিয়মনীযোগাৎ লক্ষ্যং নিশ্চয়তাং নয়েৎ ॥

পুনঃ শব্দরযা তচ্চ নাড়্যেচ্ছব্দহেতবে ।

পুনর্নিশ্চয়তা নেয়া শব্দস্থানানুসারতঃ ॥

নতঃ কিञ্চিত্ কৃতং দূরে নিত্যং নিত্যং বিধানতঃ ।

লক্ষ্যং সমম্যসেৎ ঘাতে শব্দবেধনহেতবে ॥

নতী বাখেণ হন্যাৎ নত্ অবধানেন তীক্ষ্ণধীঃ ।

এতচ্চ দুষ্কারং কৰ্ম্মাভ্যাসাৎ কস্ম্যাপি সিধ্যতি ॥”

যে স্থানে লক্ষ্য স্থাপিত আছে, তাহার দুই হাত
দূরে একটী কাংসপাত্র স্থাপন কর। দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায়
থাকিয়া সেই কাংসপাত্রের গাত্রে শর্করা অর্থাৎ কঁক-
রের আঘাত করুক। আঘাত করিবার মাত্র শব্দ উৎপন্ন
হইবেক। যে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইল তুমি কেবল
সেই শব্দোৎপত্তির স্থানটীতে মনোনিবেশ করিবে।
অতঃপর তুমি সেই স্থাপিত লক্ষ্যকে না দেখিয়া কেবল-
মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ঐক্য বিধান করত
লক্ষ্যকে অর্থাৎ বেধ্য বস্তুকে নিশ্চয় করিবে। দ্বিতীয়
ব্যক্তি পুনর্বার সেই কাংস পাত্রে শর্করাঘাত করুক। পুন-
র্বার শব্দ হউক। তুমিও স্থাপিত লক্ষ্য না দেখিয়া সেই
উৎথিত শব্দের স্থান অনুসারে লক্ষ্য নিশ্চয় কর। ক্রমে
যখন দুই হাত অন্তরের লক্ষ্য স্থির ও দৃঢ়াভ্যস্ত হইয়া
আসিবে, তখন তাহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে
স্থাপিত কর। ধনুর্বেদ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এইরূপে
নিত্য নিত্য অভ্যাস কর এবং নিত্য নিত্য শব্দকারক কাংস
পাত্রকে দূরে দূরে স্থাপিত কর। শব্দবেধ শিক্ষার নিমিত্ত

নিত্য নিত্য উক্ত প্রকারের ঘাত শিক্ষা কর। ক্রমে সেই শব্দানুমেয় লক্ষ্যের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে থাক। তাহা হইলে ক্রমেই তোমার শব্দবেধিতা আয়ত্ত হইবে। তখন তুমি অদৃষ্ট লক্ষ্যকে অনায়াসে শব্দের দ্বারা অনুমান করিয়া বিদ্ধ করিতে পারিবে। পরন্তু এই কার্য্যটী সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। এই দুঃসাধ্য শিক্ষাটী সকলের ভাগ্যে আয়ত্ত হয় না, কোন কোন ভাগ্যবানের আয়ত্ত হয়।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, কুরুবালকেরা মহামতি দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অর্জুন সমধিক বুদ্ধিশালী, কৃতান্ত, ক্রিপ্রকারী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তজ্জন্ত গুরু তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট ছিলেন বটে; কিন্তু অশ্বখামাকে তিনি পুত্রতা বিধায় অর্জুন অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। সেই জন্তই তিনি কখন কখন অশ্বখামাকে গোপনে ও কৌশলে কোন অস্ত্র অস্ত্রের অজ্ঞাতে প্রদান করিতেন। অর্জুনকে সমধিক প্রতিভা-শালী দেখিয়া তাঁহার মনে মনে শঙ্কা হইত যে, অর্জুন সূচ্যগ্রে আমার গোপন শিক্ষা জানিতে পারিলেই বুঝিয়া লইবে। একদিন তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন, “দেখ, অর্জুনকে তুমি কখনও অনালোক স্থানে অন্ন প্রদান করিও না।” পাচক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা সাবধানে অন্নপরিবেশন করে। একদিন অর্জুন আহার

করিতেছেন এমন সময় প্রবল বায়ু উত্থিত হইয়া তত্রস্থ দীপ
নির্বাপিত করিল । অর্জুন দীপ প্রজ্বালনের অথবা দীপান্তর
আনয়নের প্রতীক্ষা না করিয়াই আহার করিতে লাগিলেন ।
অন্ধকারে আহার করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, একি ?
আমার হস্ত যে ঠিক মুখেই যাইতেছে ? এবং প্রত্যেক ব্যঞ্জন-
নাদি দ্রব্যের দিকেও যাইতেছে ? ইহার কারণ বোধ হয়
অভ্যাস । অভ্যাস হইলে বোধ হয় তখন আর দেখিবার
আবশ্যক হয় না । অদৃষ্টে লক্ষ্যকেও বিদ্র করা যায় । ইহা
ভাবিয়া তিনি সমধিক আনন্দিত হইলেন এবং তদবধি
প্রতিদিন রাত্রে উঠিয়া নিশীথ কালের ঘোর অন্ধকারে
লক্ষ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি অন্ধকারে
লক্ষ্য বেধ করিতে শিখিয়াছিলেন । অর্জুনের অন্ধকারে
লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা আর শব্দভেদ শিক্ষা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী
জানিবে এবং অভ্যাসের দ্বারা না হয় এমন কার্য্যই নাই,
ইহাও জানিতে হইবে ।

অসি ।

এই অস্ত্রটী সৰ্বদেশ সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনুর্বেদের লিপি পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার অসি উৎপন্ন হইত—এখন আর সেরূপ শক্তি সম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারেন না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর স্তম্ভও কণ্ঠিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয়া যায় না, এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এক্ষণকার অসি যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পায়ণ অর্থাৎ পান দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কোশ লেই বা তাহা ব্যবহৃত হইত; অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়া পাঠক-গণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এইরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহার দ্বারা কুতূহল

বুদ্ধি ও পূর্বপুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে ;
তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই ।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন । অতি পূর্বকালে ইহার
আটটি মাত্র নাম ছিল । যথা—অসি, বিশসন, খড়্গা,
তীক্ষ্ণবর্ষা, হুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল ।
অনন্তর ইহার আরও কয়েকটি নাম বুদ্ধি হইয়াছিল ।
যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টী, কোক্ষৈয়ক, মণ্ডলাগ্র, কর-
পাল, করবাল, তরবার ও তরবারি । ছোট বড় ও গঠনের
তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটি নাম আছে ।
সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে ।

ধনুর্বেদ শাস্ত্রে অসি সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত
আছে । তাহা হইতে প্রথমে আমরা লৌহ পরীক্ষাটি
বিস্তৃত করিব । অগ্রে লৌহ পরীক্ষা, পশ্চাৎ তাহার দোষ
গুণের পরীক্ষা করাই উচিত ।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ দ্বিবিধ । নিরঙ্গ ও
সান্ন । প্রথমোক্ত নিরঙ্গ লৌহ আবার অনেক বিধ । সেই
সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঞ্চীপ্রভৃতি নাম
দ্বারা ব্যক্ত করা হয় । সেই সকল লৌহই অসি নিৰ্ম্মাণের
উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক । যথা—

“লৌহানাং লক্ষণং বচ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ ।

নিরঙ্গ সান্ন ভেদে ন লৌহা বিবিধা মতাঃ ॥

নিরুদ্ভাঃ কাশ্চি গাণ্ডারাদি ভেদাত্ বজ্রবিধা মতাঃ ।

অসি কৰ্ম্মসু তে শস্তা নানা ব্যাধিবিনাশনাঃ ॥”

(বীর চিন্তামণি ।

খড়্গা ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাজ লৌহের দ্বারা নির্মিত হয়, এজন্য সেই সাজ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্তব্য। বীর চিন্তামণি ও শাস্ত্রধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটা বচন আছে, তাহা এই—

“বহ্ন্যন্তী প্রায়েশী যজ্ঞাত্ সাজ্জাঃ বজ্রাদি কৰ্ম্মসু ।

নামমেদৈন চিক্কাণি লৌহানামমিদ্ধম্হে ॥”

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাজ লৌহের নাম দশটি। যথা—রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূর গৈবক, ময়ূর বজ্র, তিত্তিরাজ, সূৰ্য্য বজ্র, শৈবল মালান, মৌষল বজ্র, কঙ্কাল বজ্র বা স্বৰ্ণক ও গ্রন্থিবজ্র। এত-
 ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার লৌহ আছে, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

রোহিণী ।

“লুদ্ভাঙ্গং সুদৃঢ়ং যস্য নীলমীষত্ প্রতীয়তে ।

রোহিণীং তাং বিজানীয়াত্ তত্চতে বজ্রবেদনা ॥

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র কাকরের গায় আকার বিশিষ্ট)
অথচ অত্যন্ত কঠিন, এরূপ লৌহে যদি অল্প নীলবর্ণ
দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই
রোহিণী লৌহের দ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত
বেদনা জন্মে।

নীলপিণ্ড।

“নীলপিণ্ডসমাক্তং নীলপিণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ॥”

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীল বড়ীর গায় তাহা নীল-
পিণ্ড বলিয়া জানিবে।

ময়ূর গৈবক।

“ময়রকণ্ডসংস্থানমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।

ময়ূরগৈবকং লৌহং তং বিদুর্মুনিপুঙ্গবাঃ ॥”

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য— তাদৃশ লৌহকে
মুনিগণ ময়ূর গৈবক বলিয়া জানেন।

ময়ূর বজ্রক।

“নাগকেশরপুষ্পাভমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।

ময়ূরবজ্রকং প্রাক্তলৌহশাস্ত্রবিদৌ জনাঃ ॥”

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহ-
তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূর বজ্র নামে উল্লেখ
করিয়া থাকেন ।

তিত্তিরাস্ত্র ।

“তস্মিঁ স্তিত্তিরি পদ্মামমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে ।

দুর্লভং তন্মহামূল্যং তিত্তিরাস্ত্রং সুপাকজম্ ॥”

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির পক্ষীর পক্ষের আয় দৃষ্ট
হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাস্ত্র নামে বিখ্যাত । এই তিত্তি-
রাস্ত্র লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা
অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ । এষ্ট সুধাতু
লৌহের দ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্মিত হয়, সমস্তই উত্তম
ও গুণবান্ হয় ।

সুবর্ণ বজ্রক ।

“সুবর্ণ্যং সৎস্রাকারং তন্ম ভূমিঃ প্রতীয়তে ।

সুবর্ণ্যং বজ্রকং বিদ্যাৎ বজ্রমূল্যং মহাগুণম্ ॥”

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সে লৌহকে
সুবর্ণ বজ্র বলিয়া জানিবে । এই সুবর্ণ বজ্র নামক
লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্ ।

শৈবাল মালান ।

“অবিচ্ছিন্নং সুসূক্ষ্মাঙ্গং দুর্বাভাঙ্গমপাকজম্ ।

যচ্ছিন্ শৈবলমালান মাডুলং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম (অঁস্) থাকে এবং তাহার আভা যদি দুর্বাদলের গ্ৰায় হয়, তবে তাহাকে শৈবল মালান আখ্যা প্রদান করিবেক ।

মৌষল বজ্র ।

শূলং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মध्ये स्वर्णमयाङ्गकम् ।

ধূমবত্ সীমসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ ॥”

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাতা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণ-রেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূমবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষল বজ্রক বলিয়া জানিবে ।

কঙ্গোল বজ্র বা স্বর্ণক ।

“मृणालनीलप्रतिमं विवरैरप्रसंस्थितैः ।

कङ्गीलवङ्गकं प्राङः स्वर्णकं लौहचिन्तकाः ॥”

লৌহতত্ত্ব অনুসন্ধ্যায়ীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের গ্ৰায় সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল

দেখা যায়—তাহাকে কঙ্গোল বজ্রক অথবা স্বর্ণক বলিয়া জানিবে ।

এস্থি বজ্র ।

“অঙ্গং প্রতীযতে যত্র বজ্রগ্রন্থিসমন্বিতম্ ।

দুর্লভং তন্মাহামৌল্যং গ্রন্থিবজ্রকমুচ্যতে ॥”

যাহার সর্বদ্বন্দ্ব এস্থি আর্থাৎ যাহার অনেক স্থানে গাঁইট আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম এস্থি বজ্র । এই এস্থি বজ্র লৌহও দুর্লভ ও মহামূল্য ।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেক প্রকার আছে । তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লৌহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে । রোহিণী, পাণ্ড্য ও রুক্ম, এই তিন প্রকার মাত্র নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত । রুক্ম বা কান্ত লৌহ নিরঙ্গমধ্য-পাতী । আজ কাল্ ইংলিশ লৌহে এ দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে ; তজ্জন্ত আর কেহ কষ্টলভ্য ও বহুমূল্য দেশী লৌহ আহরণ করেন না । এমন কি, এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন । ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না, তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন বা অনুসন্ধান করেন না । করিবারও প্রয়োজন নাই । কারণ, এখন কেবল অলাবু-

ছেদনের উপযুক্ত বাঁটি নির্মাণের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয়—পরন্তু তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্ল ইংলিশ লৌহের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে । পূর্বে এ দেশে ইংলিশ লৌহের আগমন ছিলনা এবং মেঘ, মহিষ, হয়, হস্তী, কাষ্ঠযষ্টি, লৌহযষ্টি, ও অস্থি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান্ বস্তু-ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল । সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত । প্রয়োজন বুঝিয়া কুশলী পরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন । এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারিটি পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্যি এক খানি প্রস্তুত বাঁটি পাওয়া যায় । ফল, এ সকল প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন ।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহের দ্বারা অসি নির্মাণ করিবেক । অসি নির্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না । কোন্ লোহাস্ত্র কিরূপ প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক ; পরন্তু পায়ণ অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয় । এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অস্ত্রের পায়ণ

কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ণ কার্য্যটী যদি উত্তম বা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। পায়ণ কার্য্যের পাকটী লিপির দ্বারা শিক্ষা করা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য সাধন--এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শিখা যায়, অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি, পণ্ডিতেরা পায়ণের দ্রব্য ও প্রক্রিয়া গুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রটি করেন নাই। বৃহৎ সংহিতা প্রোক্ত অসির পায়ণ বিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে উদ্ধৃত করিতাম।

পায়ণ অর্থাৎ পান দিবার বিধি ।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকাদ্রবে মিশ্রিত-করণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রবদ্রব্য পান করানকে পায়ণ বলে। দগ্ধ করিয়া জলে কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অমুর গুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

“ইদমৌশনসস্ব শত্ৰুপানং
 বধিরেণ ত্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম্ ।
 হবিষা গুণবৎ সুতাভিলিঙ্গীঃ
 সলিলেনাচ্চয় মিচ্ছতস্ব বিত্তম্ ॥
 বড়বীষ্টকরেণুদুগ্ধপানং
 যদি পাপেন সমীঃতেঃসিদ্ধিম্ ।
 ঋষপিত্তমৃগাস্ব বস্ত দুগ্ধৈঃ
 করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগম্ভৈঃ ॥
 আকং পয়োজ্জড়, বিরাণ মসী সমেতম্
 পারাবতাখু শকুতা চ যুতং প্রলেপঃ
 শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য নতীঃস্য পানম্ ।
 পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভনেদ্বিঘাতঃ ॥
 চারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে ।
 দিনোষিতে পায়িত মাযসং যত্ ।
 সম্যক্ সিতং চাশ্মনি নৈতিভঙ্গং
 ন চান্য লৌহেষুপি তস্য কৌণ্ড্যম্ ॥”

অর্থ এই যে, যিনি ত্রীভুक्ति ইচ্ছা করেন, তিনি
 শত্ৰুকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধারা
 দ্বারা করিয়া রুধিরে নিষ্ক্রেপ করিবেন। (১) আর যিনি
 গুণবান্ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি শত্ৰুকে ঘৃত
 পান দিবেন, (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন,

তিনি আসিকে জলপান করাইবেন (৩) । এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত আসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন । (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ ও ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন । (৭।৮।৯।১০) (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল) আকন্দের আটা, হুড়ুবিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত ও মর্দিত করিয়া তৈল মথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক । অনন্তর তাহাকে পূর্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক । পরে তাহাকে সুশাণিত করিবেক । এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তুতও কুণ্ঠিত হইবে না । অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক ; ভঙ্গিয়া যাইবে না । (১১) অপিচ অস্ত্র কদলী ক্ষারে ব্রক্ষিত করিয়া এক দিন এক রাত্রি রাখিবেক । পশ্চাৎ তাহাতে পান্ দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক । এইরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তুত ভাঙ্গিবে না এবং অগ্নি লৌহেও কুণ্ঠিত হইবে না । (১২)

এইরূপ আরও কয়েক প্রকার পায়ণ বিধি আছে, পরন্তু সে সকল তীরের ফলার জন্য বিহিত । বিষ কিন্মা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণক্ষমতা

ধারণ করে । বিষ পায়িত অস্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত রক্তপাত ঘটনা হইলেই তাহা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে ।

অস্ত্রে পান্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয় । সেই সকল গন্ধের দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে । এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দক্ষ করিতে হয়, তৎকালের যে বর্ণ বা রঙ হয়, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয় । যথা—

“করবীরীন্দ্র গজমদ

ঘৃত কুঙ্কুম কুন্দ চন্দ্রক সগন্ধঃ ।

শুমদীঃনিষ্ঠী গৌমুত্র

পঙ্কভেদঃ সটুগ্ধ গন্ধঃ ॥

কুর্মবসাস্থক চারীপমস্ব

ভয়দুঃখদী ভবতি গন্ধঃ

বৈদূর্য্যকণকবিদ্যুত্ প্রমী

জয়ারীগ্য বৃদ্ধিকরঃ ॥”

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের গ্ৰায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভদায়ক হইবে । আর যদি গোমূত্র কিংবা পঙ্ক, মেদ, কুর্ম, বসা, রক্ত, কিস্মা ক্ষীর তুল্য কোন গন্ধ বহির্গত

হয় তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভদায়ক । দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কণক কি বিদ্যুতের ত্রায় প্রভা বহির্গত হয়, তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে । নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে । এ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এ সকল সংকলন করিলাম । অপিচ অসি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি লক্ষণানুযায়ী নাম আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল ।

১ ধবল গিরি ।

“রুদ্রাঘতসমা ভূমিরঙ্গং শ্বেতং প্রতীযতে ।

ন ধবলগিরিং পাণ্ডুরং পাণ্ডিভাঃ প্রবদন্তি হি ॥”

পাণ্ড্য লৌহজ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ত্রায় ও অবয়ব শুভ্র, তাহা পাণ্ড্য লৌহ সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি ।

২ কাল গিরি ।

“তন্মী পদ্মাবলী কালঃ সৌবর্ণাঙ্কাসিপত্রিকা ।

পাণ্ডঃ কালগিরিং পাণ্ডিভৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥”

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভযুক্ত পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি ; ইহা লৌহ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন ।

৩ কজ্জল গাত্র ।

“ধারা শুদ্ধা ভবেৎ যস্য মধ্যং কজ্জলসন্নিভম্ ।

ক্షণরদ্ধস্থিতং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্ ॥”

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্য কজ্জলবর্ণ, সর্বক্ষে কাল দাগ, তাহাকে কজ্জল গাত্র বলিয়া জানিবে ।

৪ কুটীরক ।

“সূক্ষ্মং রজতপত্রাভমঙ্গং ক্షণাসিপত্রিকা ।

কুটীরকঃ সমাখ্যাতাস্তুচ্ছতে স্বয়মুর্ভবেৎ ॥”

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজতপত্রের চিহ্ন থাকে অথচ কৃষ্ণবর্ণ ; এতাদৃশ অসিপত্রিকা কুটীরক নামে খ্যাত । এই কুটীরক অসির দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে ।

৫ কেতকী বজ্র ।

“কেতকী পত্রসদৃশমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে ।

বিদ্যাৎ কেতকবজ্রং তৎ——— ॥”

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে—সে অসির নাম
কেতক বজ্র ।

৬ কান্তিলৌহ বা নিরঙ্গ ।

“নিরঙ্গং রৌপ্যপত্রাভনীলনিমগ্ন যত ।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং কান্তিলৌহং প্রচক্ষতে ॥”

যাহা কান্ত লৌহের দ্বারা নির্মিত ও যদঙ্গে রৌপ্য
পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অল্প নীল—এরূপ অসি
দুর্লভ ও মহামূল্য ।

৭ দমন বক্তু ।

“অঙ্গং দমনপত্রাভমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীযতে ।
বিদ্যাৎ দমনবক্তন্তু তীক্ষ্ণধারং মহাগুণম্ ॥”

যাহার অঙ্গে দমন পত্র অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিম্বা
কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমন বক্তু ।
এই দমন বক্তু অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয় ।

৮ কাল খড়গ ।

“কালভূমিসুবর্ণাভমীপত্ বজ্রাচ্চসংগতম্ ।
ভাজলীষজ্জকং বিদ্যাৎ কালসংগ্রহমথাপরে ॥”

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্তু তাহার আভা যদি সুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে “ডাহনী বজ্র” বলিয়া জানিবে । কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম “কালখড়্গ” ।

৯ নকুলাঙ্গ ।

“জঙ্ঘাং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীযতে ।

নকুলাঙ্গন্তু তং বিখ্যাতং স্মর্মে যস্যাহিনাশনম্ ॥”

যাহার অঙ্গে উজ্জ্বলগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ । এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সপাণ্ড প্রাণত্যাগ করে ।

১০ ক্ষুদ্র বজ্র ।

“অসীকা মালিকা যস্য চুদ্রাঙ্গং কুণ্ডলীকৃতম্ ।

ক্ষুদ্রবজ্রকনামানং প্রাহ নাগার্জুনী মুনিঃ ॥”

যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসীকামালা দৃষ্ট হয়—নাগার্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্র বজ্র নামে প্রখ্যাত করেন ।

১১ মহৎ ।

“অন্তর্গাঢ়ং চিরহীনং বিশালং

মধ্যং স্কুলং স্কুলধারাতিতীক্ষ্ণম্ ।

বদীভূতঃ ক্ষেদনর্থং মহান্তম্

স্ত্রীনা খড়্গং দেবরাজীঃতি হৃষ্টঃ ॥”

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, গাত্র সর্ব-
প্রকার চিহ্ন বর্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু
অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের বন্ধ বিদারণের
নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান খড়্গ নির্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া-
ছিলেন।

১২ বামনাক্ষ ।

“বামনাক্ষং মহানন্তু যেন তন্তুর্ন জায়তে ।

ঈদে গাঢ়ং চিরুহীনং প্রাক্তঃ খড়্গং বিবচনাঃ ॥”

পাণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যন্ত গাঢ় অথচ যে
মহান খড়্গ ছেদকালে ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না,
(থেঁৎড়ে যায় না) এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না,
তাদৃশ খড়্গের নাম বামনাক্ষ ।

১৩ মহিষাখ্য ।

“এরুণ্ডবীজ প্রতিমমন্তু যস্মিন্ প্রতীযতে ।

মহিষাখ্যঃ স বৈ খড়্গী নীলমেঘসমচ্ছবিঃ ॥”

যে খড়্গের গাত্রে এরুণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয়

এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের আয়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

১৪ অঙ্গপত্র।

“ঘৃষ্টে যস্মিন্ ভবেৎ খড়্গে শরীরং প্রতিবিস্মিতম্।

অঙ্গপত্রাভিধং খড়্গং প্রাভঃ খড়্গবিচক্ষণাঃ ॥”

খড়্গকে মার্জন করিলে যদি তাহা দর্পণের আয় শরীর প্রতিবিস্ম ধারণ করে—তবে তাহাকে খড়্গাতত্ত্ব নিপুণ পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

১৫ গজবজ্র।

“যস্যাক্কে স্থূলরেখা ঘনমস্মণরুচিঃ সর্বতী ব্যাপ্য তিষ্ঠেৎ

ধারা তীক্ষ্ণানিসূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধিরস্পর্শমাত্রেন খড়্গাঃ।

যস্যান্মঃ পীযমানং শময়তি নিখিলং ব্যাধিমাধি সমগ্রাং

বৈরিন্শ্রেণী * * প্রবদতি গিরিশী বজ্রমেতৎ গজাদি ॥”

যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, অঙ্গরুচি অতি ঘন ও মস্মণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, রক্ত স্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গধৌতজল পান করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদিদেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

বিভিন্নদেশীয় অসির গুণাগুণ ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না । ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয় । পূর্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকারের অসি নির্মিত হইত, তত্তাবতের তালিকা এই—

“লৌহং প্রধানং খড়্গাখ্যং প্রমুখং নদ্বিষ্মতঃ ।

খটী খট্টর ঋষিক বঙ্ক শূর্পারকেষু চ ॥

বিদেহেষু তথাক্লেষু মধ্যমগ্রামবেদিষু ।

সহগ্রামেষু চীনেষু তথা কালঞ্জরেষু চ ॥”

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্তু তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত । খড়্গ নির্মাণের লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার উৎকৃষ্টতাপকৃষ্টতা বিচারও পৃথক । বিশেষতঃ খটী, খট্টর, ঋষিক, বঙ্ক, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর, এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত ।

“খট্টা খট্টর জানা য়ে দর্ম্মনীয়াস্তু তে মতাঃ ।”

খটী ও খট্টর দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য জানিবে ।

“কায়চ্ছিদ্রস্বর্ষিকা যি মর্ম্মা গুরবল্লথ্য ।”

ঋষিক দেশ প্রভব অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত । ঋষিক দেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল ।

“নীল্লাম্বাচ্ছিদ্রসহা বক্সা দৃঢ়াঃ শূর্পারকৌল্লবাঃ ।”

বঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও চ্ছেদ ভেদে পটু এবং শূর্পা-রক দেশীয় অসি সমধিক কঠিন । (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গ দেশের পূর্বে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল । এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে । বর্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিম ভাগে শূর্পারক দেশ অবস্থিত ছিল) ।

“অসহাস্বৈব বিক্সিয়াপ্রভাবলী বিদেহজাঃ ।”

“অঙ্গদেশীল্লবাস্তীল্লাম্বাঃ——— ॥”

বিদেহদেশ জাত অসি প্রভাবশালী ও অসহ্য তেজস্বী । বর্তমান ত্রিহত দেশকে বিদেহ বলিত । অঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় । বর্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল ।

“লঘবস্ব নথ্য নীল্লাম্বা মধ্যমগ্রামসম্ভবাঃ ।”

মধ্যমগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ । (এই মধ্যম-গ্রাম এক্ষণে কোথায় তাহা নির্ণীত হয় না) ।

“অসারা লঘবস্তীল্লাম্বা বেদিদেশসমুদ্ভবাঃ ॥”

বেদিদেশ প্রভব খড়্গ হালকা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন ।

(পঞ্জাব ও কনোজ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে বেদী দেশ বলিত ।)

“সহগ্রামীভূবাঃ খড়্গাঃ স্তনীচ্ছা লঘবস্তথা ॥”

সহগ্রাম জাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, লঘু, অর্থৎ হালকা ।
সহগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে ।

“নির্মলা নির্মলাস্তুচ্ছাশ্বীনদৈশসমুদ্রমরাঃ ।”

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্মল ও তীক্ষ্ণ । চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে ।

“কালঞ্জরাঃ কালসহাস্তীচ্ছাস্তে লক্ষ্যান্বিতাঃ ॥”

কালঞ্জর পর্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গা উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত । কালঞ্জর পর্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে ।

পরিমাণ ।

৪ অঙ্গুলি পরিসর ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অর্ধ পরিমাণ হইলে তাহা মধ্যম । ২৫ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলা যায় । এইরূপ বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না । বৃহৎ শাস্ত্রধর, আগ্নেয় ধনুর্বেদ ও বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ,—সকলেই এই নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছেন ।

বথা—

“শতাব্দীমঙ্গুলীনাং স্বেচ্ছাং প্রকৌৰ্ণিতম্ ।

মদদ্বী মধ্যমং স্বেচ্ছাং ততো হীনং ন কারয়েৎ ॥”

“পঞ্চাশদঙ্গুলীনাং স্বেচ্ছাং তুরঙ্গুলবিস্তৃতঃ ॥”

কেহ কেহ বলেন যে, ৩০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি
নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও তাহাই উত্তম । বৃহৎ সংহিতা
গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে । যথা—

“অঙ্গুলশতাব্দীমুত্তম জ্ঞানঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিং স্বভ্গং ।”

গঠন ।

পদ্ম পুষ্পের পাব্‌ড়ির অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ
যদি সেইরূপ গঠনের হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর
পত্রের তুল্যাকার হইলে, তাহা তদপেক্ষা উত্তম । বাহার
অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সূগোল কিম্বা কিঞ্চিৎ বক্র—সে
অসি তত প্রশস্ত নহে । যথা—

“স্বভ্গঃ পদ্মপলাশাভীমঙ্গলাগ্রশ্চ শস্যতে ।

করবীরপলাশাগ্রসদৃশশ্চ বিশেষতঃ ॥”

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে “বগী” নামে খ্যাত । কোন কোন
অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন । বৃহৎ
সংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা
আছে । যথা—

“গীজিক্কাসংস্থানী নীলীন্দ্রলবংশপত্রসদৃশস্য ।

করবীরপত্র শূলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ ॥”

গোজিহ্বা, সুঁদী নাইল্ ফুলের পাবড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম ।

ধ্বনি ।

আঘাত করিলে যদি কাক-স্বরের গায় কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উৎথিত হয় কিম্বা অং—ইত্যাকার শব্দ হয়, তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যাজ্য । পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিনী ধ্বনি সদৃশ অর্থাৎ কনকনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী,—সেই খড়্গই শ্রেষ্ঠ খড়্গ, এবং রাজারা তদ্রূপ খড়্গই ধারণ করিবেন । যথা—

“আহতে যত্র খড়্গে স্যাৎ ধ্বনিঃ কাকস্বরীপমঃ ।

যত্র অংকার ধ্বনির্বা স্যাৎ স বর্জ্যো নরপুঙ্গবৈঃ ॥”

“দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দী यस্য খড়্গস্য ভার্গব ।

কিঙ্কিনীসদৃশস্য ধারণং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥”

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ধর্মোত্তর, অগ্নিপুராণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তি কল্পতরু গ্রন্থে খড়্গা সম্বন্ধে কতগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে । তৎপশ্চাৎ খড়্গা যুদ্ধের

সঞ্চরণ মার্গ অর্থাৎ গতি সকল বলা যাইবে । এক্ষণে বৃহৎ
সংহিতার লিখিত বর্ণাদি দোষ এবং শাস্ত্রধরের লিখিত
খড়্গের কোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কয়েক প্রকার অবান্তর
বিষয় বলা যাইতেছে ।

“অঙ্কুলমাসাখ স্নেহী ব্রহ্মাঃ শুম্ভী বিঘ্নমপর্বস্থঃ ।”

“শ্রীমদ্বীর্ঘমানাতপদশিবলিঙ্গ কুণ্ডলাজানাম্ ।

সহস্রাঃ ব্রহ্মাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধস্বলিকানাশ্চ ॥”

“অকলাশ কাক ক্রাভ্যাৎকবন্ধ দৃষ্টিকাশ্রয়ঃ ।

অঙ্কুগে ব্রহ্মা ন শুম্ভদা বংশানুগাঃ প্রভূতাশ্চ ॥”

“স্ফুটিতহৃদ্বঃ কুণ্ডলী বংশচ্ছিন্নীনটভূমনীনুগতঃ ।

অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রীতী বিপর্য্যস্ত ইষ্টফলঃ ॥”

কণিতং মরণাযোক্তং পরাজয়ায় প্রবর্তনং কীশাৎ ।

জয়মুদ্রীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ী ভবতি খড়্গে ॥”

“নাকারণং বিঘ্নয়াৎ ন ঘট্যেচ্চ ।

পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্ ॥”

“দেশং ন চাস্য কথ্যেৎ ন প্রতিমানয়েচ্চ ।

নৈব স্পৃশেৎ নৃপতিরপ্রযতীঃসিয়ষ্টিম ॥”

“নিষ্পন্নো নাচ্ছিত্ত্বী নিষ্কপৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ ।

মূলে ধ্রুয়তে স্বামী জননী তস্যাগতশ্চিন্তে ॥”

‘কাকোলুক সর্বাণাং বিঘ্নমাঙ্কুলিসংস্থিতাঃ ।

বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্তাস্তে কদাচন ।”

“খড়্গং প্রশস্তং মণিহেমযুক্তং

কীৰ্ণে সদা চন্দনচূর্ণযুক্তম্ ।

সংস্থাপয়েৎ ভূমিপতিঃ প্রযত্নাৎ

রুদ্রেত্ তথা চ স্বশরীরবৎ ॥”

“শ্রীবিষ্ণু ধর্মান্তরভাষিতানি

চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি ।

বিশ্ণায় ভূমিপত্যঃ সदैব সর্বৈ

সম্ভারয়েৎসু স্বমুদে ক্রপাণম্ ॥”

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতাব্দি অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গা নির্মাণ করিলে, যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাস্থুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে, তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে পারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, পর্বত, ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুন্তল, পদ্ম, ধ্বজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কুকলাস (গিড়্গিটে) কাক, কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও মস্তকশূণ্য জীব ভয়দায়ক হয়। ক্ষুণ্ণিত (ভাঙ্গা) অথবা সছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ড এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দবর্জিত,—এরূপ খড়্গা অনিষ্টকারী হয়। খড়্গা যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে, তবে জানিবে যে তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে।

খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয়, তবে জানিবে যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে । খড়্গ যদি বিনা কারণে উদগীর্ণ হয়, তবে জানিবে যে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে যুদ্ধে জয় হইবে ।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না । বিনা কারণে অসিকে ঘর্ষণ করিবে না । খড়্গগাত্রে আত্মপ্রতিবিন্দু অবলোকন করিবে না । উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না । কোন্ দেশের অসি তাহাও বলিবেক না । কোনও সময়েই অসিকে অসম্মান করিবেক না । রাজা অশুচি হইয়া অসি যষ্টি স্পর্শ করিবেন না । নিশ্চাণের পর বিষমাস্থুলি হইল দেখিয়া সমাস্থুলি করিবার জন্ত তাহাকে ছিন্ন করিবেন না । নিশ্চাণের পর সমাস্থুলি করিতে হইলে শাণযন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণযুক্ত করিবে । যদি মূলভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে । যদি অগ্রভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে । কাক, উলুক, কি বসার গায় আভাযুক্ত, বিষমাস্থুলি পরিমাণ (বিষোড় অর্থাৎ ৪৯, ৪৭ ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কাষেই শুভদায়ক হয় না । উত্তম অসিকে মণি ও সুবর্ণ ভূষিত ও চন্দনচূর্ণযুক্ত করিয়া সদা

সর্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক । যেরূপ নিজের শরীর যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ যত্নে অসির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । শাস্ত্রধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়াংসম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা বার্তা আছে । এই সকল কথা তত্তাবতের সারসংগ্রহমাত্র ।

অবান্তর কথা এই স্থানেই শেষ করা গেল । অন্য স্থানে ইহার অবশিষ্ট কার্য অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বর্ণন করা যাইবেক ।

অসি, খড়া ও তরবারি;—এ সকল পর্যায় শব্দ । এইজন্তই আমরা “অসি” শীর্ষক প্রবন্ধে কখন খড়া, কখন বা তরবারি শব্দের উল্লেখ করিতেছি । ইতি পূর্বে এতৎসম্বন্ধে আমরা যে প্রথম প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে সকল বক্তব্য পর্যাপ্ত হয় নাই । এজন্ত আমরা এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে বাধ্য হইলাম । প্রথম প্রস্তাবে গুত্রনীতি, আগ্নেয় ধনুর্বেদ, বীরচিন্তামণি, বৃহৎসংহিতা ও বৃহৎ শাস্ত্রধর প্রভৃতির প্রমাণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । পরন্তু কল্পদ্রুম অভিধানে যে যুক্তিকল্পতরু ও খড়াপরীক্ষা নামক গ্রন্থের সংগ্রহ আছে, তাহার অত্যল্প বাক্যও উদ্ধৃত করি নাই । সেই ক্রটি পরিহার করিবার জন্তই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের আরম্ভ । প্রথমে ইহার কল্পদ্রুমধৃত খড়াপরীক্ষার একটা বঙ্গানুবাদ এবং ইহার শেষভাগে খড়াক্রিয়া অর্থাৎ খড়া-

যুদ্ধের সঞ্চরণপ্রণালী বর্ণন করিলাম। কল্পদ্রুম গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, সে গুলিকে সুপ্রাপ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। তদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিলাম।

খড়্গের পরীক্ষা আট প্রকারে নিম্পন্ন হয়। সেই জন্তই খড়্গবিজ্ঞান অষ্টাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। খড়্গের প্রথম বিজ্ঞেয় অঙ্গ, দ্বিতীয় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং তাহার ৮ম পরিমাণ।

খড়্গের অঙ্গ কি? তাহা শুনুন। খড়্গ গঠিত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ (রেখাকার কি বর্ণাকার প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, সেই সকল চিহ্নই খড়্গশাস্ত্র মতে তাহার অঙ্গ। এই অঙ্গ সর্বসমেত (১০০) এক শত প্রকার হইতে পারে, অধিক নহে।

খড়্গের রূপ কি? জাতি কি? নেত্র কি? অরিষ্ট কি? ভূমি কি? ধ্বনি কি? এবং পরিমাণই বা কি রূপ? এ সমস্তই যথাক্রমে বর্ণন করা যাউক। রূপ—খড়্গ যে নীল রঙ কি কাল রঙ, কি অন্য কোন রঙ দৃষ্ট হয়, সেই দৃশ্যই তাহার রূপ।

জাতি—অঙ্গ নামক চিহ্ন থাকায় তদ্বারা যে এক প্রকার নেত্র-প্রীতিকর প্রতীতি জন্মে, তাহাই খড়্গগত জাতির লক্ষণ

নেত্র—মাহাত্ম্য সূচক চিহ্নের নাম নেত্র।

অরিষ্ট—অপকৃষ্টতা বা অশুদ্ধতা বোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট।

ভূমি—অঙ্গাদির লক্ষণধারণের নাম ভূমি (ক্ষেত্র)।

ধ্বনি—নথাঘাত কি কাষ্ঠিকাঘাত করিলে যে শব্দ হয়—সেই শব্দই তাহার ধ্বনি।

মান—তুলনা বা দীর্ঘতা বিশেষের নাম মান

খড়া সম্বন্ধীয় এই আট প্রকার জ্ঞানের নাম খড়া বিজ্ঞান। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অঙ্গ, রূপ, জাতি নেত্র ও অরিষ্ট, এই পাঁচ লক্ষণ কৃত্রিম হইতে পারে; পরন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ ধ্বনি ও মান এই দুইটী লক্ষণ স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, বিচক্ষণ খড়াতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উহা অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করিবেন।

খড়াশাস্ত্রে ইহাও নিখিত আছে যে, খড়োর অঙ্গ শত প্রকার, রূপ চারি প্রকার। রূপ চারি প্রকারের ত্রায়, জাতিও চতুর্বিধ, নেত্র ত্রিংশৎ, অরিষ্টও সেই পরিমাণ, ভূমি দুই প্রকার, ধ্বনি আট প্রকার, এবং মানও প্রধানতঃ দুই প্রকার।

শত প্রকার অঙ্গ বা চিহ্ন যাহা লৌহার্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা এই—

রৌপ্যরেখা, স্বর্ণরেখা, গজশৃঙাকার চিহ্ন, দমন অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের পত্র সদৃশ চিহ্ন, শুভ্র স্থূল রেখা, কৃষ্ণবর্ণ

রেখা, সূক্ষ্ম অরুণ রেখা, মূল হইতে অগ্রপর্যন্ত তিনটী সূক্ষ্ম ও
 শুভ রেখা, পদ্মদলাকার রেখা, গদাচিহ্ন, পিপ্পলী তুল্য চিহ্ন,
 গ্রহি অর্থৎ গাঁট্ চিহ্ন, শালপানপত্রাকার ও তিতির পক্ষীর
 পক্ষতুল্য চিহ্ন, মালা চিহ্ন, জীরক চিহ্ন, ভ্রমর চিহ্ন, উদ্ধগামী
 কপিলবর্ণ শিখা চিহ্ন, মরিচ চিহ্ন, ফণিফণাকার চিহ্ন, অশ্ব-
 খুর চিহ্ন, ময়ূরপিচ্ছাকার চিহ্ন, সর্ষপশরীর কৃষ্ণ ও ধার
 শুভবর্ণ, মধুবুদ্বুদাকার চিহ্ন, কুণ্ডলীকৃত ও কোণযুক্ত ক্ষুদ্র
 চিহ্ন, মক্ষিকাচিহ্ন, তুষাকার চিহ্ন, যবাকার চিহ্ন, ধাত্যাকার
 চিহ্ন, তীসিনামক বীজের আয় চিহ্ন, সর্ষপবীজচিহ্ন, সিংহা-
 কার চিহ্ন, তণ্ডুলচিহ্ন, শিরা চিহ্ন, শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন, ব্যাস্ত্র
 নখাকার চিহ্ন, গোকুর চিহ্ন, মকর পুচ্ছাকার চিহ্ন, নেত্রাকার
 চিহ্ন, কেশচিহ্ন, স্থূলপ্রকৃতি ও নিশ্চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার ও নিশ্চিহ্ন,
 কাকপদাকার চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, পত্রাবলী চিহ্ন, অথবা
 পক্ষি-পক্ষ চিহ্ন, তুবরী নামক শস্ত্রের আকার বিশিষ্ট চিহ্ন,
 বিশ্বীফলাকার চিহ্ন, প্রিয়ঙ্গু সদৃশ চিহ্ন, সর্ষপপুষ্পাকার চিহ্ন,
 নীলীরস তরঙ্গের আয় চিহ্ন, রক্তবর্ণ ত্রিরেখা চিহ্ন, যব পত্রা-
 কার চিহ্ন, লগুন ত্বক্ তুল্য চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন ও নিম্নল প্রকৃতি,
 মঞ্জিষ্ঠালতাকার চিহ্ন বা রেখা, শমীপত্রাকার রেখা, রোহিত
 মংস্ত্রের শঙ্কাকার রেখা, শফরীশঙ্কাকার রেখা, মারিষ পত্রা-
 কার রেখা, ভৃঙ্গরাজ পুষ্পবৎ চিহ্ন, খুরবৎ ধার ও নিশ্চিহ্ন,
 ধারস্থান কখন তীক্ষ্ণ কখন বা মৃদু এবং ভূমি সকল, কখন বা

নির্মল, জলতরঙ্গের গ্রায় দৃশ্যমানতা, ধারমোটা ও অবয়ব
 নিশ্চিহ্ন, গুঞ্জফলাকার চিহ্ন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাণ চিহ্ন, দুর্বাদল-
 বর্ণ ও ধার তীক্ষ্ণ, বিল্লপত্রাকার দাগ, মসুর পত্রাকার দাগ,
 শোণপুষ্প তুল্য রেখা বিশিষ্ট, শঠী পত্রাকার দাগ, বিড়াল
 লোমাকার চিহ্ন, কেতকী পত্রাকার দাগ, মূৰ্বা (সূচী মুখ
 নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ) তন্তুর গ্রায় দাগ, অর্থাৎ অঁশ অঁশ চিহ্ন,
 অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অল্প লোহের ছেদক, কলায় পুষ্পাকার
 চিহ্ন, চম্পক কুমুমাকার চিহ্ন, বলানামক লতার পত্রাকার
 চিহ্ন, বটের নামনার গ্রায় দাগ, বাঁশের ন্যায় নীলবর্ণ, শ্বেত
 ও কৃষ্ণবর্ণ, পত্রশিরাকার রেখা, জ্যেষ্ঠীসদৃশ চিহ্ন, জালা
 কার চিহ্ন, পিপিলিকারার চিহ্ন, নলপত্রাকার চিহ্ন, ঘর্ষণ
 করিলে কণা বাহির হয় এরূপ গুণবিশিষ্টতা, কুম্বাণ্ড বীজবৎ
 দাগ, লোমবৎ চিহ্ন, সিজ বৃক্ষের কণ্টকাকার চিহ্ন, বদরী
 পত্রাকার চিহ্ন, বকুল পুষ্পাকার চিহ্ন, কাঁজির গ্রায় দৃশ্য অর্থাৎ
 নানা প্রকার মিশ্র চিহ্নযুক্ত, নিশ্চিহ্ন ও মহিষের গ্রায়
 কৃষ্ণবর্ণ, স্বাভাবিক নির্মল, নৈর্মল্যের উপর উর্দ্ধ রেখা ও
 বক্র রেখা।

এই সকল লক্ষণ যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ খড়্গের গঠনের
 সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য নচেৎ কৃত্রিম
 করিলে অগ্রাহ্য। উল্লিখিত শত চিহ্নের মধ্যে কতকগুলি
 উৎকৃষ্টতা বোধক এবং কতকগুলি নিকৃষ্টতা জ্ঞাপক। যে

সকল চিহ্নের দ্বারা খড়্গের উত্তমতা জানা যায়, সেগুলি বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে ।

রৌপ্যাদ্ধ ও স্বর্ণ রেখাদ্ধ,—এই দুই খড়্গ উত্তম । গজশৃঙ্গাদ্ধ খড়্গ উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, রক্তস্পর্শ মাত্র ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহা ধৌত করিলে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা পান করিলে অনেক ব্যাধি শান্তি হয় । রণুবীজ চিহ্নযুক্ত খড়্গও উত্তম । দমন পত্রাদ্ধ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার অন্য এক পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল রাখিয়া দিলে একদিন পরে সে জলে দমন পত্রের গন্ধ উপস্থিত হইবে । স্কুলাদ্ধ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব শরীরে শোথ জন্মে । অরুণাদ্ধ খড়্গও ভাল, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সূর্য্য-কিরণ স্পর্শে ইহা হইতে এক প্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং ইহার সহিত পদ্মকোরক একত্রিত রাখিলে তাহা রাত্রিকালেও ফুটিয়া থাকে । তিলাদ্ধ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তাহার অন্য এই এক লক্ষণ আছে যে, তদ্বারা ক্ষত হইলে, ক্ষত স্থান হইতে তিলতৈলবৎ বস্তু নির্গত হয় । অগ্নিশিখাদ্ধ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তদুপরি শীতল জল রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া যাইবে । মালাদ্ধ চিহ্নযুক্ত উত্তম খড়্গের অন্য এক পরীক্ষা এই যে, তৎপ্রক্ষালিত জল সুগন্ধ । ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই যে, ইহার উপর তপ্ত জল রাখিবামাত্র শীতল

হইয়া যায় । এই খড়্গ আবার পিতরোগের ঔষধ বিশেষ । জীরকাস্থ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র জ্বর হইয়া থাকে এবং ভ্রমরাস্থ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ-চিকা রোগ জন্মে । লাস্থলাস্থ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তৎস্পর্শে সর্প মরিয়া যায় । মরিচাস্থ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরের রক্ত সমুদায় কটু অর্থাৎ ঝাল আস্বাদ হইয়া যায়, এবং ইহার ক্ষালন জলের দ্বারা পীনস রোগ নষ্ট হয় । সর্পফণাস্থ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে বিষ-বিকার উপস্থিত হয়, এবং ইহার স্পর্শমাত্র ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে । অশ্ব খুরাস্থ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তাহার স্পর্শে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে এবং তাহা দ্বারা অনেকবিধ রোগ নষ্ট হয় । সর্ষপ পুষ্প চিহ্নযুক্ত খড়্গও উত্তম । ইহা এত কোমল যে, ইহাকে কুণ্ডলীকৃত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে আবার যে সেই হয়, অর্থাৎ ইহাতে স্থিতিস্থাপক গুণ অতি প্রবলরূপে থাকে । ময়ূর পিচ্ছাস্থ খড়্গও উত্তম । কোনও সর্প ইহার স্পর্শ সহ করিতে পারে না এবং ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে নিরন্তর বমি হয় । ক্ষৌদ্রাস্থ খড়্গও উত্তম । ইহার অণু এক লক্ষণ এই যে, সর্বদাই ইহাতে মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে । মক্ষিকাস্থ খড়্গের গাত্রে তৈলনির্মিষ্ট করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায় । সিংহাস্থ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র মানুষ উন্মত্ত হইয়া পড়ে । তণ্ডুলাস্থ খড়্গ অতি উত্তম । ইহার পরীক্ষা

এই যে, ইহাতে জল পর্যুষিত হইলে তাহা তণুলোদ-
কের ন্যায় দৃশ্য হইয়া যায়। মকর পুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গের এই
এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তৎস্পর্শে মৎস্য মাত্রেই মৃত হয়।
নেত্রাঙ্গ খড়্গের এই এক আশ্চর্য গুণ থাকে যে, তৎধৌত
জলের দ্বারা রাত্র্যন্ধতা নষ্ট হয়। বিশ্ব ফলাঙ্গ খড়্গের
পরীক্ষা এই যে, তাহাতে জল রাখিলে তাহা তিত্তাস্বাদ
হইয়া যায়। সেই জলের দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়।
লগুনাঙ্গ খড়্গা ধৌত জলের দ্বারা আমবাত রোগ নষ্ট হয়।
প্রোষ্ঠীশঙ্ক চিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক মহৎ গুণ আছে যে, উহা
জলে ভাষে। এই খড়্গা অতি দুর্লভ। চম্পক পুষ্পাঙ্গ
খড়্গের জলও তিত্তাস্বাদ হয়। লোম চিহ্নযুক্ত খড়্গের দ্বারা
ক্ষত হইলে সর্বশরীরে ব্রণ হয়। সিজ পত্রাকার গাত্র ও
সিজকণ্টকাকার চিহ্ন এরূপ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ,
তৃষ্ণা ও মূচ্ছা হয়, এবং ইহার অন্য এক আশ্চর্য ক্ষমতা
এই যে, যদি ইহাকে সর্প ফণার উপর স্থাপন করা যায়, তাহা
হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই
খড়্গের ধৌত জলের দ্বারা কুষ্ঠরোগ উপশান্ত হয়। বকুলাঙ্গ
খড়্গের এই এক অসাধারণ লক্ষণ আছে যে, শাণবর্ষণের
সময় উহা হইতে বকুল পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়।

এখনকার খড়্গে আর এ সকল লক্ষণ প্রায় দৃষ্ট হয় না।
তাহার কারণ আর কিছু না, কেবল লৌহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের

অভাব। লক্ষণাক্রান্ত লৌহ এখন কেহ চিনেন না, স্মৃতির
লক্ষণাক্রান্ত খড়্গও জন্মে না। পূর্ব কালের লোকেরা এ
সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। স্মৃতির
পুরাতন কালের এ সকল কথা নিতান্ত অলীক বা গল্প কথা
নহে। সে যাহা হউক, শত প্রকার চিহ্নের মধ্যে কোন্
কোন্ চিহ্ন তৎকালে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল,
সেগুলিও বলা যাউক।

যবচিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, শিরা চিহ্ন, উপল চিহ্ন, কাকপদ
চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, তুবরী ফলচিহ্ন, ভৃঙ্গরাজপুষ্পচিহ্ন, খুর
চিহ্ন, জলতরঙ্গ চিহ্ন, মার্জার রোম চিহ্ন, বটারোহ (বট-
বৃক্ষের নামনা বা শিকড়) চিহ্ন, জ্যেষ্ঠী (গিড়গিটে) চিহ্ন,
জালচিহ্ন (শাণ দিলে যদি রক্তবর্ণ শিখা বহির্গত হয়,
তবে এ চিহ্নও ভাল বলিয়া গণ্য), নিশ্চিহ্ন, স্থলধার ও
আঘাত সহ, কর্কন্দু অর্থাৎ বদরী পত্রের পৃষ্ঠের আয় চিহ্ন;
খড়্গশাস্ত্রে এই সকল চিহ্নচিহ্নিত খড়্গ পরিত্যাজ্য বলিয়া
উক্ত হইয়াছে। পূর্বে যে চারি প্রকার রূপের কথা বলা হই-
য়াছে, এক্ষণে সে সমুদায়ের প্রভেদ বর্ণনা করা যাউক।

রূপ।

নীলরূপ—যাহার ভূমি অর্থাৎ খেং নীলরস, কলায়
পুষ্পের কান্তি, গৃগ্নন অর্থাৎ গাজোর পুষ্পবৎ আভাযুক্ত।

নীলম্ বা নীলকাচের গ্ৰায় আভাযুক্ত, অথবা মরকত মণির গ্ৰায় কান্তি,—তাহার সেই সেই কান্তির নাম নীলরূপ ।

কৃষ্ণরূপ—খড়্গের ক্ষেত্রে যদি কাল মেঘ, মসীরস অর্থাৎ সেহাই, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ, কিন্না ভ্রমরাকার বর্ণ দৃশ্য হয়, তবে তাহা খড়্গের কৃষ্ণরূপ ।

পিঙ্গলরূপ—খড়্গের ভূমিতে বা গাত্রে যদি নব বর্ষার ভেকের রঙ অথবা গোমেদ মণির রঙ প্রতিভাত হয়, তবে তাহা তাহার পিঙ্গলরূপ ।

ধূম্ররূপ—খড়্গে যদি অনতিগাঢ় ধূমপটলের কিন্না শিরীষ পুষ্পের বর্ণ প্রতিভাত হয়—তবে তাদৃশ বর্ণ তাহার ধূম্ররূপ ।

নাগাজুঁন বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত চারি প্রকার রূপ ভিন্ন মিশ্ররূপও হইয়া থাকে ।

জাতি ।

পূর্বে যে অসির জাতি বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল কথা এক্ষণে সবিস্তারে বর্ণন করা যাউক ।

বিপ্রজাতি—খড়্গাতত্ত্ববিৎ নাগাজুঁন বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ চিহ্নযুক্ত, বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত, উত্তম নেত্রযুক্ত, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন, ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গণ্য । ইহার দ্বারা অত্যন্ত ক্ষত হইলেই সর্বাঙ্গে ঘোর যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয় । মূচ্ছা, পিপাসা

দাহ ও জ্বরাভিভূত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বিযুক্ত করে। ইহার অগ্ন্য এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, হরিতকী, আমলকী, ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুটিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে উল্লিখিত খড়্গের উপর এক দিবারাত্র রাখিয়া দিলে তাহার কষায় রসে উহা মলিন হইবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। ইহার আরও এক পরীক্ষা আছে। যথা—নবোদিত সূর্য্য কিরণে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর এই ব্রাহ্মণ-জাতীয় অসিকে যদি কিয়ৎক্ষণ স্থাপন করা যায়, তাহা লইলে তৃণগুলি দন্ধ হইয়া যাইবে। এই খড়্গা সুলভ নহে। ইহা স্বর্গীয়। পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে ইহা কখন কখন পাওয়া যায়।

ক্ষত্রজাতি—ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাত সহ্যকারী,—এরূপ খড়্গা ক্ষত্রজাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্র বিষ্টন্ত, জ্বর, মূচ্ছা ও মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু বহ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নিম্নল থাকে।

বৈশ্যজাতি—যাহা নীল ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, সংস্কার করিলে অত্যন্ত নিম্নল হয়, এবং শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, এরূপ খড়্গা বৈশ্যজাতি বলিয়া গণ্য।

শূদ্রজাতি—মেঘের ঝায় বর্ণ, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু,

সংস্কার করিলেও মালিন্য যায় না, শাণ দিলেও খরতা জন্মে না, ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় না, এতদ্রূপ অসি শূদ্রজাতীয় এবং হই। দূরে পরিত্যাজ্য ।

খড়্গ যদি জাতিদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে জারজ বা দ্বিজাতি খড়্গ বলিয়া জানিবে। তিন জাতির লক্ষণ থাকিলে ত্রিজাতি এবং উল্লিখিত চারি জাতির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিবে।

নেত্র ।

ইতিপূর্বে আমরা অসির নেত্র আছে এবং তাহা ত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রিংশৎ নেত্র কি ? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিব।

নেত্র শব্দের অর্থ অণু কিছু নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লৌহ একত্রিত করিয়া অসির গঠন নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে অসির কায়ায় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা দাগ জন্মে। সেই সকল চিহ্ন বিশেষের নাম নেত্র। খড়্গতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, নেত্রচিহ্ন ত্রিশ প্রকারের অধিক হয় না। কিরূপ চিহ্ন হইলে তাহা নেত্র বলিয়া গণ্য, তাহা ক্রমশঃ উদাহৃত হইতেছে।

চক্র—অসি অঙ্গে চক্রাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা চক্রনেত্র। ইহা শুভ।

পদ্ম—পদ্মাকার কিম্বা পদ্মদলাকার চিহ্নের নাম
পদ্মনেত্র । ইহাও ভাল ।

গদা—উর্দ্ধগামী শূল গদাকার রেখার নাম গদা নেত্র ।

শঙ্খা—খড়্গা মধ্যে শঙ্খাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা
শঙ্খনেত্র ।

ডমরু—ডমরু তুল্য চিহ্নও তন্মামক নেত্র ।

ধনুঃ—ধনুরাকার চিহ্ন ধনুনেত্র ।

অকুশ—অকুশ (ডাঙ্গশ) সদৃশ চিহ্ন অকুশ-নেত্র ।

ছত্র—ছত্রাকার চিহ্ন ছত্রনেত্র ।

পতাকা—পতাকাকার চিহ্ন পতাকা-নেত্র ।

বীণা—বীণাকৃতি চিহ্ন বীণা-নেত্র ।

মৎস্য—মৎস্য কিম্বা মৎস্যপুচ্ছু চিহ্ন মৎস্য-নেত্র ।

শিব—শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন শিব-নেত্র ।

ধ্বজ—ধ্বজাকার চিহ্ন ধ্বজ-নেত্র ।

এই রূপ অঙ্কচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্র-নেত্র, সিংহ,
সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গা, মনুষ্য
পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, ও সর্প নামক নেত্রের
লক্ষণ জ্ঞাত হইবে । কোন খড়্গের এক নেত্র, কোন খড়্গের
দ্বিনেত্র ও কোন খড়্গা বহুনেত্রও হইতে পারে, ইহাও
জানিবে ।

অরিষ্ট ।—এই অরিষ্টও চিহ্ন বিশেষ । যে চিহ্ন থাকায়

অসি অমঙ্গল প্রদ হয় সেই সকল চিহ্নের নাম অরিষ্ট । এই অরিষ্ট চিহ্ন ৩০ প্রকার । নেত্র চিহ্নের সহিত অরিষ্ট চিহ্নের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে । এজন্য অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা কত্তব্য । পরন্তু খড়্গশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নেত্র চিহ্নের স্থান-নিয়ম আছে, কিন্তু এই অরিষ্ট চিহ্নের কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই । খড়্গের যে কোন স্থানে অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয় । অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণ-গুলি এই—

ছিদারিষ্ট—ছিদ্রতুল্য চিহ্ন ।

কাকপদ—কাকপদাকার চিহ্ন ।

রেখা—উর্দ্ধ বা তির্য্যক ভাবে রেখা চিহ্ন ।

ভিন্ন—ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন ।

ভেকশির—ব্যাঙের মস্তকাকার চিহ্ন ।

মূষিক—মুষিকার চিহ্ন ।

বিড়াল-নেত্র—বিড়ালের চক্ষুর স্থায় চিহ্ন ।

শর্করা—দেখিতে কিন্না স্পর্শ করিলে কাঁকরদার বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন ।

নীলী—নীল রসের দাগ লাগার স্থায় চিহ্ন ।

মশক—মশকাকার চিহ্ন-নিচয় ।

ভৃঙ্গমা—অনেক বিন্দু চিহ্ন বা ভ্রমরপদ চিহ্ন ।

সূচী—উর্দ্ধ বা তির্ঘ্যক্ ভাবের সূচিবৎ রেখা চিহ্ন ।

বিন্দু—উপরি উপরি বা অধঃ অধঃ বিন্দু ত্রয় বা বিষম বিন্দু সমূহের পঙ্তি চিহ্ন ।

কালিকা—অধঃ অধঃ ত্রিবিন্দু পঙ্তির চিহ্ন ।

দারী—বহুস্থানে ঐ বিন্দু চিহ্ন ।

কপোত—কপোত পক্ষীর পক্ষাকার চিহ্ন ।

কাক—কাকাকৃতি চিহ্ন ।

খর্পরাকার—খর্পরাকার চিহ্ন বা দাগ (খর্পর—নরকপালার কার পাত্র) ।

শকল—খণ্ডলোহ সংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন ।

ক্রেড়—শূকরাকার চিহ্ন ।

কুশ পত্রক —কুশ গুচ্ছাকার চিহ্ন ।

জাল —মধ্যস্থল কিম্বা অন্য কোন স্থান নিম্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, এরূপ চিহ্ন ।

করাল—অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত, এরূপ রেখা চিহ্ন ।

কঙ্কপত্র—কঙ্ক পত্রাকার চিহ্ন (কঙ্ক—পক্ষী বিশেষ ।)

খর্জুর—খর্জুর-বৃক্ষাকার চিহ্ন ।

শৃঙ্গ—গোশৃঙ্গাকার চিহ্ন ।

পুচ্ছ—গোপুচ্ছাকার চিহ্ন ।

খনিত্র—খনিত্র (খন্ড তুল্য চিহ্ন) ।

লাঙ্গল—লাঙ্গলাকার চিহ্ন ।

বড়িশ—বড়িশাকার চিহ্ন (বড়িশ—মৎস্য বেধন= বড়শী) ।

এই সমস্ত অরিষ্ট চিহ্ন উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেক । নচেৎ অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত অসি হইতে ভর্তার বিবিধ বিপদ উত্থিত হইয়া থাকে ।

ভূমি ।

অসির ভূমি আছে এবং তাহা দ্বিবিধ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরন্তু তাহার কোন লক্ষণ বলা হয় নাই । সুতরাং ভূমি জ্ঞানের নিমিত্ত এক্ষণে তদুভয়ের লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে ।

ভূমি শব্দের এক অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ কায়া । এস্থলে সে অর্থ বলিবার কোন অভিপ্রায় নাই । উহার দ্বিতীয় অর্থ জন্মস্থান । এস্থলে সেই অর্থই প্রতিপাদ্য । পরন্তু কেবল খড়্গের জন্মস্থান নহে, লৌহের জন্মস্থানও বক্তব্য । উৎপত্তি স্থানের গুণে খড়্গের যে উত্তমাদম গুণ জন্মে, তাহাই এই ভূমি পরীক্ষায় বক্তব্য ।

খড়্গের ভূমি দ্বিবিধ । দিব্য ও ভৌম । স্বর্গ নামক স্থানে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সমস্তই দিব্য এবং

ভারতভূমিতে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সকল ভৌম। এই দ্বিবিধ খড়্গের সামান্য লক্ষণ এই যে, পুরাকালের দেবগণ ও দানবগণ হইতে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গ কোন কোন পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে সকল খড়্গ স্থলধার, অত্যন্ত হালকা, নিম্নল চিহ্ন যুক্ত, সুন্দর নেত্র যুক্ত, অরিষ্টহীন, সুরূপ, সংস্কার না করিলেও নিম্নল থাকে, দুর্ভেদ্য, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, ধ্বনি উত্তম, যাহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অস্ত্র পাক জন্মে—সেই সকল খড়্গ দিব্য বলিয়া জানিবে। এই দিব্য খড়্গ প্রাপ্ত হইলে জয় ও জীবুদ্ধি হয়।

ভৌম খড়্গের লক্ষণ পরিজ্ঞানার্থ অগ্রে লৌহ জ্ঞানের আবশ্যক আছে। সে সম্বন্ধে এই রূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে মহাদেব যখন বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন তখন সেই ভক্ষ্যমান বিষ, বিন্দু বিন্দু ক্রমে দেশে দেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল বিষ হইতে সেই সেই দেশে কালায়স অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌহ বা ইস্পাত জন্মিয়াছিল। আর তৎপূর্বে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা দেবতা কর্তৃক পীত হইয়াছিল, সেই পীয়মান অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহের জন্ম হইয়াছিল। বিষ-জন্মা লৌহ সকল অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ ও কক্শ। এ লৌহ শরীরে প্রবেশ করিলে মূচ্ছা, দাহ, জ্বর, মল মূত্রবিষ্টন্ত, শোথ, হিক্কা ও

বর্মী উপস্থিত হয় । আর যাহা অমৃত জন্মা—তাহার বর্ণ
কবুঁর ও স্পর্শ মৃদু । এ লৌহের দ্বারা শরীর দৃঢ়, পালিত্য
নাশ, মালিন্য নাশ, জ্বর ও ব্যাধি বিনাশ হয় । এই শুদ্ধ
লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র
এবং অন্য কোন কোন পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হয় । বারাণসী
জাত শুদ্ধ লৌহের দ্বারা যে সকল অসি প্রস্তুত হয়, সে সকল
অসি স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণধার, সূচিহুশালী, লঘু অর্থাৎ হালকা,
সুসংশ্লিষ্ট ও অভেদ্য । মগধ অসি সকল কর্কশ, স্থূলধার,
গূঢ়চিহ্নযুক্ত, গুরু অর্থাৎ ভারযুক্ত, ও দুঃসন্ধেয় । নেপাল
দেশজাত অসি নিশ্চিহ্ন, নিশ্চল, মলিন, লঘু ও স্থূলধার ।
কলিঙ্গ দেশীয় অসি গুরু ও অত্যন্ত কর্কশ । সিংহল দ্বীপ
জাত অসি ৪ চারি প্রকার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কোন
অসি সূচিহ্নযুক্ত, ভারি, কর্কশ ও স্নিগ্ধধার । কোন অসি লঘু,
স্নিগ্ধ ও স্থূলধার । কোন কোন অসি মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত ।
ঔড়্র, কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্ডি, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বহুপ্রকার
শুদ্ধ লৌহ আছে । তন্মধ্যে এক মাত্র বজ্র লৌহই অস্ত্রের
উপযুক্ত, অবশিষ্ট লৌহ সকল ঔষধের উপযোগী ।

ধ্বনি ।

ধ্বনি অর্থাৎ শব্দের দ্বারা খড়্গের উত্তমাদম পরীক্ষা হইয়া
থাকে । সেই ধ্বনি অষ্ট প্রকার, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে,

কিন্তু কি কি প্রকার ? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই, এজন্য এস্থানে তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে ।

খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ । ঘোর ও ভার । এই দুয়ের অন্তর্গত প্রথমতঃ ৪ । খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি হংসকণ্ঠধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হংসধ্বনি বলা যায় । হংসধ্বনিযুক্ত খড়্গা উত্তম বলিয়া গণ্য । ১

খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি কাংস্য-ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাংস্যধ্বনি বলা যায় । ২

অসিতে আঘাত করিলে যদি মেঘগন্তীর-ধ্বনি উত্থিত হয়, তবে তাহাকে অভ্রধ্বনি বলিব । ইহাও ভাল । ৩

খড়্গে আঘাত করিলে যদি ঢক্কাধ্বনির ন্যায় ভারধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে ঢক্কাধ্বনি বলিব । ইহাও ভাল । ৪

অসিতে নখাঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায় বিস্মর বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাক ধ্বনি বলা যায় । ইহা অত্যন্ত অধম । ৫

নখাঘাত করিলে যদি তরবারি হইতে বীণাধ্বনির অনুরূপধ্বনি জন্মে, তাহা হইলে তাহা তন্ত্রীধ্বনি বলিয়া গণ্য । ইহাও ভাল নহে । ৬

নখাঘাত প্রাপ্ত অসির অঙ্গ হইতে যদি গর্দভের ন্যায়

ভ্যাদ্ভেদে শব্দ বহির্গত হয়, তবে তাহার নাম খরধ্বনি।
ইহা অত্যন্ত মন্দ। ৭

আঘাত প্রাপ্ত হইবা মাত্র খড়া হইতে যদি প্রস্তরাঘাত
তুল্য ধ্বনি জন্মে, তবে তাহাকে প্রস্তরধ্বনি বলা যাইবে।
ইহাও অত্যন্ত অধম। ৮

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধ্বনির তারতম্য বুঝিতে অক্ষম হইলে
এই সামান্য লক্ষণের অনুসরণ করিবে। কি? না গভীর ও
তারধ্বনি ভাল, এবং উত্তান ও মন্ত্রধ্বনি মন্দ। ধ্বনি যদি
উত্তম হয়, তবে অন্য কোন সূচি না থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য
ও উত্তম বলিয়া গণ্য। যেমন অন্ধ ও কুরূপ মনুষ্য সুস্বর ও
সুগায়ক হইলে সে উত্তম বলিয়া মাত্র গণ্য হয়, এবং
সর্বসুলক্ষণ মনুষ্যও কুস্বর ও কুগায়ক হইলে নিন্দা প্রাপ্ত
হয়, খড়া সমন্ধেও সেইরূপ জানিবে। খড়্গের ধ্বনি-বিজ্ঞান
সমন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, অসিতে নখ, কঠিন ও ক্ষুদ্র
দণ্ড, লৌহ শলাকা, লোষ্ট্র ও কাঁকরের আঘাত করিবে।
আঘাতটী যেন আল্গোচে করা হয়, এবং খড়্গকেও যেন
আল্গোচে রাখা হয়। অতঃপর তাহা হইতে যে ধ্বনি
উৎথিত হইবে—সেই ধ্বনির সহিত পূর্বোক্ত পদার্থের ধ্বনির
তুলনা করিবে। তুলনা করা অভ্যস্ত হইলে তখন
অনায়াসেই ধ্বনির তারতম্য বা প্রভেদ জ্ঞাত হইতে
পারিবে।

মান ।

অসির মান অর্থাৎ কায়ার দীর্ঘতা, খর্ব্বতা ও ওজনের
অন্বাধিক্য প্রভৃতি উত্তমাধম গুণের জ্ঞাপক । এজন্য দ্বিবিধ
পরিমাণের প্রতিও দৃষ্টি করা আবশ্যিক ।

পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ । উত্তম ও অধম । যাহা
বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম-মান এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু—
তাহা অধম-মান । ইহাও আবার ত্রিবিধ । আদি, মধ্য ও
অন্ত্য । যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি, বিস্তৃতি ৬ অঙ্গুলি এবং
ওজনে ৮ পল, তাহা মধ্যম । যাহা ১২ । ৮ কি ৯ মুষ্টি আয়ত,
উক্ত মানের এক চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি এবং ওজনে তত পল,
সে খড়্গা ভাল নহে ।

এসম্বন্ধে খড়্গাতত্ত্ববিৎ নাগাজুন যাহা বলিয়াছেন,
তাহাই খড়্গের উত্তমাধম পরিমাণ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপায় ।
যথা—

“যাবন্ত্যী মুষ্টযী দৈর্ঘ্যে তদ্বর্দ্ধাঙ্গুলযী যদা ।
প্রসরে তচ্চতুর্থাংশমিতি বৈ মানমুত্তমম্ ॥
যাবন্ত্যী মুষ্টযী দৈর্ঘ্যে প্রসরে ত্বেত্রিভাগিকঃ ।
পলৈস্তদ্বর্দ্ধৈ স্তুলিতঃ স খড়্গী মধ্য ভূচ্যতে ॥
যাবন্ত্যী মুষ্টযী দৈর্ঘ্যে তুর্থাংশঃ প্রসরৈস্তু তত্ ।
অধমঃ কীর্ণিতঃ খড়্গগজত্সমীবাধিকঃ পলৈঃ ॥”

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন,—ইহাই খড়্গের উত্তম পরিমাণ । যথা (২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ২৥০ অঙ্গুল বিস্তৃতি ও ২৥০ পল ওজন) ।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ পল ওজন,—ইহাই মধ্যম পরিমাণ । যথা ২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃতি এবং ৫ পল ওজন ।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির ৪ ভাগের একভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ (সমান) বা অধিক পল ওজন । ইহা অধম পরিমাণ । ভোজদেব খড়্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অন্যবিধ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

দীর্ঘতা লঘুতা চৈব খরী বিলীর্ণতা নথা ।

দুর্মেদ্যতা সুমুখতা খড়্গানাং গুণসংগ্রহঃ ॥”

খর্বতা গুরুতা চৈব মন্দতা ননুতা নথা ।

সুমেদ্যতা দুর্ঘটতা খড়্গানাং দোষসংগ্রহঃ ॥

দীর্ঘ, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, তীক্ষ্ণ, বিস্তৃত, দুর্ভেদ্য, সুগঠন,—এই গুলিই খড়্গের গুণ । এবং খর্ব অথচ ভারি, নরম-ধার, সরু, ভঙ্গপ্রবণ ও গঠন ভাল নহে,—এই গুলিই খড়্গের দোষ । এই সকল গুণ দোষ বিচার পূর্বক রাজা গুণযুক্ত অসিই ধারণ করিবেন ।

অসিই রাজাদিগের যুদ্ধ কালের প্রধান সহায় । এজন্য রাজাদিগের বা যোদ্ধাদিগের অসির ধারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া শিক্ষা ও অভ্যস্ত করিতে হয় । যুদ্ধ শাস্ত্রের লিখিত ৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ সঞ্চালন-ক্রিয়া ও ভ্রমণ মার্গ সকল জ্ঞাত হইয়া তাহা উত্তমরূপে অভ্যস্ত করিতে হয় । বাম হস্তে চক্ষু (ঢাল) উদ্যত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার সঞ্চরণ মার্গে অবস্থান করতঃ ছেদ, ভেদ, ছিদ্রকরণ, (ফুটান) বিদীর্ণ করণ ও প্রোথিত করণ প্রভৃতির দ্বারা শত্রু-বল নষ্ট করিতে হয় । ৩২ প্রকার করণের অর্থাৎ গতির ও সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম এই ;—

“ভ্রান্তমুদ্রভ্রান্তমাবিদ্ধমাস্তুতং বিস্তুতং স্তুতম্ ।

সংযান্তং সমুদীর্ণম্ভ নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা ॥

পাদাবকর্ষণ-সন্ধানি শিরী ভুজ পরিধর্মণী ।

পাশ পাদ বিবন্ধানম্ভূম্যুদ্রমস্রণকৌ তথা ॥

গত প্রত্যাগতাচ্চিপাঃ পাতনীত্যানকৌ স্তুতম্ ।

লাঘবং সৌষ্ঠবং শীঘ্রা স্থিরত্বং দৃঢ়মুষ্টিতা ।

নির্য্যগূর্হ প্রচরণে দ্বাভিংশত্ করণান্যথ ॥”

[বৈশম্পায়নীক্ত ধনুর্বেদ ।

১ ভ্রান্ত, ২ উদ্ভ্রান্ত, ৩ আবিদ্ধ, ৪ আপ্সুত, ৫ বিপ্সুত, ৬ স্তুত, ৭ সংযান্ত, ৮ সমুদীর্ণ, ৯ নিগ্রহ, ১০ প্রগ্রহ, ১১ পদাবকর্ষণ, ১২ সন্ধান, ১৩ মস্তক ভ্রামণ, ১৪ ভুজভ্রামণ, ১৫ পাশ,

১৬ পাদ, ১৭ বিবন্ধ, ১৮ ভূমি, ১৯ উদ্ভ্রমণ, ২০ গতি, ২১ প্রত্যাগতি, ২২ আক্ষেপ, ২৩ পাতন, ২৪ উত্থানক, ৫ প্লুতি, ২৬ লঘুতা, ২৭ সৌষ্ঠব, ২৮ শোভা ২৯ শৈথিল্য, ৩০ দৃঢ়মুষ্টিতা, ৩১ তির্য্যক্প্রচার, ৩২ উর্দ্ধপ্রচার ।

কিরূপ কিরূপ ক্রিয়ার উপর এই সকল নাম সংযোজিত হইয়াছে সে সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না । খড়া যুদ্ধের ক্রিয়া গুলি চক্ষে না দেখিলে কেবল নামের দ্বারা উক্ত ক্রিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই । আগ্নেয় ধনুর্কোদেও ৩২ প্রকার খড়া-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে । যথা—

শ্রান্তমুহুশ্রান্তমাবিহ্বমাস্তুতং বিলুতং স্তনম্ ।

সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ শ্যেনপাত মথাকুলম্ ॥

জঙ্ঘনমবধূতঞ্চ সখ্যং দক্ষিণমেব চ ।

অনালচ্ছিতি বিস্ফোটৌ করানেন্দ্র মহারবৌ ॥

বিকরাল নিপাতৌ চ বিমীষণ ভয়ানকৌ ।

সমগ্রার্দ্ধ তৃতীয়াংশ পাদ পাদার্দ্ধ চারিজা ॥

প্রত্যালাভ মথালোড়ং বারাহং লুলিতং নথা ।

দুতি দ্বাত্রিংশতী ত্রয়ো খড়্গ চর্ম বিধৌ হযে ॥

পূর্বেোক্ত নামের মধ্যে কোন কোন নাম ইহাতেও দৃষ্ট হয় । পরন্তু যে সকল নামের ক্রিয়া ও পূর্বেোক্ত নামের ক্রিয়া এক রূপ কি ভিন্ন রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম

না। ফল, খড়া সঞ্চালন ক্রিয়া গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রকৃতরূপে বোধগম্য করান যায় না।

আগ্নেয় ধনুর্বেদের অগ্রস্থানে লিখিত আছে যে, কুপাণের দ্বারা হরণ, ছেদন, ঘাত, বলোদ্ধরণ, আয়তীকরণ, —এই পাঁচ প্রকার কার্য্য হয়। উক্ত ধনুর্বেদে আরও লিখিত আছে যে, অসি রাখিবার স্থান কটিদেশ।

“কট্যাং বদ্ধা নতঃ খড়্গং বাম পার্শ্বাবলম্বিনম্ ।

দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কার্পহৃদ্বিধীন নত ॥”

খড়্গকে বাম পার্শ্বাবলম্বী করিয়া কটিদেশে বন্ধন করিবেক। যুদ্ধের সময় তাহার কোষ বাম হস্তে দৃঢ় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তন্মধ্য হইতে অসিকে নিষ্কাশিত করিবেক। এতদ্ভিন্ন পট্টিশ ও অসিপুত্রিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খড়্গের কার্য্য “আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র” নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবযান ।

মৃত্যুর পর, বা স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, আত্মা কিরূপে কোথায় যায় ? এতৎপ্রসঙ্গে ভারত-বন্ধু সিনেট সাহেব Esoteric Buddhism পুস্তক মধ্যে “দেবচান” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । এই দেবচান শব্দের প্রকৃত অভিধেয় কি ? তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে এবং তাহা কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত তাহাও জানি না । বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনায়, দেবচান শব্দ পাই নাই ; তবে তিব্বৎ দেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐ শব্দ থাকিলেও থাকিতে পারে । যদি আর্য্য-শাস্ত্র হইতে ঐ শব্দ গৃহীত, তবে তাহার প্রকৃত নাম “দেব-যান” । সংস্কৃত ভাষায় দেব যান কি ? তাহা বর্ণন করিতেছি ।

সংস্কৃত ভাষায় যে দেবযান শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি ? তাহা সংক্ষেপে বলিলে মনস্তপ্তি না হইবারই সম্ভব, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া এতৎ বিষয়ক একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে ।

সংস্কৃত ভাষায় কোন্ গ্রন্থে দেবযান শব্দ আছে ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই ঐ শব্দ বিরাজ করিতেছে । বৈদিক আরণ্যক, উপনিষদ ও

মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রত্যেক রহস্যবিজ্ঞান অংশে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় । যথা—

“বেদ্য দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং

পিতৃযানস্য বা যত্কৃতা দেবযানং বা

পন্থানং প্রতিপদন্তি পিতৃযানং বা ।

[আরণ্যকীপনিষদ্ ।

বেদ্য পথীর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য বা আবর্তনা ইতি ।

[ছান্দোগ্যীপনিষদ্ ।

ভারতবর্ষে যখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল, যে সময়ে শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এবং অন্যান্য জন্মসিদ্ধ যোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবযান কি ? তাহা সেই সময়ের মহাত্মারাই জানিতেন । তাঁহাদের আর্ষ-বিজ্ঞানের নিকট কিছুই দুজ্জের ছিল না । মরণের উত্তরকাল, জীবের ভবিষ্যৎগতি, আত্মার নিম্নোক্ত, সমস্তই তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা (ইহার নামান্তর যোগজ প্রজ্ঞা বা দিব্যচক্ষু) দেখিতে পাইতেন । তাঁহারা বলিয়াছেন যে মরণের পর, বা স্কুলদেহ পরিত্যাগের পর, যাহারা উৎকৃষ্ট জীব তাহাদের উর্দ্ধগতি হয় এবং যাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী তাহারা এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের আর উর্দ্ধগতি হয় না, প্রত্যুত ক্রমেই তাহাদের অধোগতি হইতে থাকে । ধর্ম কর্ম পরায়ণ শুদ্ধাত্মগণের উর্দ্ধ লোকে যাইবার

দুইটী পথ আছে । তাহার একটী পথের নাম দেবযান এবং অন্যতর পথের নাম পিতৃযান । যাহারা অত্যন্ত শুদ্ধাশ্রম, তাঁহারা সেই উৎকৃষ্টতম দেবযান পথে গমন করেন ; এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত কিকিৎ মলিন, তাঁহারা পিতৃযানে আরুঢ় হন । দেবযান পথে গতি হইলে আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায় ; কিন্তু পিতৃযান পথে গতি হইলে, ভ্রমে নানাবিধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া অবশেষে পুনর্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জরা ও মরণাদি ভোগ করিতে হয় । যাহারা অত্যন্ত পাপী, অত্যন্ত মলিন, তাহারা এবং যাহারা ক্ষুদ্র প্রাণী তাহারা, উক্ত উভয় পথের কোন পথেই যাইতে সমর্থ হয় না । কেননা তাহাদের উদ্ধ-গতি-শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা এই স্থানেই জন্মিয়া মরণের পর পুনরায় এই স্থানেই বৃক্ষাকুরের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস হয় । অন্য কোন লোকে তাহাদের গতি হয় না । সেই জন্যই ঋষিরা এই পৃথিবীকে দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন স্বতন্ত্র এক স্থান অর্থাৎ তৃতীয় স্থান বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । বেদে (আরণ্যকে ও উপনিষদে) এতৎ-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে, তাহা বলিতেছি ।

অরুণ নামক ঋষির পৌত্র, শ্বেতকেতু নামক জনৈক ঋষি কুমার, পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আপনার বিদ্যা-খ্যাতি বিস্তারার্থ, পঞ্চাল দেশীয় রাজসভায় গমন করিলেন ।

সভাসদগণকে বিদ্যাবাদে পরাভূত করিয়া অবশেষে রাজাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপগামী হইলেন । রাজার নাম প্রবাহন এবং তাঁহার পিতার নাম জীবল । রাজা প্রবাহন ইতিপূর্বে ঋষিকুমারের বিদ্যাগর্ভের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আগমন মাত্রেই কুমারকে “ওহে বালক !” এতদ্রূপে সাবজ্ঞ সন্মোদন করিয়া বলিলেন, “তুমি তোমার পিতার নিকট শিক্ষিত হইয়াছ ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “হঁ। আমি শিক্ষিত হইয়াছি । যদি তোমার কোন জিজ্ঞাস্তা থাকে, ত তাহা বলিতে পার ।” প্রত্যুত্তর শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—

“वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयात्योविप्रति पयन्ता इति ?”

এই সকল প্রজা মরণের পর যেৰূপে যেখানে গমন করে, তাহা তুমি জান ?

“नेति हीवाच ।”

শ্বেতকেতু কহিলেন, “না, তাহা জানি না ।”

“वेत्थ उ यथेमं पुनरा पयन्ता इति ?”

আচ্ছা, যেৰূপ এই লোকে পুনরাগত হয়, তাহা জান ?

“नेति है वी वाच ।”

“वेत्थ उ यथा लोक एवं ब्रह्मभिः

पुनः पुनः प्रयद्भिर्नसम्यूर्यता इति ?”

বার বার বহুজীব জন্মিতেছে, মরিতেছে ; তথাপি সে লোক ও এ লোক পরিপূর্ণ হয় না কেন তাহা জান ?

নেতি হী বাচ ।”

“বেত্থ ভ যতিথ্যাং আভুত্যাং ভুত্যাং

আপঃ পুরুষ বাচীভূত্বা সমুত্থায়ী ভবন্তীতি ?”

আপ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য সকল কতবার আহৃত হইয়া অবশেষে পুরুষাকারে পরিণত হয়, তাহা তুমি জান ?

“নেতি হৈ বী বাচ ।” আমি তাহাও জানি ।

“বেত্থ ভ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতি পদং

পিতৃযানস্য বা যত্চত্বা দেবযানং বা পন্থানং

প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা ?”*

জীব যে-কর্ম করিলে দেবযানপথে বা পিতৃযানপথে গমন করে, তাহা জান ? “নাহ মত একম্ব না বৈদ্বিতি হীবাচ ।” এই পাঁচ প্রশ্নের একটীও জানিনা ।

“অথনু কিং অনুশিষ্টীঃবীচথাঃ

যীহি দুমান্ নবিদ্যাৎ কথং স

অনুশিষ্টীহঃমিত্য ব্রবীত্ ?”

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই প্রশ্নটী অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে । যথা—
“বেত্থপথীর্দেবযানস্য পিতৃযানস্যবা অবর্তনা ইতি ।” অর্থাৎ দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ যে স্থানে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ? একসময়ে দুই ব্যক্তি হইলোক ত্যাগ করিল, পরন্তু গমনকালে

তবে তুমি কি হেতু বলিলে আমি শিক্ষিত হইয়াছি ? যে ব্যক্তি এই সকল কথা জানে না, সে কি প্রকারে বলিতে পারে যে, আমি শিক্ষিত হইয়াছি ?

অতঃপর এতদ্রূপ সতিরস্কার বাক্যে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শ্বেতকেতু পুনর্বার পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি আমাকে কিছুই উপদেশ করেন নাই ; অথচ বলিয়াছিলেন, ‘আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ করিলাম ।’ আমাকে যে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই দুর্বৃত্ত রাজা আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিল আমি তাহার একটিরও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না ।” অনন্তর তাঁহার পিতা বলিলেন “বৎস, এই পাঁচ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আমিও জ্ঞাত নহি । জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই আমি তাহা তোমাকে বলিতাম ।” এই বলিয়া, তিনি সেই প্রবাহণ রাজার নিকট গমন করিলেন । রাজা প্রবাহণ মান্যতম ঋষিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা করিলেন, অনন্তর বলিলেন, “মহর্ষে ! আপনি মনুষ্য ব্যবহার্য্য প্রচুর ধন প্রার্থনা করুন ।” ঋষি বলিলেন “রাজন্ ! তোমার মানুষধন তোমারি থাকুক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই । তুমি যে আমার পুত্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার প্রত্যুত্তর

তাহার একজন দেবযান পথে ও অশ্বজন পিতৃযান পথে যায় কেন তাহা জান ? কোথা হইতেই বা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তাহা জান ?

কি, কেবল তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাহাই তুমি আমাকে উপদেশ কর ।” রাজা এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সুতরাং বলিতেই হইবে । কিন্তু ইহা ন্যায় পূৰ্ব্বক বলা উচিত । ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “তবে এখানে থাকিয়া কিছুকাল প্রস্তুত করুন, তৎপরে বলিব । একাল পর্যন্ত এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই ছিল, ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতেন না । আজ হইতে ইহা ব্রাহ্মণেরা জানিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আপনি অবশ্যই উক্ত বাক্যের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন ।”

অনন্তর রাজা যথোচিত কালে ঋষিকে আহ্বান পূৰ্ব্বক প্রত্যেক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উপদেশ আরম্ভ করিলেন । সেই সকল উপদেশ মধ্য হইতে আমরা কেবল “দেবযান” পথটী সংগ্রহ করিলাম । অন্য গুলি সেই স্থলেই থাকিল ।

রাজা প্রবাহণের মতে, দেবযান আর দেবলোক প্রাপক পথ তুল্য কথা । সেই রূপ পিতৃযান আর পিতৃলোক প্রাপক পথ সমান । দুই পথের মধ্যে দেবযান পথটী বিবৃত করা গেল ।

যেচামী অরুণ্যে স্বদ্বা সত্যমু-

দাসতে তে অর্চিরমিসম্মবন্তি ।

অর্চিষীঃ । অল্ল আপূর্য্যমান

পদ্মম্ । আপূর্য্যমান পদ্মাৎ মাसान্ ।

ষন্মাসাং উদক্ আদিত্য এতি তান্

মাसान্ । তেভ্যো মাতেভ্যো দেব

লোকং । দেবলীকাদাদিত্যম্ ।

আদিত্যাৎ বৈদুগ্ধতম্ । তান্ বৈদুগ্ধ-

নান্ পুরুষোঃমানস* এত্য ব্রহ্ম

লোকান্ গময়তি । তেষু ব্রহ্ম

লোকেষু পরাঃ পরাবতী বসন্তি ।

তেষাং ন পুনরাবৃতিঃ । এষ দেবযানঃ পন্থা ।”

এই শ্রুতির সংক্ষেপার্থ এই যে, যাঁহারা এই শরীরে জ্ঞান উপার্জন করিয়াছেন, যাঁহারা পরিব্রাজক অথবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মরণান্ত পর্য্যন্ত সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনায় রত হন, তাঁহারা এই স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, প্রথমতঃ অর্চি নামক দেবতার অভিমুখে উপস্থিত হন । অর্চি-দেবতা উত্তর মার্গ অর্থাৎ প্রেতাগ্নার উত্তরদিগ্ গমনের পথ বিশেষ । অনন্তর তিনি তথা হইতে অহর্দেবতার নিকট গমন করেন । পরে অহর্দেবতা তাঁহাকে শুক্ল পক্ষাভিমানিনী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন । ক্রমে শুক্ল পক্ষ দেবতা তাঁহাকে বহন করতঃ সূর্য্যের উত্তরায়ণ

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মানসঃ পুরুষঃ এতৎ পরিবর্তে আমনবঃ পুরুষঃ এতদ্রূপ পাঠ আছে ।

গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণের নিকট সমর্পণ করেন। উত্তরা-
য়ণ মাসের সংখ্যানুসারে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
সংখ্যা হয়। অনন্তর তিনি সেই ষণ্মাস দেবতা কর্তৃক
অতিবাহিত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। দেব লোক হইতে
আদিত্য লোক এবং তথা হইতে তিনি বিদ্যুৎ লোকে গমন
করেন। বিদ্যুৎ লোকে গমন বরিলে পর, ব্রহ্মলোকবাসী
অমানব পুরুষেরা আগমন করতঃ তাঁহাকে সেই অক্ষয়
অব্যয় ব্রহ্মলোক লইয়া যায়।* অনন্তর তিনি সেই স্থানে
থাকিয়া ক্রমে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন এবং
অনেক কল্পান্তকাল বাস করেন।

ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক গমনের যেরূপ ক্রম প্রদ-
র্শিত হইল, মৃতাত্মার উন্নতির বা উদ্ধ গমনের সেই ক্রম-পারি-

* ঋষিরা বলেন যে, ব্রহ্মলোকে দুই শ্রেণীর অমানব পুরুষ বাস
করেন। যাহারা জ্ঞান বলে, বিদ্যাবলে, তপশ্চাবলে মাহাত্ম্য লাভ
করিয়া অথায় গমন করেন, তাহারা ভিন্ন অণু এক শ্রেণীর অমানব পুরুষ
আছেন। তাহারা ব্রহ্মার মানস সৃষ্ট এবং নিত্যোদিত মাহাত্ম্য অর্থাৎ
ইহঁারা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য নহেন। তাদৃশ মাহাত্ম্য তাহাদিগের স্বতঃ সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের মতে যাহারা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য, কপিলের মতে তাহারা
সিদ্ধ আত্মা। থিয়োসফিষ্ট ভ্রাতৃগণ বোধ হয় ইহঁাদিগকেই Adept
Brothers বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ লোকে, অভাবপক্ষে
আদিত্য লোকে না যাইতে পারিলে ব্রহ্মলোক বাসী অমানব পুরুষের
সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিম্নবর্তী লোকে থাকিলে অল্পই
সিদ্ধাত্মগণের সহিত ইহলোকের যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভা-
বনা আছে।

পাটের নাম দেবযান । ইহার অন্ত নামও আছে । “অর্চি
মার্গ”, “উত্তর মার্গ”, “উত্তরগতি”, “উত্তরপথ”, “দেবমার্গ”,
ইত্যাদি ।

যাঁহারা কেবল যাগ, যজ্ঞ, দান ও পূজা করেন, যাঁহারা
অধ্যাত্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, যাঁহারা পাপক্ষয়ার্থ কোন তপশ্চর্যা
করেন না, এপথটি তাঁহাদের জন্ত নহে । কোন কানেই
তাঁহারা এ পথে যাইতে পারেন না । তাঁহাদের জন্ত দক্ষিণ
মার্গ অর্থাৎ পিতৃযান পথ নির্দিষ্ট আছে ।

দেবযান পথে বা উত্তরমার্গে আরুঢ় হইলে তাঁহারা আর
এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন না । ইহ সংসারে আর তাঁহা-
দের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । কিন্তু যাঁহারা দক্ষিণ মার্গে
অর্থাৎ পিতৃযান পথে আরোহণ করেন, তাঁহারা ক্রমে চন্দ্রলোক
প্রভৃতি দেবলোক ভোগ করিয়া পুনর্বার এই পৃথিবীতে
আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন । আর আর যাঁহারা কোন প্রকার
সংকল্পের অনুষ্ঠান করেন না, আপনার আধ্যাত্মিক বল বা
ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন না, তাঁহারা উল্লিখিত দুই পথের কোন
পথই দেখিতে পান না । তাঁহারা উক্ত পথদ্বয় ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত
কালের জন্য এই স্থানেই—এই পৃথিবীতেই “লুদ্রান্যমল্লদা-
বর্তীনি ভূতানি ভবন্তি” ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইয়া বার বার জন্মেনও
বার বার মরেন । “য এতৌ দন্যানৌ ন বিদুঃ তে কীড়া দনজ্জা যদিদং
হন্দমুকম্” উক্ত উভয় পথ ভ্রষ্ট জীবেরাই এই পৃথিবীতে কখন

কীট, কখন পতঙ্গ, কখন বা দংশ ও মশকাদি রূপে জন্মিতে-
ছেন। ইহাদের পুনরুদ্ধার দুর্লভ। উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক,
বরং ক্রমে “অনন্দা নাম তে লীকা অন্ধৈ নমস্যা হৃদাঃ” তাহারা
এমন নিম্ন লোকে যাইতে থাকে যে, সে সকল লোকে কিছু
মাত্র আলোক, কিছু মাত্র জ্ঞান, কিছু মাত্র আনন্দ নাই,—
নিরন্তরই সে সকল লোক অন্ধতমসে আবৃত আছে। সেই
সকল পাপী অত্মারা তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, রোরব, মহারোরব,
কাল সূত্র, সঞ্জীবন, অবীচি ও মহাবীচি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নরক
লোকে যাইতে থাকে, কিছুতেই তাহাদের নিস্তার নাই।
অতএব আমাদের, কেবল আমাদের নহে, প্রত্যেক
মনুষ্যেরই সদা সর্বদা সংকল্পে রত থাকা উচিত। এই
দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া যদি আমরা আত্মোৎকর্ষ সাধন
করিতে না পারি, উপাসনাদির দ্বারা আত্মায় উৎকৃষ্ট শক্তি
আরহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই
সেই অনন্দলোক যাইতে হইবে। এই দুর্লভ জন্ম পাইয়া
যদি জন্মোচিত কার্যে পরাভুত থাকি, কেবল পানব পরি-
তৃপ্তির জন্ত ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আর আমাদের
জরা ও মরণাদি যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার
সম্ভাবনা থাকিবেক না।

এই প্রবন্ধ বহরমপুর থিওসফিকেল সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত
হইয়াছিল।

রাজসূর্যযজ্ঞ ।

রাজসূর্য যজ্ঞে সাধারণের অধিকার নাই। ইহা গুণবান ও ধনবান ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। কি প্রকার গুণসপন্ন রাজা এ যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা মহাভারতের সভাপর্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মতে ইহার প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম, ও দক্ষী হোম। অগ্রে পবিত্র নামক সোম-যাগ, পরে অভিষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপয়যাগ ও কেশবপনীয়, তদনন্তর ব্যুষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ।

এই সাতটি যজ্ঞের সমষ্টিই রাজসূর্য। “যী রাজসূর্যন যজতে দ্বেষমৃচীবা এষ যন্ন ক্রতুঃ—” ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে বিবৃত আছে। এতদনুসারে কাत्याয়ন শ্রৌতসূত্রে রাজসূর্যের বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।
যথা —

“বান্ধীরাজসূর্যঃ” (১) অর্থাৎ রাজসূর্য যজ্ঞে রাজারই অধিকার। “অনিষ্টিনীবাজপেয়ন”। (২) তাৎপর্য এই যে, যিনি বাজপেয় নামক যজ্ঞ করেন নাই তিনি এই যজ্ঞের অধিকারী। “দ্বিষ্টিসীমপশুর্বা মিন্নতন্নাঃ কালমৈদ্রাত্”। (৩) আনু-

মতি প্রভৃতি ইষ্টি নামক যাগ, পবিত্র নামক সোম যাগ, পশু যাগ, এই যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিহিত আছে । ইত্যাদি ।

আপস্তম্বসূত্রে ইহার বিস্পষ্ট বিধি আছে । “রাজা স্বর্গ-কামী রাজসূয়েন যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বর্গকামী রাজা রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিবেন ।

অথর্ববেদের বৈতানসূত্র সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৩টি সূত্র দ্বারা ইহার সংক্ষিপ্ত ক্রম নির্ণীত আছে । যথা—

“অথ রাজসূয়ঃ” (১) “নৈঘ্যাঃ পুরস্নাত্ পবিত্রঃ” (২) পৌষী পূর্ণিমার পূর্বে পবিত্র নামক সোমযাগ । “মাসা-ল্লবৈষু দশসংস্থপঃ” (৩) মাসাত্তরে দশসংস্থপ নামক কার্য্য ।— “মাথ্যা অমিষেচনীযঃ” (৪) মাথী পূর্ণিমায় অভিষেচনীয যাগ । “মরুততীয়ার্হস্যস্বেতিঃ” (৫) মরুততীয় নামক কার্য্যের পর বৃহস্পতিসব নামক যাগ । “হবির্ধানযীঃ পুরস্নাদ্বৈয়ান্ন চন্দ্রম্” (৬) হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্রচন্দ্র স্থাপন । ইত্যাদি—

ফলতঃ এই যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদি দ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যুত ক্রীড়া, দিগ্বিজয়, শুনঃশেফীর উপাখ্যান শ্রবণ,* পঞ্চ বিধ সোম যাগ,† প্রভৃতি অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত । সুতরাং ইহা বহুদিন সাধ্য ।

এই উপাখ্যান ঋগ্বেদে আছে । তাহা পুনরায় ব্যাসদেব মহা-ভারতে বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন ।

† পবিত্র, চাতুর্মান্য, দেবিকা, অরতি হোম এবং অভিষেচনীয ।

“পবিত্র” নামক সোমযাগটী ইহার প্রথম অঙ্গ । ইহা বিধানানুসারে সমাপ্ত হইলে “চাতুর্মাস্য” যাগ করিতে হয় । পরে “দেবিকা” নামধেয় ইষ্টির অনুষ্ঠান, তৎপরে “অরত্নি-হোম” নামক হোম করিতে হয় । (এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবে) । তৎপশ্চাৎ “অভি-ষেচনীয়” নামক সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ‡ এই দিবসে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ, এবং বিবিধ তীর্থ হইতে জল আনীত হইয়া, তদ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রপূরিত করা হয় । পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একটি পলাশ কাষ্ঠের, একটি উড়ুন্মর কাষ্ঠের, একটি অশ্বথ কাষ্ঠের এবং একটি বট কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত । এই তীর্থ-জল-পরিপূরিত চারিটা কাষ্ঠ-নির্মিত কলস চাতুর্বর্ণ্য সভার চারি দিকে স্থাপিত করা হয় ।*

‡ এই দিবসে অর্ঘ্য দ্বারা সমাগত রাজগণের সৎকার করা হয় । ইহা “নতীমিষেচনীযিঃক্লি ব্রাহ্মণা রাজমিঃ সহ । নম্রবেদীং প্রবিবি-
শুঃ সন্ত্ কাবাহা মন্বর্ষযঃ ।” ইত্যাদি ক্রমে সভা পর্বীয় অর্ঘ্যাহরণ পর্বের উক্ত হইয়াছে । এই উপলক্ষেই শিশুপাল বধ হইয়াছিল ।

* রাজসূয় সভায় চারি বর্ণেরই আগমন হইত । মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয় এই যজ্ঞে বর্দ্ধিষ্ণু অন্ত্যজ বর্ণেরাও সভা প্রবেশ করিত । যথা—“আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেণ ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ । বিশ্বস্ব-
মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্বাণানযতেতি চ ।” পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাত্মা সহ-
দেবকে অনুমতি করিলেন, তুমি “রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং

সভার মধ্যস্থানে খদির কাষ্ঠের অথবা উডুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, তাহা ব্যাঘ্রচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণ-নির্মিত ফলক বা পীঠ গুপ্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্র-ছিদ্র-যুক্ত এক সুবর্ণ কলস (অভিষেকের নিমিত্ত) স্থাপন করা হইত ।

অনন্তর “ব্রহ্মা” নামক পুরোহিত যজমানকে আগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইতেন । সে সকল মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্বেদের ১ কাণ্ডীয় ৮ প্রপাঠকের ১২ অনুবাকে উক্ত আছে । তাহার একটী মন্ত্র এই—

মাটন মাখন্নাঃ অবস্যীলমসি অবস্য

। । । । ।
যোনিরস্যাবিনী অগ্নির্গৃহদতি রাবিন ইন্দ্রী

। । । । ।
হৃদ্রস্বা আবিনঃ দুশা বিস্ববেদা আবিনী

। । ।
মিত্রাবহুণাহতাহঘাবাবিনে । ইত্যাদি

মা নাই শূদ্র সকলকে আমন্ত্রণ কর এবং আনয়ন কর” ইহা বলিয়া দিলেন এবং দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন ।

ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, অগ্নি যেমন যজ্ঞের দ্বারাই গৃহপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণকীর্তি হইয়াছেন, পুষাদেব যেমন সর্বশিল্পজ্ঞানী, মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় যেমন সত্যসন্ধ, পৃথিবী যেমন ধারণ-শক্তি-সম্পন্ন। এবং অদিতি যেমন সর্বদেবস্বরূপিণী অর্থাৎ সর্বদেব-মাতা হইয়াছেন, সেইরূপ অমুক রাজার পুত্র, অমুক রাজার পৌত্র, অমুক নামা এই যজমান, এই যজ্ঞের দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর মহাধিপত্য ও মাহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং এই রাজ্যের মধ্যে মহাকুলত্ব লাভ করিলেন ।

স্বর সহকারে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, রাজা তাঁহার অভিপ্রের্তার্থ প্রকাশ করত বলিতে থাকেন যে, “যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবত্বয়ঃ স্তুচ্যামি নত্যাং গৰ্ব্বান্ধি ভয়ামীনি বিহন্তু ভবন্তঃ” অর্থাৎ আমি গর্বোক্তি করিতেছি না ; ইহা যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আমি ইহাই আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি ।

যাগপ্রবৃত্ত রাজা এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন,—“মৌ ভারতাঃ অযং বঃ সর্বেষাং রাজা সীমীঃস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ।” হে ভারতবাসিগণ ! ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, সোম (লতা) আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা । ‡

‡ ইহাতে একটি গুঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে । রাজা রাজস্বয়

অনন্তর রাজা দিগ্বিজয়ার্থ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ‡ সমস্ত ঋত্বিক্ একত্রিত হইয়া যজমানের সর্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্বাদ-সূচক বৈদিক কার্যের অনুষ্ঠান করেন । অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, পরে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তৎপরে আশীর্বাদ ও দেবতা-প্রসন্নতা-বোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করেন ।

এই কার্যের পর যজমান পত্নী-সমভিব্যাহারে পূর্বো-ল্লিখিত স্নানপীঠে উপবিষ্ট হন । পরে “অধ্বর্যু” প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ঋত্রিয় প্রভৃতি সভাসদবর্গ একত্রিত হইয়া পূর্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্বক এক সহস্রছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন । এই অভিষেকের কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না ।

অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে বস্ত্র, মাল্য, ও আভরণে ভূষিত হইয়া, যদি শত্রু থাকে তবে

যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রজার উপর আধিপত্য লাভ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্ম-ণেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না এবং তাহাই তাঁহারা কৌশল দ্বারা সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন ।

‡ দিক সকল যদি পূর্ব হইতে বিজিত থাকে তবে এখন কেবল ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করা হয় । অবিজিত থাকিলেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ; যুধিষ্ঠির পূর্বেরই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন ।

তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং যে দিকে তাঁহার শত্রু বাস করে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সসৈন্তে গমন করেন । যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহাকে জয় করিয়া মহাসমারোহে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন । (শত্রু না থাকিলে এই প্রয়াণ কার্য্যটির অনুষ্ঠান হয় না ।)

অনন্তর সভার চতুর্দিকে পঁক্তি ক্রমে মঞ্চ সকল বিগ্ৰহ করা হয় । মধ্যস্থলে এক উন্নত সুবর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয় । রাজা সেই সৌবর্ণ মঞ্চে উপবিষ্ট হন । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উন্নত বিভিন্ন বর্ণেরা যথাযোগ্য নিম্নতন প্রদেশে উপবেশন করেন এবং তাঁহার বিজয় প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন । এই সময়ে দ্যুতক্রীড়া করিবার বিধান আছে । ইহার পণ “অন্ন” ।

এবম্প্রকারের রাজসূয় যজ্ঞটী যেমন পবিত্র নামক সোম যাগ দ্বারা আরম্ভ হয়, সেইরূপ সৌত্রামনী নামক অপর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করা হয় । এই সৌত্রামনী যাগের বিধি ব্যবস্থা কল্পসূত্রে আছে । সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী, সূত্রামা এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা । কাষ্ঠনির্মিত তিনটী “সোম-পাত্র” এবং মৃত্তিকানির্মিত তিনটী “সুরা-পাত্র” ।

পিতৃউদ্দেশে যাগ এবং যাগের পর সুরাপান বিহিত আছে । “সৌর্য্যামণ্যাং সুরাং পিবিতু” এই শ্রুতিবাক্য সফল করি-

বার নিমিত্ত সুরা পান করা হইত, আমোদ উপভোগের নিমিত্ত নহে ।

পূৰ্ব্বকালের রাজারা এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট-উপাধি ধারণ করিতেন । মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ও এবশ্বিধানে সমাপ্ত হইয়াছিল । ইহার অভ্যন্তরে “অৰ্ঘ্যাহরণ” “সমাগত সংকার” “রাজাহনা” প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, বাহ্যিক ভয়ে গ্রথিত করা হইল না ।

অশ্বমেধ ।

রাজসূর্য অপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া
অনুমিত হয় । কারণ, ঋগ্বেদসংহিতা যাহা ভট্টমোক্ষমূলার
দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাজসূর্যের
কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের প্রসঙ্গ আছে । *

বস্তুতঃ আদিম কালে এ সকল যজ্ঞের প্রচার ছিল না, শ্রোত কালেই এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পৌরাণিক কালের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন “তদঃ পরং কৃত্যু ব্রীতায়াং যন্নমুচ্যতে।”

রাজস্বয়ের গ্রায় অশ্বমেধেও রাজা ভিন্ন অন্তের অধিকার
নাই । গুরু যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগগত পাঁচটি
অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে । ১৩ প্র, ১, ৩, ৮ = ১

* “अश्वमेधस्य दानाः सीमा इव आशिरः”

इन्द्राग्नी शतदाव्याश्ववेधे सुवीर्य”

ব্রাহ্মণে “প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজন ।” প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন । “প্রজাপতিরকা মযন অশ্বমেধেন যজীয়মিতি” প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব । “রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ ।” এই যে অশ্বমেধ, ইহা সকল যজ্ঞের রাজা । ইত্যাদি মন্ত্রে, ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎপত্তি, ইতিহাস, ইতিকর্তব্যতা, এবং তাহার ফল প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । এতদনুসারেই অথর্ববেদীয় বৈতান সূত্র রচিত হইয়াছে । শতপথব্রাহ্মণ যেরূপ ক্রমে বলিয়াছেন, বৈতানসূত্রও সেই রূপ ক্রমে লিখিত আছে । যথা—সপ্তমাধ্যায়ে “অথাস্বমেধঃ । ১৪ । ফাল্গুন্যা ব্রহ্মীদনমুদ্রাত চতুর্থ্যমীদহানি । ১৫ । জ্ঞতায়াং প্রাতরাজ্ঞতী ব্রহ্মণে বরম্ । ১৬ । আগ্নেয়ীষ্টিঃ দীপ্ণী চ । ১৭ । বাতরংহা ভবত্যশ্বম্ । নিযুজ্যমানমনুমন্তয়তি । ১৮ । ইত্যাদি ।

কাত্যায়নীয় শ্রৌত সূত্রের বিংশতিতম অধ্যায়েও এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । উপাধ্যায় কর্কাচার্য্য তাহার উত্তমবৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন । “রাজযজ্ঞীঃশ্বমেধঃ সর্বকামস্য ।” এইটাই তাহার প্রথম সূত্র । অত্রকর্কাচার্য্যঃ—রাজশব্দীঃশ্বমেধে কবতি চত্বিধি বর্তন ইত্যুক্তং প্রদেয়ান্নরে । তথাচ চত্বিধয়জ্ঞঃ যদশ্বমেধঃ (১৩, ৪, ১, ২) । তস্মাদ্রষ্টৃপতিরশ্বমেধেন যজীতেনি (১, ৬, ২) । রাজ্যী যজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ ন ব্রাহ্মণবৈশ্যযীরিতি ।

অশ্বমেধ ইতি ত্রিরাত্রম্য যজ্ঞক্রতীর্নামধেয়ম্ । স সৰ্ব্বকামস্য
भवति ।” ইত্যাদি ।

অর্থাৎ রাজ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় । অশ্বমেধ
তাহাদেরই যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে । “অশ্বমেধ” এই
শব্দটী যজ্ঞ বিশেষের নাম, অশ্ব থাকাতে নামের সার্থক্যও
আছে । ইত্যাদি ।

যাহা এই যজ্ঞের প্রধান অংশ তাহাই এস্থলে শতপথ
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় যজুঃসংহিতা, বৈতান সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র
ও জৈমিনীয়াশ্বমেধ, এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম ।
উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে উহার ক্রম-পরিপাটী ও প্রধান
প্রধান দ্রব্য ও দেবতার বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান
করিতেছি ।

এই যজ্ঞের প্রধান পশু অশ্ব । তন্নিম্ন ছাগ প্রভৃতি
অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে ।
যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারদেশে একবিংশতি যূপ উচ্ছিত করা
হয় ।*

এই সকল যূপের মধ্যবর্তী যূপস্তুভে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন
করা হয় । অন্যান্য পশু অন্যান্য যূপে আবদ্ধ করা হয় ।

* কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতায় ১ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকে ৪৫ অনুবাকের ভাষ্যে
লিখিত আছে “একী যূপী বৈকাৎশিনী বা অন্যিষাং যজ্ঞানাং যূপা
भवन्ति । एकविंशिन्यश्वाश्वमेधस्य” ইত্যাদি । অর্থাৎ অন্যান্য যজ্ঞে এক
অথবা একাদশ যূপ আবশ্যক হয় অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ লাগে ।

অনন্তর কএকটী বেদমন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সংস্কার সমাধা করিয়া যথেষ্টা সঞ্চরণের নিমিত্ত তাহাকে মহারাজের আজ্ঞাক্রমে মুক্ত করা হয় । রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র-ধারী বীর রাজকুমারগণ তাহার অনুগমন করেন । যাহারা অশ্বরক্ষক হন, মহারাজা তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল, ও বিবিধ সঙ্কট, স্থান হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে । এ যখন পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবে তখন যদি কোন রাজা ইহাকে নিরুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্বের উদ্ধার করিবে । যে যে ইহার বিরোধী হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিবিধান করিবে । যজ্ঞাশ্বরক্ষা করার ফল আছে, যাও, তোমাদের কুশল হউক ।”

অনন্তর রাজকুমারেরা সকল দিকেই অশ্বকে সঞ্চারিত করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আনয়ন করেন । এই কার্যে অন্যান্য ছয় মাস, অনধিক এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয় । এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, বিঘ্নক্রমে অধিক কাল হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয় । যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ ক্ষত্রিয়চুড়ামণি, তিনিই এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । সুতরাং তাঁহার প্রতাপবলে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে । অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সংজ্ঞপন্থে তাহাকে বধ এবং হোমকার্য্য সমাপ্ত করা হয় ।

জৈমিনীয়াশ্বমেধ গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা
আছে, তাহাও এস্থলে প্রদান করিতেছি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ দক্ষিণা কৌটশী ক্রতীঃ ।
হযস্ব কৌটশী ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যা তুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্যকীর্তিতাঃ ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াঃ ত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে ॥ ৩৯ ॥
একো গজী রথস্বৈকো হযস্বৈকঃ সকাচ্চনঃ ।

প্রত্যেকং গৌসহস্রচ্চ রত্নপ্রস্থং সকাচ্চনম্ ॥ ৪০ ॥

ভারস্ব কাচ্চনস্যৈকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে ।

যস্মিন্ দিনে হযৌ রাজন্ মুচ্যতে প্রথমা হি সা ৪১ ।

দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে ।

গৌচ্চীরসমবর্ণচ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিমম্ ॥ ৪২ ॥

পীতপুচ্ছং শ্যামকর্ণং সর্বতোগতিসুত্তমম্ ।

শ্যামচ্চাপি মচ্চীপাল যজ্ঞে স্মিন্ তুরগং বিদুঃ ॥ ৪৩ ॥

চৈত্র মাসস্য রাকায়াং মৌচ্যৌঃ তুরগো নৃপ ।

বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্বযৌধৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৪৪ ॥

পুত্রৌ বা বান্ধবঃ শূরৌ রক্ষণার্থং নিযুজ্যতে ।

স্বয়ং যঃ কুরুতে যজ্ঞমসিপত্রব্রতং চরেৎ ॥ ৪৫ ॥

নিযতঃ স চ রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

দৃষ্টভোগান্ বর্ষমাচং সেবন্ নারীবির্জিতান্ ॥ ৪৬ ॥

একত্র শয়নং কার্য্য পত্ন্যা সহ নরাধিপ ।

যাবদাগমনং তস্য পুনরেব প্রজাপতে ॥ ৪৭ ॥

নাবত্ প্রযত্বান্ কর্ত্তা নিবসেত্ ধৈর্য্যসংযুতঃ ।

হযঃ পুরীষং মূত্রং বা কুরুতে যত্র যত্র চ ॥ ৪৮ ॥

গৌসহস্রং প্রদেয়ংহি কর্ত্তব্যং হবনং দ্বিজৈঃ ।

পূজনীয়াস্তে তে বিপ্রা দক্ষিণাভির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

ললাটে তুরগস্ত্যাপি পত্রং সংলিখ্য কাঞ্চনম্ ।

বদ্ধা স্তনামসংপুত্ৰং স্বপ্রতাপসমন্বিতম্ ॥ ৫০ ॥

কথনীয়মিদং বাক্যং ময়ায়ং তুরগোত্তমঃ ।

বিমুক্তোঽস্মি নৃপঃ কস্মিন্ প্রতিগৃহ্ণাতু চেত্ বলী ॥ ৫১ ॥

যন্তু তং প্রতিগৃহ্ণাতি স জেতব্যো বলাত্ স্বয়ম্ ।

অনেন বিধিনা বীর ক্রতুরেষ প্রজায়তে ॥ ৫২ ॥

অসিপত্নব্রতযতী বজ্রপুণ্যফলপ্রদঃ ।

এবমেব পুরা শক্রশক্রো হযক্রতীঃ শতম্ ॥ ৫৩ ॥

(ইতি প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥)

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই (অশ্বমেধ) যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কি রূপ দক্ষিণা এবং কি প্রকার অশ্ব আবশ্যক হয়, তাহা বিশেষ করিয়া কীৰ্ত্তন করুন । ৩৮ ।

ব্যাস কহিলেন, এই যজ্ঞে বিংশত্যধিক সহস্র ব্রাহ্মণের কথা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তাহারা সংকুলসন্তৃত, সকলের

মাণ্ড, প্রাক্ত, এবং বেদশাস্ত্রে পারগ। এই যজ্ঞে প্রত্যেকের উদ্দেশে যেরূপ দক্ষিণা বিহিত আছে তাহা বলিতেছি। ৩৯

এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্র গো, (অথবা মূল্য) প্রস্থ-পরিমিত কাঞ্চনাঙ্কিত রত্ন, এবং কেবল সুবর্ণও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। মহারাজ ! যে দিনে অশ্ব ত্যাগ করা হয়, সেই দিনের দক্ষিণা প্রথম দক্ষিণা। ৪১।

হে মহীপাল ! এই যজ্ঞের দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে মনোজ্ঞ অশ্বের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ, কুন্দফুল, কিংবা চন্দ্রশ্মির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ, সর্বপ্রকার ও উত্তম গতিশক্তিসম্পন্ন অশ্ব আবশ্যক হয়। শ্যামবর্ণ অশ্ব হইলেও হানি নাই। ৪৩।

রাজন্ ! চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে অশ্ব মোচন করিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয় সমূহ দ্বারা তাহার রক্ষা করিতে হয়। ৪৪।

পুত্র কি অগ্র কোন শূর বান্ধবকে অশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞকর্তা স্বয়ং “অসিপত্র” ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজেন্দ্র ! সংযত থাকিয়া এই কার্য্য করিবেক, কোন প্রকার বিচারণা করিবেক না। এই এক বৎসর নারী-ভোগ ব্যতীত অন্যান্য অভীষিত বস্তু ভোগ করিতে পারিবেক। ৪৬।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্যন্ত ভোগ বিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবেক । ইহা বড় সহজ ব্রত নহে । (ইহা খড়্গাধারে শয়নের তুল্য বলিয়া অসিপত্র নামে খ্যাত) ৪৭ ।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্যন্ত অতিশয়িত যত্র ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবেক । যে যে স্থানে অশ্ব পুরীষ অথবা মূত্র পরিত্যাগ করিবেক, সেই সেই স্থানে গোদান ও হোম করা কর্তব্য । যাহারা হোম করিবেক, দক্ষিণা দান দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করা কর্তব্য । এ বিষয়ে সংশয় নাই । ৪৮—৪৯ । অশ্বের ললাট প্রদেশে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্ন-যুক্ত কাকন-পত্র বাঁধিয়া দিবেক । এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক যে, “আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান্ রাজা থাকেন, তবে তিনি যেন ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন । ৫০—৫১ । কিন্তু যে ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিবেক, তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে হইবেক । হে বীর ! এইরূপ বিধানেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে । “অসিপত্র” ব্রতযুক্ত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অনন্ত ফল হইয়া থাকে । পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এইরূপ বিধানে শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন । ৫৩ ।

উল্লিখিত বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যজমান মহাসমারোহে জ্ঞান করিয়া থাকেন । এই জ্ঞানের নাম

“অবভৃথ” । সমস্ত মহাযজ্ঞেই এই জ্ঞান বিহিত আছে ।
মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

“শিষ্ট্বা বা ভূমির্দেবানাং নরদেবসমাগমে ।

স্বমেনীঃসমুদ্রী স্নাত্বা হৃদমেধে বিশ্বম্ভৃতি ।”

ঋত্বিক ও যজমান একত্র মিলিত হইয়া যখন অশ্বমেধ
যজ্ঞের অবভৃথ জ্ঞান করেন, তখন অগ্নি পাপীও তৎসঙ্গে
জ্ঞান করিলে (আপনার পাপ খ্যাপন পূর্বক) বিশুদ্ধ হইতে
পারেন ।

প্রাচীন কালের অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ, পরন্তু এতদ্ভিন্ন
ইহার অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে । বাহ্যিক
ভায়ে সে সকল এ স্থলে গ্রথিত করিলাম না ।

পুরুষমেধ-যজ্ঞ ।

ইহা একটা ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার । প্রাচীন কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহা জানি না কিন্তু গুরু যজুর্বেদে * এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় । অনেকে অনুমান করেন নরবলি তান্ত্রিক কাল হইতেই প্রচলিত কিন্তু তাহা নহে ; উহা বৈদিক কালের পুরুষমেধের রূপান্তর মাত্র । কারণ, মাধ্যমিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে ।

যথা—“অথ যস্মাত্ পুরুষমেধী নাম ।

— — — — —
ইমে বৈলীকাঃ পুরুষমেব পুরুষী যীঃ

— — — — —
পবতে সীঃস্যাং পুরিষেতে তস্মাত্ পুরুষ-

— — — — —
স্বস্য যদেপু লীকীচ্চন্নং তদস্যান্নং মেধঃ—”ইত্যাদি—

* আমরা ইহার প্রমাণ আখ্যাসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি ।

(উত্তরভাগের ষষ্ঠাধ্যায় দেখ) । অর্থ এই যে, যে কারণে যজ্ঞের “পুরুষমেধ” নাম, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে । এই লোক পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া “পুরুষ” । এই যিনি বাহিরে পবিত্র করিতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) তিনিই এই পুরি অর্থাৎ শরীরে বাস করিতেছেন । এই হেতু ইহার নাম পুরুষ । এইরূপে ক্রমে “পুরুষ” শব্দের নিরুক্তি, “মেধ” শব্দের নিরুক্তি, যজ্ঞের উপর “পুরুষমেধ” নামের প্রযুক্তি, এবং এতাদৃশ যজ্ঞে কি কি কার্য্য করিতে হইবে সমস্তই এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার শ্রোত সূত্রে এই যজ্ঞের কার্য্যবিভাগ সমস্ত উত্তম রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । যথা—“পুরুষমেধলয়বিংশতিদীক্ষা নিষ্ঠা কামস্য ।” (১) “ব্রাহ্মণ রাজন্যযীঃ” (২) অগ্নিষ্টোমাবন্তরৈণ্যতিরান্ন ভক্ষয়ন্নঃ” । (৩) “নাবন্তীঃগ্নিষ্টোমীয়াঃ” (৪) । (ইত্যাদি এক-বিংশ অধ্যায় দেখ ।)

উল্লিখিত কাত্যায়ন-সূত্র-নিচয়ের দ্বারা পুরুষমেধের এইরূপ সংক্ষেপার্থ সংকলন করা যায় । “সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হইব” এইরূপ কামনা-বিশিষ্ট পুরুষেরা পুরুষমেধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিই এই যজ্ঞের অধিকারী । বৈশ্য ও শূদ্রেরা করিতে পারিবেন না । ইহা এক প্রকার পঞ্চরাত্র যজ্ঞ । ইহার আদ্যন্তে “অগ্নিষ্টোম” যজ্ঞ এবং মধ্যে “অতিরাত্র” যজ্ঞ । এই যজ্ঞের পশু ব্রাহ্মণ

অথবা ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাজক ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পশু, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশুঃ। এই যজ্ঞের দক্ষিণা অশ্বমেধের সমান কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজক হইলে তাহাকে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। পশ্চাৎ অরণ্য প্রবেশ অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অথর্ববেদের বৈতান সূত্রেও এই রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

“পুরুষমেধীঃস্বমেধবন্” (১০) “যজমানস্য বিজিতং সর্বং সমী-
লিতি জনপদমুচ্চৈঃ শ্রাবয়তি (১৩) পুরুষমেধ অশ্বমেধের ধর্ম
ক্রমেই অনুষ্ঠিত হইবেক। যাজকের সমস্তই জয় করা হই-
য়াছে, পুরোহিত ইহা জনপদবাসীকে শ্রবণ করাইবেন।

যাজক যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ পশু, এবং ক্ষত্রিয়
হইলে ক্ষত্রিয় পশু, এবং অলাভ হইলে শত্রু জয় করিয়া
তাহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞ করিবেক। (১৬) তাহাকে
স্নান করাইয়া, অলঙ্কার পরাইয়া, উৎসর্গ করিবেক, এবং

* কাत्याয়ন সূত্রের বৃত্তিকার কৰ্কাচার্য্য একটি শ্রুতি প্রমাণ দিয়া
বলিয়াছেন, যে, পুরুষ পশু বধ করিতে হয় না, পর্য্যগ্নিকৃত করিয়া
উৎসর্গ মাত্র করিতে হয়। যথা—“কপি স্ত্রীলাদিবদুত্শজন্নি ব্রাহ্ম-
ণাদীন” (শ্রুতি) “মিত্তনানুত্শজন্নার্থঃ।” (বৃতি) অর্থাৎ কপিঞ্জল
পক্ষী প্রভৃতির আয় ইহাকে কেবল মাত্র পর্য্যগ্নিকৃত (অগ্নিপ্রদর্শন) করিয়
উৎসর্গ (ত্যাগ) করিবেক।

“সহস্রবাহু পুরুষঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা আমন্ত্রণ করিবেক,
(১৯) ইত্যাদি ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় দেখ) ।

“হরিণীমিঃ শামিন্ত্রে স্থিয়মানম্” “হরিণীমিঃ” ইত্যাদি
ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বধস্থানে লইয়া যাইবেক ।
“স্বীনাঋম্ভে ভব যুথিবী” ইত্যাদিক্রমে ঋক্ মন্ত্র দ্বারা নিপাতন
এবং “মহম্ববাজ্জয়ায় সারস্বতৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞাপ্ত
অর্থাৎ বধ করিবেক ।

এই যজ্ঞের অপর নাম “প্রাজাপত্য ইষ্টি” । এই ভয়ানক
যজ্ঞকাণ্ড বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল ।

রাজাভিষেক পদ্ধতি ।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রাচীন হিন্দু-রাজাদিগের রাজাভিষেক সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায় এবং তাহা কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহা জানিবার জন্ত অনেক-কেই ইচ্ছা সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ তৎ-কালের হিন্দুরাজাদিগের রাজাভিষেক পদ্ধতি জানা না থাকাতে অনেকেই সেই সেই প্রস্তাব পাঠে অতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া আজ আমরা তাঁহাদের সুগোচরার্থ এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বর্তমান হিন্দুরাজগণ এই কার্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা সুন্দররূপে জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, বর্তমান রাজগণের অভিষেক-প্রণালী আমাদের বর্ণনীয় বস্তু নহে। প্রাচীন কালের আর্য্য নরপতিগণ যেরূপে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাই এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবেক।

অভিষেকের বিধি ।

হিন্দুরাজগণের মধ্যে কোন্ সময়ে অভিষেক বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, উক্ত বিধি যজুর্বেদের সময়েই সর্ববাদিসম্মত ও সর্বাস্ত সম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । যজুর্বেদে রাজসূর্য যজ্ঞের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে “স এষ সূর্য্যাবধিক্তী রাজা রাজসূর্য্যেন যজ্ঞত” এইরূপ লিখিত হইয়াছে । অনন্তর যজুর্বেদোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া অথর্ববেদ তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠান পদ্ধতি করিয়াছেন, ইহাও দৃষ্ট হয় । অতএব, রাজাভিষেক প্রথা বা ব্যাপারটি এদেশের বহু পুরাতন । অথর্ববেদে যে অনুষ্ঠান-সূত্র লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণুধর্মোত্তর, দেবীপুরাণ ও অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি তাহাই বিশদ ও বিস্তৃত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রনয়ন করিয়া গিয়াছেন ।

অভিষেকের উপর ব্রাহ্মণগণের কর্তৃত্ব ।

মহাত্মা মনুর সময়ে, রাজ্যাভিষেকের সহিত ধর্ম্মের সংস্রষ্টতা ও ব্রাহ্মণদিগের কর্তৃত্ব ছিল । যথা—

“ব্রাহ্মণ্যে দ্রাষ্ট্রেন সংস্কারং চত্বিধেন যথাবিধি ।

সর্বস্যাস্থ্য যথান্যায়ং কৰ্ত্তব্যং পরিব্রজণম্ ।”

ব্রাহ্মণ সংস্কার—ব্রাহ্মণৈঃ কৃতং অভিষেকম্ ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়কে বিধিবিধানক্রমে অভিষেক (রাজ্যাধিকার দান) করেন, সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই আয়ানুসারে এই সমস্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, অণ্ডে নহে । প্রজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম । এই মনুর বচন দ্বারা জানা গেল যে, পূর্বে ব্রাহ্মণেরাই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তাঁহারাি ক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্যাধিকার দান করিতেন ।

অভিষেকের কাল ।

চৈত্রমাস, মলমাস, ও বর্ষা ঋতুতে অভিষিক্ত হইবেক না । শনি ও মঙ্গল বার ভিন্ন বারে, চতুর্থী, চতুর্দশী ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণা, অশ্বিনী, পুষ্যা ও জ্যেষ্ঠা নামক নক্ষত্রে রাজ্যভিষেক প্রশস্ত । শুক্রাস্তাদি জন্তু কালশুদ্ধিতেও ইহার নিষেধ আছে । এই কালনিয়ামক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন, যে, “মৃত্যে বাহ্নি ন কালস্য নিয়মীঃ ন বিধীয়তে ।” যদি পূর্বরাজার মৃত্যু হওয়ার পর অন্য রাজাকে অভিষেক করা আবশ্যক হয়, তবে সেই অভিষেকব্য রাজা আপাততঃ সামান্য স্নান (তিল সর্ষপাদির দ্বারা) ও জয় ঘোষণা করিয়া অন্য এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিবেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র

অভিষিক্ত হইবেন । আর মূল রাজা যদি জীবিত থাকিয়া কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আর অভিষেকব্য ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না । তিনি একেবারে অভিষেক ও রাজাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

অভিষেকের দ্রব্যাদি ।

মন্ত্রী, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও কতিপয় প্রজা । যজ্ঞীয় বেদী । সুবর্ণ কলশ । চারি বেদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ । পার্শ্বত্য মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, সরোবরের ও হ্রদের মৃত্তিকা, দেবালয় মৃত্তিকা, ইন্দ্রালয় মৃত্তিকা, রাজপ্রাসাদ মৃত্তিকা, সমুদ্রসঙ্গম বা নদীসঙ্গম মৃত্তিকা, নদীকূল মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজবন্ধন স্থান মৃত্তিকা, অশ্ববন্ধন স্থান মৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, রথ চক্র মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন (ভদ্রাসন কি ? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবেক,) সুবর্ণ কলশ, রৌপ্য কলশ, তাম্র কলশ, মৃত্তিকা কলশ, (এই সকল কলশ যথাক্রমে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জল পরিপূরিত থাকিবেক ।) মধু, কুশা, সহস্র ছিদ্র যুক্ত কলশ, সর্বপ্রকার শুগন্ধ, সর্বপ্রকার বীজ, পুষ্প, মালা, ফল, নবরত্ন, নদী-জল, সরোবরজল, কূপজল, চতুর্দিকস্থ চতুঃসমুদ্রের জল,

অভাবে গঙ্গাজল, তদভাবে ব্রাহ্মণেরা যে জল বলিবেন সেই জল, কিংবা যমুনার জল, নির্ঝর জল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারী, নানা প্রকার বাদ্য, সর্কৌষধি ও মহৌষধি, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা, দর্পণ, ঘৃতকুন্ত, উষ্ণীষ, শুভ্র বস্ত্র, নানা প্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম পূজার দ্রব্য, অষ্ট পট, (অষ্ট পট, কি ? তাহা বলা যাইবেক) রূষাদি সপ্ত প্রকার পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ গাভি, তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, তুষ্ণ, দধি, ঘৃত, মোদক, ও মহাদান (অশ্ব হস্তী প্রভৃতি) মঙ্গলদ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়্গ, এবং হোমের দ্রব্য ।

অভিষেকের পদ্ধতি ।

অভিষেচ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা এই সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ প্রজার দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন । অভিষেকের দিন

(১) অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে যে সংক্ষিপ্ত রাজাভিষেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

“ অথ রাজ্যোঃমিধিকবিধিং ব্যাখ্যাস্যামি বিত্ত্বপ্রমত্তীন্ সম্ভার-
সম্ভারান্ সম্ভৃত্য ধীভৃশকলশান্ ধীভৃশবিত্বানি বল্লীকস্য চ মৃচ্চিকাং
সর্বান্ন' সর্বরসান্ সর্ববীজানি ।

অবধারিত হইলে তাহার পূর্বে কোন এক দিবসে পুর-
হিতের দ্বারা “ঐন্দ্রী শান্তি” নামে এক প্রকার শান্তি কার্য্য
আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় । কি রূপে ঐন্দ্রী শান্তি
করিতে হয়, এস্থলে তাহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক বিধায়
লিখিত হইল । (২)

तत्र चत्वारः सौवर्णाश्वलारी राजता श्वत्वारस्ताम्राश्वलारी
मृन्मया स्तान् हृदे सरसि वा ऊर्ध्वस्तुती नामै नाम इत्यु-
दकेन पूरयित्वा वेदीपृष्ठे संस्थाप्य कुम्भे विल्लभेकैकं दद्यात् ।
सर्वान्नं सर्वरसान् सर्वबीजानि च प्रक्षिप्य उभयैरपरাজितै
रायुधैः स्वस्त्ययनैः सौवर्णेषु सम्पातान् संश्राव्यैः संसिक्तीयैश्च राजतेषु
भेषज्यवैरंही मुचैस्ताम्रेषु संवेश संवर्ग्याभ्यां तातीयैः प्राण सूक्तेन च
मृन्मयेषु । ततस्तान् कलशान् गृहीत्वा स्तोत्रियैः पवित्रियैः
रभिष्टुतैः राजान मभिषिञ्चेत् । भूमिमिन्द्रियञ्च वर्द्धय क्षत्रियं मे
इति सिंहासनमारूढमभि मन्त्रयेत् । एवमभिषिक्तस्तु रसान प्राश्नोयात्
द्विजेभ्यश्च दद्यात् गोसहस्रं सदस्येभ्यः कर्त्तुं ग्रामवरं विपुलं यशः
प्राप्नोति भुङ्क्ते धरां जितशत्रुः सदा भवेत् ।”

এই অথর্ব বেদোক্ত পদ্ধতিটী পৌরাণিক পদ্ধতির মধ্যে নিবিষ্ট আছে ;
সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র বঙ্গানুবাদ করিতে হইবেক না । পৌরাণিক পদ্ধতির
অনুবাদ দেখিলেই ইহার অর্থ প্রতীত হইবেক ।

(২) এই ঐন্দ্রী শান্তির বিধি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত
রাজাভিষেক সূত্রে প্রকাশ আছে । সেই দীর্ঘতম সূত্রটী আমরা প্রস্তাব

পুরোহিত অভিষেকের পূর্বে কোন এক শুভ দিনে মাস পক্ষ তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্বক “করিষ্যমাণ রাজ্যাভিষেকাঙ্কমূনাং ঐন্দ্রী শান্নিমহং করিষ্যামি” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গণপতি পূজা ও হোতা আচার্য ব্রহ্মা সদৃশ এই চতুর্বিধ ঋত্বিককে বরণ করিবেন। পরে, “অব্যদস্য ব্যসস্য বিনম্বিষ্যামি মাযয়া । নাম্যামুদৃত্য বেদমথ কৰ্মাণি ক্রমহে ।” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দাত্ত গ্রহণ করিবেন। পরে কতক গুলি কৃশা লইয়া “ঐষঘাত দাতু পর্বম্” এই বলিয়া সে গুলির মূলদেশ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ছেদন করিবেন। অনন্তর “ঐষ্মন্তে ভূমি বর্ষাণি—” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ভূমিকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে বেদী নির্মাণ করিবেন। এই বেদীর মধ্যে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেন। এই বেদীর উপরে অপর এক মহা বেদী প্রস্তুত করিবেন (কিরূপে বেদী নির্মাণ করিতে হয়, তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হই ন না।) এই মহা বেদীব মধ্যে “ঐষ্মন্তে ভূমি বর্ষাণি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠসহকারে একটী গর্ত খনন করিবেন। সেই গর্তটী পুনর্ব্বার মূর্ত্তিকাস্তুর দ্বারা “যন্তে জনং নন্তি আয়ুঃ—” ইত্যাদি

শেষে উদ্ধৃত করিব। অনেক সংস্কৃত কথা একত্র থাকিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রস্তাব পাঠে অসুখ জন্মে বলিয়াই আমরা সংস্কৃতংশ অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করিলাম।

মন্ত্রপাঠ করত প্রপূরিত করিবেক। অনন্তর এই মহাবেদীর উপরে ‘লমম্বা বদনী জনানাং—’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া বালুকা বিস্তৃত করিবেক। ইহাতেও কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এবং প্রথম বেদীর মন্ত্র পাঠ পূর্বক রেখা রচনাও করিবেক। (ইহার প্রত্যেক ক্রিয়াই মন্ত্র পাঠ পূর্বক করিতে হয়। সে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব কর্কশ হইবে। নিম্নয়োজনে প্রস্তাব বাহুল্য ও কর্কশ করা অন্তায় বোধে সে সকল নিঃশেষরূপে উল্লিখিত হইল না এবং মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্র লিখিত হইল।) রেখারচনা ও তাহার সংস্কার কার্য সমাপ্ত হইলে তাহাতে শরৎপক্ষ ধাতু ও যব ছড়াইয়া দিবেক। অনন্তর “বৈশ্ণব ভূমিঃ পৃথিবী হৃদা—” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক জল প্রক্ষেপ করিবেক এবং “যস্যামন্নং ব্রীহিযবং যস্যাহুমাঃ শস্যং কৃষ্ণযঃ। ভূমিঃ পর্জন্যপত্নী নমোঽস্তু, বর্ষমেধম্” এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবেক। অনন্তর “লামগ্নী মৃগবী নিষন্তাং—” ইত্যাদিমন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি আনয়ন করিবেক। কাষ্ঠ-মন্ডন-জাত অগ্নি উত্তম; অসম্ভাব হইলে অনিষিক্ত অগ্নিই গ্রহণ করিবেক। সেই অগ্নি কাংস্যাদি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্র-পাঠ পূর্বক ব্রীহি ও যব প্রক্ষেপ করিবেক। অনন্তর সেই অগ্নি মন্ত্র পাঠ সহকারে বেদীতে স্থাপন করিবেক। অগ্নি যথাবিধি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহাতে “মমাম্নী-

ঈর্ষ্য:—” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিবেক।
 ভবিষ্যৎ রাজা এই সময়ে সেই প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে “ব্রত-
 পতি ন্না—” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী সমিধ হোম
 করিবেন। পরে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ঈশান কোণে একটী সুবর্ণ-
 নির্মিত কিংবা রজতনির্মিত অথবা তাম্রনির্মিত জলপূর্ণ কলস
 স্থাপন করিয়া তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্কোষধি, দুর্বা, পঞ্চ পল্লব,
 পঞ্চ ত্বক, পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত, সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা, ফল, পঞ্চ-
 রত্ন, এক খণ্ড সুবর্ণ ও যুগ্ম বস্ত্রের দ্বারা অধিত করিবেন।
 এই সজ্জিত কলসটী যবপুষ্পের কিংবা তণ্ডুলপুষ্পের উপরে
 স্থাপন করিতে হইবেক। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্বভাগে
 গোচর্মপরিমিত স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে এক
 অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পঞ্চ বর্ণ গুণ্ডিকার দ্বারা
 এক অষ্টদল পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্য ভাগে সুবর্ণনির্মিত
 ইন্দ্র প্রতিমা স্থাপন পূর্বক তাঁহাকে রাজার গায় উপচার
 সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অর্পণ করিবেক। এস্থলে উপচার
 শব্দের অর্থ পাদোদক, আসন, স্নানজল, মধুপর্ক, কুণ্ডল ও
 অগ্ন্যন্ত্র অলঙ্কার, ছত্র, চামর, ধ্বজ ও পতাকা প্রভৃতি।
 (এই সকল উপচার বা দানীয় দ্রব্যের দানের এক একটী
 স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা উল্লেখ করিবার কোন বিশিষ্ট
 ফল দেখা যায় না। ক্রম জানিবার জন্ত লোকের কিঞ্চিৎ
 কুতূহল দেখা যায় বলিয়াই অভিষেকের ক্রমমাত্র দেখান

হইতেছে)। পূজা সমাপ্ত হইলে পর যজমান সমিধ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চাহতি প্রদান করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম স্থাপনের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে “ঋষীনাং প্রসারীঃসি—” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এক খানি আসন প্রদান, পরে “অস্মিন কৰ্ম্মণি ত্বং ভূমতি ভুবনমতি—” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তদুপরি পূর্ববৃত্ত ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবেন। অনন্তর ব্রহ্মা “অহং ভূমতিরহং ভুবনমতিঃ—” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন।

ইহার পর হোতা (যিনি হোম কার্যে ব্রতী হই-
ছেন তিনি) এক মুষ্টি কুশা লইয়া, তাহা অগ্নিকুণ্ডের
চতুর্দিকে পাতিত করিবেন। ব্রহ্মাও সেই আন্তর্য কালে
“ইবম্য লা—” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে কুশা-
স্তরণ, তাহার সংস্কার, জল প্রসেক ও পর্য্যগ্নিকরণ প্রভৃতি
কার্য্য সকল শেষ হইলে, যজ্ঞীয় পাত্র সকল মন্ত্র পাঠ
পূর্বক জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইবেন।
পরে আহতি দান আরম্ভ করিবেন। আহতি দানের
নাম হোম, তাহা এস্থলে অনেক প্রকার। প্রথম সপ্তা-
হতি। এই সপ্তাহতির ৭টি ঋক মন্ত্র আছে। পরে
উত্তর পূর্বার্দ্ধ, তৎপশ্চাৎ দক্ষিণ পূর্বার্দ্ধ হোম। তাহার
পর অভ্যাতান নামক হোম। ইহাতে ১৭টি আহতি
অতরাং ১৭টি মন্ত্র। ইহার পর উত্তরাঙ্গ হোম। ইহাতে

৫টী আহুতি ও পাঁচটী মন্ত্র । পরে সমৃদ্ধি হোম । সমৃদ্ধি হোমের পর সন্নতি হোম । সন্নতি হোমে ৪ আহুতি ও ৪ মন্ত্র । পরে স্থিষ্টিকৃৎ হোম । ইহাতে ১ আহুতি ও একটী মন্ত্র । তৎপরে একাদশ মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম । অনন্তর স্মৃতি হোম । স্মৃতি হোমে পাঁছ আহুতি । পরে সংস্থিতি হোমে ৭ আহুতি । পরে স্বাহুতিকে সমান হোম বলে । (এই সকল আহুতি দানের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে—তাহা কশ্মিন্ কালেও কাহারও আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া লিখিত হইল না) ।

আহুতি দান সমাপ্ত হইলে, হোতা সেই সকল পূর্বা-
স্তুত কুশা সকল উঠাইয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে (মন্ত্র পাঠ
পূর্বক) নিক্ষেপ করিবেন । ইহার নাম বহিহোম ।
পরে অবশিষ্ট ঘৃতাদি দ্রব্যও বহিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক
নিক্ষেপ করিবেন । ইহার নাম সংশ্রব হোম । পরে ঋব
অর্থাৎ আহুতি দানের পাত্র ইন্দ্র প্রতিমা সন্নিধানে স্থাপন
করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রের পূজা করিবেন । পূজান্তে ইন্দ্রের ও
তাঁহার পরিবার বর্গের উদ্দেশে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া
এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন । “মী হুন্দ্র ! দিষ্ণং বচ্চ বলি মচ্চ
রজমানস্য আযুচ্চান্ । চৈমকর্তা শ্যান্তিকর্তা भव ।” ইহার পর
দশটী মন্ত্রের দ্বারা দশ দিকে দশ দিক্ পতির উদ্দেশে
বলি নিবেদন করিবেন । পরে ক্ষেত্রপালের উদ্দেশে মহাবলি

প্রদান করিবেক । তাহার মন্ত্র এইরূপ—“ঈশ্বরিয়া তয়া
 ঈশ্বরস্য পতিমা ঈশ্বরদালায় ভূতপ্রেতপিশাচরাহস্যশাকিনীভাকিনী
 বৈতালাদি পরিবার যুনায নমঃ ।” মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা বলি
 প্রদত্ত হইবা মাত্র তাহা শূদ্র কি দুব্রীক্ষিণের দ্বারা চতুষ্পাথে
 কি তৎসদৃশ অন্য কোন স্থানে স্থাপিত করিবেক । অবশেষে
 শুচি হইয়া ঐন্দ্রী শান্তির পূর্ণতা সিদ্ধির জন্ত পূর্ণাহুতি দান
 করিবেক । পূর্ণাহুতির দ্রব্য—আজ্য, বস্ত্রবেষ্টিত ও চন্দন
 ব্রক্ষিত নারিকেল ফল । পূর্ণহোমের পর পুনর্বার সমিধ
 হোম । পরে মূখমার্জনাди কতিপয় ও সূর্য্যদর্শনাদি কতিপয়
 ক্রিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পরে অগ্নি বিস-
 র্জ্জন, ব্রহ্ম উত্থাপন, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, নমস্কার ও দক্ষিণা দান
 করিবেক ।

এইরূপে শান্তিকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা পত্নীসমভি-
 ব্যাহারে উপবিষ্ট হইবেন, এবং কুটুম্বমণ্ডল তাঁহাকে বেষ্টিত
 করিয়া বসিবেন । তৎপ্রকারে উপবিষ্ট রাজাকে পুরোহিতগণ
 শান্তিকলসস্থ জলের দ্বারা অভিষেক, পরে আশীর্বাদ করি-
 বেন । অভিষেকের মন্ত্র অনেক, সুতরাং তাহা না লিখিয়া,
 কয়েকটি সংক্ষেপ প্রতীক মাত্রের উল্লেখ করিতেছি । “পবিত্র
 হনুঘারং” “প্রযত্নে দাদী লক্ষ্মীঃ ” ইত্যাদি ৪টি মন্ত্র এবং
 হিরণ্যবর্ণাঃ ” ইত্যাদি ১৬টি মন্ত্র ।

এই অভিষেকের পর রাজা সর্ব্বৌষধি লিপ্তাঙ্গে পবিত্র

জলে স্নান করিবেন, শুভ বস্ত্র ও শুভ মাল্যাদি পরিধান পূর্বক সপত্নীক হইয়া আচার্য্য ও পুরোহিতদিগকে নমস্কার করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ দান দ্বারা পূজা করিবেন । দশ গাভি ও ততোধিক বৃষ, লাঙ্গল, অশ্ব, গ্রাম বা ভূমি, এই সকল দক্ষিণা দেয় বলিয়া বিহিত আছে । অবশেষে ১১ একাদশ সবৎসা ধেনু কোন স্ত্রীকণকে দান করিবার উপদেশ আছে । হস্তী, অশ্ব, ও বিবিধ রত্ন দানের বিধিও দৃষ্ট হয় । এই রূপে ঐন্দ্রী শান্তি সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত দিনে রাজাভিষেকের অনুষ্ঠান করিবেন । সেই কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতে চলিল ।

* পুরোহিত ও অভিষেক্য রাজা পূর্ব দিনে উপবাসী থাকিয়া অভিষেক দিনের প্রাতে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া করণান্তে অভিষেক মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন । শুভ বস্ত্র ও শুভ মাল্যাদি বিভূষিত ও কুশহস্ত রাজা পূর্বাভিমুখে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কারান্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া মাস পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্বক “সকল বায়ু বহ্যনা কামঃ অহং সাম্বত্সর পুরীহিতাম্যা সাম্যান

* এই প্রারম্ভের পূর্বে দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত, অভিষেক্য রাজার “বায়ুঋয় রাজা” এই বলিয়া জয় ঘোষণা সভামধ্যে ও সর্বত্র করিবেন । ইহার প্রমাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে “ঘীষয়িত্বা জয়ং দ্বাস্য সাম্বত্সর পুরীহিতাী ।” ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইয়াছে ।

মমিষেচযিচ্ছী’ এইরূপ সংস্কল্প করিয়া গণেশ পূজা, স্বস্তিবাচন, মাতৃকা পূজাদি আভ্যুদয়িকান্ত কার্য সমাধা করিলে, সান্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা গণক পুরহিত, তিন জন ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অমাত্য, এক জন সামবেদী ব্রাহ্মণ অমাত্য, কি যে কোন দেববেত্তা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ও অমাত্যকে বরণ করিবেন। সেই ব্রতীদিগকে মধুপর্ক, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ প্রদান পূর্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সমীপে দান মানাদির দ্বারা সৎকার করিয়া নিকটে বসাইবেন। পরে পুরোহিত শুভ বস্ত্রাবৃত ও শুভ মাল্যাদি ভূষিত মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্বক হোম স্থানে উপস্থিত হইয়া হোমের আয়োজনাদি করিবেন। হোমকুণ্ডের উত্তরে কদলী-বৃক্ষের তোরণ ও স্তম্ভদ্বারবিভূষিত স্নান শালার মধ্যে কি যবপুঞ্জের উপর ৯টা কলশ স্থাপন করিয়া তাহা তীর্থজলাদির দ্বারা প্রপূরিত করিবেন। সেই সকল কলশে সর্কৌষধি, সর্ব গন্ধ, সর্ব রস, সর্ব প্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণী লতার পল্লব নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর তাহা শুভ বস্ত্র ও খেত মাল্যের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। সেই নব কলসের সমীপে একটি পঞ্চগব্যযুক্ত জল-পরিপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, একটি ঘৃতপূর্ণ স্তব্ধ কলস, একটি দুগ্ধ পূর্ণ রৌপ্য কলস, একটি দধি পূর্ণ তাম্র কলস এবং মধুপূর্ণ

মৃত্তিকা কলস স্থাপন করিবেন। তৎপাশ্বে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, শতছিদ্রযুক্ত সুবর্ণ কলস, নদীজলপূর্ণ সরোবর জলপূর্ণ, কূপজলপূর্ণ ও চতুঃসমুদ্রোদকপূর্ণ কলস সকল স্থাপন করিবেন। এই সকল কলসের পরিমাণ উচ্চ ১৬ অঙ্গুল এবং ৫২ অঙ্গুল সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত হয়, এইরূপ সূত্র হওয়া আবশ্যিক।

এই সকল দ্রব্যসম্ভার অয়োজিত হইলে পুরোহিত আথর্বণ গৃহোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহ্নিস্থাপন করিবেন। পরে পূর্বোক্ত ঐন্দ্রী শান্তি প্রকরণোক্ত সপ্তদশ আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর শর্ম্মগণ, বর্ম্মগণ, স্বস্ত্যয়নাযুযা, অভয়া, অপরাজিতা, এতন্নামধেয় মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন (এই পঞ্চগণ মন্ত্রগুলি আথর্বণ গৃহ পরিশিষ্টে উক্ত আছে, নিম্নয়োজন বিধায় সে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম না) হোমকুণ্ডের নিকট যে কলস স্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যেক আহুতির উৎশিষ্ট ভাগ সেই সকল কলসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোহিত এবম্প্রকারে হোম করিবেন, রাজা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট হইয়া সেই হুয়মান অগ্নির সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ দেখিতে থাকিবেন। অগ্নির আবার সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ কি? যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, এজন্য তাহার দুই একটি কথা বলিতেছি,

তদ্বারা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাসের গতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন ।

‘‘प्रसन्नार्चिर्महाज्वालः स्फुल्लिङ्गरहितोहि सः ।

स्वाहावसाने ज्वलनः स्वयं देवमुखं हविः ।

যদা ভুঙ্ক্ते মহাভাগ ! তদারাগ্নীহিতং বদেৎ । ইত্যাদি ।

হুয়মান অগ্নির যদি কোন তুলন্য দৃষ্ট হয় তবে তৎসূচক অনিষ্টনাশের জন্য অন্য এক স্বতন্ত্র শান্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবেক ।

প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে ঐন্দ্রী শান্তিতে যে সকল হোমের উপদেশ আছে, সেই সকল হোমেরও অনুষ্ঠান করিবেন । হোম সমাপ্ত হইলে পর রাজা স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্বকল্পিত স্নানশালায় গমন করিবেন, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন । পুরোহিত প্রথমে সেই রাজার মস্তকে “মহম্ম শীর্ষা—” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পর্বত মৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণপ্রদেশে বগ্নীকমৃত্তিকা, ক্রমে গ্রীবা, হৃদয়, হস্তদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, পাশ্ব, কটি, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জংঘাদ্বয়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষে সেই সকল পূর্বাহত মৃত্তিকা মন্ত্রপুত করিয়া লেপন করাইবেন ।

এইরূপে মৃত্তিকাস্নান সমাপ্ত হইলে সেই পূর্ব-স্থাপিত কলসস্থ পঞ্চগব্য-মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নান করাইবেন ।

(ইহার মন্ত্র ৬টী কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা গেল) অনন্তর রাজা সে আসন পরিত্যাগ করিয়া পূর্বনিশ্চিত ভদ্রাসনে উপ-
বিষ্ট হইবেন। এই ভদ্রাসন স্তূর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা
তাম্র কিংবা ক্ষীরী কাষ্ঠের দ্বারা নিশ্চিত হয়। মাণ্ডলিক
হইলে ভদ্রাসনটীর উচ্চতা একহস্ত এবং বিস্তারেও এক
হস্ত। রাজা হইলে তাহা সপাদ হস্ত এবং মহারাজা
হইলে তাহা সার্ক হস্ত পরিমাণে নিশ্চিত হইয়া থাকে। (*)

অভিষেক্য রাজা ভদ্রাসনে বসিলে, পুরোহিত, পূর্ব-
দিকে দাঁড়াইয়া পূর্বস্থাপিত সেই ঘতকুন্তের দ্বারা তাঁহার
দক্ষিণ ভাগে দাঁড়াইয়া অভিষেক করিবেন। পরে ক্ষত্রিয়
জাতীয় অমাত্য সেই পূর্বসংস্থাপিত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কল-
শের দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন। অনন্তর বৈশ্যামাত্য
পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া সেই দধিপূর্ণ তাম্রকলশের দ্বারা
স্নান করাইবেন। পরে সামবেদী অমাত্য উত্তর দিকে
অবস্থিতি করিয়া সেই মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলশের দ্বারা অভি-
ষেক করিবেন এবং তিনিই সেই কুশোদকপূর্ণ মৃৎকুন্তের

* ভদ্রাসন নির্মাণের বিধি দেবীপুরাণে বিশদরূপে লিখিত আছে।

হৈমস্ব রাজতং নাম্ দ্বীপীষ্মমযস্ব বা ।

ভদ্রাসনস্ব কৰ্ণাখ্য সার্কহস্তসমুচ্ছিতম্ ॥

সপাদহস্তমানস্ব রাজা মাণ্ডলিকান্নরাত্ ।” ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন বরাহসংহিতাগ্রন্থেও ইহার নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। ইহাদের জন্ত ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ আছে, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

অতঃপর পুরোহিত সদশুদিগকে “অগ্নিরদ্ধাথ্যে যুযং অগ্নিঁ দরি রদ্ধধ্বম্” এইরূপে নিযুক্ত করিয়া হোমকালে যাহাতে আহুতির উচ্ছিষ্ট নিষ্ক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই সুবর্ণকলশ লইয়া রাজসূয় যজ্ঞোক্ত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অভিষেক করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে সকল মন্ত্র ঋক ও যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহা অনেকগুলি ; সুতরাং তাহার সকল না লিখিয়া দুই একটা মন্ত্র এস্থলে প্রদর্শনার্থ লিখিত হইল।

“সীমস্য ত্বা দুন্ননাভিষিদ্ধামি অগ্নির্ভাজসা সূর্যস্য বর্চসা ইন্দ্রস্বেন্দ্রিয়েন চত্রাণা চত্রপতি রেধ্যতি হি দুর্ম্যাহিঁসীঃ । ইমং দেবা অসপত্রং সুবধ্বং মহতে চত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজায় ইন্দ্রস্বেন্দ্রিয়ায় ইমং অমুঘ্যপুত্রং অমুঘ্যৈ পুত্রমস্মৈ বিশ্নু এষ বহীধী-রাজা সীমীঃস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ।” ইत्याদি ।

অনন্তর পুরোহিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গমন করিবেন। অন্য কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তখন সেই ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শতছিদ্র কুন্তে জলনিষ্ক্ষেপ পূর্বক তদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত করিয়া সর্কৌষধি, গন্ধোদক, বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ন, ও কুশ সংসৃষ্ট জলের দ্বারা অভি-

ষেক করিবেন । কোন কোন পুরোহিতেরা বলেন, যে, এই সময়ে কুশ, দুর্বা ও পল্লবের দ্বারা সেই অভিষিক্ত রাজদেহ মার্জনা করা কর্তব্য । অনন্তর কেবল এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনায়ুক্ত গন্ধের দ্বারা রাজার মস্তক ও কণ্ঠ বিলিপ্ত করিবেন । এই সময়ে নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শঙ্কর জাতীয় প্রজাগণ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর জল, সরোবর জল, কূপজল, চতুঃ-সমুদ্রের জল ও নির্ঝর জল (যিনি যাহা প্রাপ্ত হন তিনি তদ্বারা) কলসে লইয়া অভিষেক করিবেন । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, শূদ্র ও শঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিরা মন্ত্র পাঠ করিবেন না । এই সময়েই প্রধান অমাত্যেরা তাঁহার সমীপে রাজছত্র, চামর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাঁড়াইবেন । বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করিবেন । বৈদিকেরা বেদগান ও স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ করিবেন । যাহারা উপায়ন আনিয়াছেন তাঁহারা এই সময়ে তাহা অর্পণ করিবেন । এই উৎসব সমাধা হইলে পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুন্তের অবশিষ্ট জল এক সুবর্ণ কুন্তে রক্ষা করিয়া কুশমুষ্টির দ্বারা তাহা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজার শিরঃপ্রদেশে অভিনিষ্কেপ করিবেন এবং “সুর্যাস্ত্রামমিষিষ্বন্তু” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । এই শেষ অভিষেক মন্ত্রের সংখ্যা ১৮০ । সেই ১৮০টি মন্ত্র লিখিয়া প্রস্তাব রুদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই ।

দৈবজ্ঞের অভিষেক শেষ হইলে রাজা স্নগন্ধি তৈল ও স্নগন্ধ উদ্বর্তন ব্রক্ষণ করিয়া স্নপরিষ্কার জলে স্নান করিয়া মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনুর্বাণ কি কোন উত্তমাস্ত্র ধারণ পূর্বক আদর্শে ও ঘৃতপাত্রে আত্মপ্রতিবিন্দু দর্শন করিবেন। ঘৃতপাত্র সূবর্ণ দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া চন্দন, কুঙ্কুম, দধি, দুর্বা ও অন্যান্য মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। পরে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করিবেন।

এই অবকাশে দৈবজ্ঞ, রাজার ললাটোপরি পট্ট ও মুকুট পরাইবেন। * অনন্তর পট্ট ও মুকুটধারী রাজাকে

* পট্ট কি ? তাহা বলা যাইতেছে। দেবীপুরাণে সামান্যতঃ পট্ট লক্ষণ উক্ত হইয়াছে কিন্তু বিশ্বকর্মা তাহার নির্মাণ পদ্ধতি অতি বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই, ৮, ১৫, ২২, ২৯ কিংবা ২৬ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ, দীর্ঘের অর্দ্ধ পরিমাণ মধ্য ভাগের বিস্তার এবং দুই প্রান্তভাগের বিস্তার তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ একটী সূবর্ণ পত্র ;—ইহা বৃত্তাকার অথবা চতুরস্র অর্থাৎ চৌকোষ রূপে নির্মিত। ইহার মধ্যে বা গর্ভভাগে ৩ টী কৃত্রিম পদ্ম ; তৎসংস্রবে বা তৎপার্শ্বে শ্রীবৎস, শিব, কি গণেশ, বৃষভ বা বরাহেভ অর্থাৎ বৃষদেহ ও হস্তিমুখ কিংবা বরাহদেহ ও গজমুখ ও স্বস্তিকাদি চিহ্ন সকল অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার রূপে শিল্পীর দ্বারা খোদিত করিবেক। এই পট্টের ৫ টী শিখর, যুবরাজের হইলে ৩ টী শিখর, রাজমহিষীর জন্ত হইলে শিখরাকারে গঠন করিবেক। বিশ্বকর্মা বলেন, পট্ট কিংবা ভূষণে ব্যাঘ্র সর্প হস্তী সিংহ অথ উষ্ট্র মহিষ বৃষ চিহ্ন খোদিত করিবেক না। এবং কুমিকীট পতঙ্গাদি চিহ্নও খোদিত

শুভ লগ্নে মঞ্চোপরি অথবা রাজাসনোপরি উপবিষ্ট করাইবেন। সেই রাজাসন বা মঞ্চটা উপর্যুপরি চন্দ্র ও বস্ত্রের দ্বারা অচ্ছাদিত থাকিবেক অর্থাৎ মঞ্চের উপর প্রথমে বৃষচন্দ্র পাতিবেক, তদুপরি মার্জ্জার চন্দ্র, তদুপরি তরঙ্গু চন্দ্র, তদুপরি সিংহচন্দ্র, তাহার উপর ব্যাঘ্র চন্দ্র, তাহার উপর বহুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিবেক। রাজা এতদ্রূপ মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে দ্বারপাল যথাক্রমে অমাত্য, পুরবাসী, বণিক ও প্রজাদিগকে রাজদর্শন করাইবেক। তাঁহারা রিক্ত হস্তে রাজদর্শন করিবেন না, সকলেই কিছু না কিছু উপঢৌকন দান করিবেন। অনন্তর রাজা, পূর্বোক্ত দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও অগ্ন্যগ্নি বেদ বেত্তা ও জ্যোতির্বেত্তাদিগকেও গ্রাম, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, গো, অজ, মেঘ ও গৃহদান দ্বারা সম্মানিত করিবেন এবং

করিবেক না। পট অষ্টাপদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত হয় বলিয়া অষ্টাপদ পট এবং পদ্ম, শ্রীবৎস, মৎস্য, স্বস্তিক বিনায়ক প্রভৃতি পৃথক পৃথক আট প্রকার চিত্রান্বিত পৃথক আট প্রকারের গঠন হয় বলিয়া অষ্টপট নাম দেওয়া হইয়া থাকে। অথবা আট প্রকারের চিত্র থাকে বলিয়া অষ্টপট নাম। প্রথমোক্ত মতের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, প্রথম মতে আট প্রকারের যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার পট গ্রহণ করিবেক। কেহ বলেন তাহা নহে, একাধারেই উক্ত আট প্রকার চিত্র খোদিত করিবেক। এই পটের প্রতিনিধি পটিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পট। এই পটিকা হইতেই টীকা ও রাজটীকা নাম উঠিয়াছে। সংস্কৃত বচন গুলি অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

মোদকাদি বিবিধ দ্রব্য ভোজন করাইবেন। অন্যান্য
 ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে গাভি,
 বস্ত্র, তিল, রৌপ্যমুদ্রা, বিবিধ অন্ন, ফল, সুবর্ণ, পুষ্প ও
 ভূমিদান করিবেন। পরে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্বক
 ধনুর্বাণহস্তে সেই যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। গুরু
 প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়া এক মহাবৃষ ও সবৎসা
 গাভী সম্মুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন।
 এই সময়ে পুরোহিত এক সর্বমূলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব
 ও এক মহা হস্তী আনয়ন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক
 সর্কৌষধি কলসস্থ জলের দ্বারা সেই দুইটাকেও অভি-
 ষেক করিবেন। মন্ত্র গুলি অশ্বশান্তি ও ছাগশান্তি পদ্ধতি
 হইতে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র গুলি শুনিতে মন্দ নহে,
 পরন্তু তাহা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পুরো-
 হিত অশ্ব ও হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করিলে রাজা অশ্বের
 পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া অবশেষে সেই অভিমন্ত্রিত হস্তীতে
 আরোহণ করিবেন। (ইহারই নাম রাজহস্তী) প্রধান
 অমাত্য ও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা অত্র হস্তীতে আরুঢ়
 হইবেন। সকলে একত্রিত হইয়া রাজপথে অবতীর্ণ হই-
 বেন। এবং কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ করিয়া দেবালয়
 সকলে গমন পূর্বক তথায় তাঁহাদিগকে পূজা ও দেবদ্র
 দান করিবেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া পুরপ্রবেশ

করিবেন । ভকণকালে ও পুরপ্রবেশ কালে তাঁহাদের অগ্রে বাদ্য ও চতুরঙ্গ সেনা অবস্থিত থাকিবেক । শিল্প প্রদর্শন ও অন্যান্য নাগরিক আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত থাকিবেক । নবাভিষিক্ত রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, দান, ও যথোচিত সংকার করিবেন । দীন, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ পশু খণ্ড কুজ ও বামনাদি দুর্গতদিগকে যথাশক্তি দান করিবেন । দান মান সংকারাদির দ্বারা সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে সুহৃদগণের সহিত ছুটি চিত্তে ভোজন করিবেন । রাত্রিকাল রাজমহিষীর সহিত একান্তে অতিবাহিত করিবেন । পূর্বরাজার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকে তবে তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবেন । ইহাও একটা তৎকালের কর্তব্য । কেহ বলেন যে, এই কার্য অভিষেক আরম্ভের পূর্বেই করিতে হয় ।

এতদূরে রাজাভিষেক-পদ্ধতি সমাপ্ত হইল । মনে যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, এই পদ্ধতিটি যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে লিখিত হইল কি না, তাহা আমরা জানি না । অতএব তাদৃশ সংশয়িত ব্যক্তির সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত আমরা ইহার প্রমাণসূত্রটি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম ।

“इति सम्भृतं सम्भारो राज्ञः साम्बत्सरः शुभः ।
 कालेऽभिषेचनं कुर्यात् तं कालं कथयामि ते ॥
 मृते राज्ञि न कालस्य नियमोऽत्र विधीयते ।
 तत्वाख्यं सपनं कार्यं विधिवत्तिलसर्षपैः ॥
 घीषयित्वा जयं चास्य साम्बत्सरपुरोहितौ ।
 अन्यासनीपविष्टस्य दर्शयेतां जनं जनैः ॥
 स सान्त्वयित्वा तु जनं मुक्त्वा बन्धनं ततः ।
 दत्त्वाऽभयं चासनस्थः कालाकाङ्क्षी ततो भवेत् ॥
 नामिषेच्यो नृपश्चैत्रे नाधिमासे च भार्गव ।
 न प्रसुप्ते तथा विष्णौ विशेषात् प्रादृषि द्विज ॥
 न च भौमदिने राम चतुर्थ्याञ्च तथैव च ।
 नवम्यां नाभिषेक्तव्यश्चतुर्दश्याञ्च भार्गव ॥
 ध्रुवाणि वैष्णवं शाक्रं दक्षपुत्रौ तथैव च ।
 मक्षत्राणि प्रशस्यन्ते भूमिपालाभिषेचने ॥
 कार्या पौरन्दरो शान्तिः प्रागेवास्य पुरोधसा ।
 प्राप्तेऽभिषेकदिवसे सोपवासः पुरोहितः ॥
 सितमाल्योपवीतश्च सर्वभरणभूषितः ।
 वेदिमुल्लिख्य मन्त्रेण ऊत्वा तु विधिवत्ततः ॥
 शर्मवर्मगणश्चैव तथा स्वस्त्ययणं गणम् ।
 आयुष्यमभयश्चैव तथैव चापरातितम् ॥
 संपातवन्तं कलशं तथा कुर्याच्च काञ्चनम् ।
 वह्नेर्दक्षिणशार्श्वस्थः श्वेतचन्दनभूषितः ॥

श्वेतानुलेपनः खग्वी सर्वाभरणभूषितः ।

आसनस्थः सुखं पश्येत् निमित्तानि ऊताशने ॥

पश्येयुरन्ये च तथा नृसिंहाः दैवज्ञवाक्यं निपुणञ्च भूयः ।

सान्त्वत्तरस्याथ सदस्यमुख्याः सदस्यमुख्याः स पुरोहितश्च ॥

प्रदक्षिणावर्त्तशिखस्तदा जाम्बूनदप्रभः ।

रथौघमेघनिर्घोषो विधूमश्च ऊताशनः ॥

अनुलोमः सुगन्धश्च—सन्निभः ।

वर्द्धमानाकृतिस्रैव नन्द्यावर्त्तनिभस्तथा ॥

प्रसन्नार्चिर्महाज्वालः स्फुलिङ्गरहिती हि सः ।

खाद्यावसाने ज्वलनः स्वयं देवमुखीहविः ॥

यदा भुङ्क्ते महाभाग तदा राज्ञी हितं वदेत् ।

हविषश्च यदा वल्लौ न स्याच्छिमिशिमायितम् ॥

न व्रजेयुश्च मध्येन मार्जारमृगपक्षिणः ।

पिपीलिकाश्च धर्मज्ञ तदा कुर्याज्जयं नृपे ॥

अङ्गहारादिलाभे तु वल्लौ राज्ञी जयं वदेत् ।

तथैव च जयं ब्रूयात् प्रस्तरस्याप्यदाहिनि ॥

स्नानं समारभेद्राज्ञी होमकार्यादनन्तरम् ।

... ... स्वेच्छया स्नातः पुन ऋग्भिः समारभेत् ॥

पर्वताग्रमृदा तावत् मूर्द्धानं शोधयेन्नृपः ।

वल्मीकाग्रमृदा कर्णौ वदनं केशवाल्यात् ॥

इन्द्रालयमृदा ग्रीवां हृदयन्तु नृपाजिरात् ।

करिदन्तीदृ तमृदा दक्षिणन्तु तथा भुजम् ॥

सरोमृदा तथा षष्ठं उदरं सङ्गमान्मृदा ।
 नदीकूलद्वयमृदा पाश्चात् संशीधयेत्ततः ।
 वेश्याद्वारमृदा राज्ञः कटिशैचं विधीयते ।
 गजस्थानात् तथैवीरु गोस्थानाज्जानुनी तथा ॥
 अश्वस्थानात्तथा जङ्घा राज्ञः संशीधयेद्बुधः ।
 रथचक्रोद्धृतमृदा तथैव चरणद्वयम् ॥
 मृत्पूतः स्नपनीयः स्यात् पञ्चगव्यजलेन तु ।
 ततो भद्रासनगतं मुख्यामात्यचतुष्टयम् ।
 वलप्रधानं भूपालमभिषिञ्चेत् यथाविधि ॥
 पूर्वतोद्देशेऽङ्गुलीन घृतपूर्णं वा ततः
 दक्षिणे क्षीरपूर्णं रौप्यकुम्भेन क्षत्रियः ॥
 दध्नाच ताम्रकुम्भेन वैश्यः पश्चिमतोद्दिज ।
 माहिषेन जलेनीदक् शूद्राऽमात्याभिषेचयेत् ॥
 ततोऽभिषेकं नृपतेर्वक्त्रं प्रचयीद्दिजः ।
 कौवेर्यां मधुना राम ! इन्द्रीगोऽथ कुशीदकैः ॥
 सम्पातवन्तं कलशं तथाहृत्य पुरोहितः ।
 विधाय वह्निरक्षान्तु सदस्येषु यथाविधि ॥
 राजसूयाभिषेके तु ये मन्त्राः परिकीर्त्तिताः ।
 तैस्तु दद्यान्महाभाग ! ब्राह्मणानां स्वरेण तु ॥
 ततः पुरोहिती गच्छेत् वेदिमूलं तदैव तु ।
 विभूषितन्तु राजानं संस्थितं भद्र आसने ॥
 शतक्रिद्रेण पात्रेण सौवर्णेन यथाविधि ।

अभिषिञ्चेत धर्मज्ञः सम्यक् वेदविशारदः ॥
 या औषधी रोषधिभिः सृताभिः सुसमाहितः ।
 रथे तिष्ठेति गन्धैश्च आब्रह्मान् ब्राह्मणेति च ॥
 वोजैः पुष्पैस्तथा सीमं राम ! पुष्पवतीति च ।
 तेनैव चैव मन्त्रेण फलैस्तमभिषेचयेत् ॥”

[इत्यादि ।

ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য ।

ধনুর্বেদের প্রস্তাবে শ্রমবিধি বর্ণিত হইয়াছে । সেই সকল শ্রমক্রিয়া শিক্ষালাভের পরেও অবিস্মরণের জন্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠান করিতে হয় । যাহা অবিস্মরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে । সেই ব্যবস্থাটী শাস্ত্রধর প্রোক্ত ধনুর্বেদ রহস্যের মধ্যে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যথা—

“एवं श्रमविधिं कुर्यात् यावत् सिद्धिः प्रजायते ।

श्रमे सिद्धिं च वर्षासु नैव ग्राह्यं धनुः करे ॥

पर्वाभ्यासस्य शास्त्राणां मविस्मरणहेतवे ।

मासद्वयं श্রমं কुर্যাৎ প্রতিवर्षं शरदृतौ ।

जाते चाश्वयुजे मासे नवमीदेवतादिने ।

पूजयेद्दीश्वरीं चण्डीं गुरुं शस्त्राणि वाजिनः ॥”

যতদিন না অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়, যতদিন না অস্ত্র সকল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, তত দিন পূর্বোক্ত প্রকারে

শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করিবেক । শ্রম ক্রিয়ায় সুসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ হইলেও অভ্যস্তাস্ত্রের অবিস্মরণের নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেক । প্রত্যেক বৎসরের শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কার্তিক এই দুই মাসে পূর্বাভ্যস্ত শস্ত্রাদির শিক্ষানুরূপ পরিচালনাদি করা কর্তব্য । অন্য ঋতুতে কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারিবে ; পরন্তু বর্ষাকালে কদাচ ধনুর্ধারণ করিবে না । আশ্বিন মাসের নবমী দিনে ঈশ্বরী চণ্ডী দেবীর ও গুরুর পূজা করা কর্তব্য এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অশ্বাদির পরিচর্যা করাও কর্তব্য ।

সৈন্য বিভাগ ।

সেনাগণনার ও সেনাবিভাগের প্রণালীটী নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে লিখিত আছে যে, সেনা গণনার প্রথম প্রতীক পত্তি । তৎপরে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমু, অনী-কিনী, তৎপরে অন্ধোহিণী । এই সকল পরিভাষায় অর্থাৎ সাক্ষেতিক নামের অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত আছে ; তাহা এক একটী করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে ।

পত্তি ।

পত্তি সৈন্তের ও তাহাদের পরিবারের অর্থাৎ রক্ষক-সৈন্তদিগের বিভাগ এইরূপ—

“एकी रथी गजस्यैकी नराः पञ्च हयास्त्रयः ।

यस्यां सा पत्तिरेतेषां सहायान् प्रव्र वेधुना ।

(वै, नीति ।)

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই গুলি একত্রিত বা একযোগে থাকিলে পত্তি নামে কথিত হয় । ইহাদের সাহায্যকারী সৈন্যের কথা পশ্চাৎ বলা যাই-তেছে ।

সেনামুখ ।

“সেনামুখে তু গুণিতাস্ত্রয়স্বৈব রথা গজাঃ ।

त्रिंशत्रिलक्षपद्गाल्लिसहस्रं हि वाजिनः ॥”

(वै, नीति)

৩০ রথী, ৩০ হস্ত্যারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সমবেতকে সেনামুখ বলিয়া গণ্য করা যায় ।

গুল্ম ।

“गुल्मी नवरथाः प्रोक्ताः नागानां नवतीं विदुः ।

अश्वानां नवसाहस्रं नवलक्षाः पदातयः ॥”

গুন্ম সৈন্তে ৯ রথী, ৯০ হস্ত্যারোহী, ৯০০০ অশ্ব-
রোহী, ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিবেক ।

গণ ।

“গণাখ্যে তু শতাজ্জানাং বরাণাং সপ্তবিংশতিঃ ।
স্বম্বেরমানাং দ্বিশতং সন্ততিং প্রাজ্ঞরায়িকাঃ ॥
সপ্তবিংশতি সাহস্রা গান্ধর্বাঃ পরিকৌর্চিতাঃ ।
সপ্তবিংশতি লক্ষাস্তু স্মৃতাশ্বাশ্চ পদাতয়ঃ ॥”

২৭ রথী, ২০০ হস্তী, ২৭০০ অশ্ব, ২৭০০০০ পদাতি
সৈন্তের নাম গণ ।

বাহিনী ।

“বাহিন্যাং স্যন্দনাঃ প্রোক্তা চ্যেকাশীত্যা নিযোজিতাঃ ।
দশোত্তরাষ্ট্রশতকাঃ পদ্মিনস্বাশ্চ কৌর্চিতাঃ ॥
একাশীতি সহস্রাস্তু তুরঙ্গাঃ সম্রকৌর্চিতাঃ ।
একাশীতিক লক্ষা বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিণঃ ॥”

(বৈ, নীতি)

৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ২১০০ অশ্ব ২১০০০০ পদাতি
সৈন্তে এক বাহিনী সৈন্ত হয়, ইহা যুদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত
হইয়াছে ।

পৃথনা ।

ত্ৰয়স্ব চত্বারিংশচ্চ দ্বিশতং পৃথনা রথাঃ ।

চতুঃশতচ্চ ত্ৰিংশচ্চ বৈ সহস্ৰে চ দন্তিনাম্ ॥

তুরাঙ্গানাম্ সহস্রাণি ত্ৰিচত্বারিংশদেবতু ।

বৈ লক্ষ্যে চৈব রাজেন্দ্র বৈ কীটী চ নৃণাং ভবেত্ ॥

(বৈ, নীতি)

পৃথনা সৈন্তে ২৪৩ রথ, ২৪০০ হস্তী, ৪০০০০ অশ্ব
এবং ২০০০০০ পদাতি থাকিবেক ।

চমু ।

“চম্বাখ্যৈ সপ্তমযুহে গণনাং বচসি বিস্তরান্ ।

চম্বাং সপ্ত শতং চৈকনুগ্ননত্রিংশদ্রথাঃ স্মৃতাঃ ॥

সপ্তৈব চ সহস্রাণি বৈ শতে নবতিস্তথা ।

গজানাং সপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেবতু ॥

সহস্রাণি হযনাচ্চ পদাতীনামথো শৃণু ।

সপ্ত কীট্যস্ব চৈকোনত্রিংশলক্ষাণি ভূপতে ॥” (ঐ)

চমু নামক সপ্তম বিভাগের ৭২৯ রথ, ৭২৯০ হস্তী,
৭২৯০০০ কিংবা ২৯০০ অশ্ব এবং ৭০০০০০০ কিংবা
২৯০০০০০ পদাতি সম্মিলিত থাকে । অন্তঃপর অনীকিনী
সৈন্যের বর্ণনা অভিহিত হইয়াছে ।

অনীকিনী ।

“অনীকিন্যাং হি সহস্রে সপ্তাশীত্যধিকং শতম্ ।

রথানামথ নাগানাং গণনাং বচ্মি তেঽনঘ ॥

একবিংশত্ সহস্রাণি তথাচাষ্টশতং নৃপ ।

সপ্ততিস্থে ত্যথাস্থানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ ॥

একবিংশতি লক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্ ।

একবিংশতি কীট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ ॥

সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর ॥”

অনীকিনী নামক বিভাগে ২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং একবিংশতি কোটী ও সাতাশী লক্ষ পদাতি থাকে ।

অক্ষৌহিনী ।

“এতদ্বাণ গুণা যা স্যাৎ তাং ত্বমক্ষৌহিনীং শৃণু ।”

উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিনী বলিয়া জানিবে ।

যুদ্ধ শাস্ত্রধর কৃত ধনুর্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিনীর পরিমাণ যাহা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও বলা যাইতেছে । শাস্ত্রধর বলেন যে,—

“দুগ্ধয' স্রবস্বিন্দুনেত্রৈরক্ষৌহিনী মতা ।”

শূন্যদ্বয় (০০), স্বর, (৭), বসু (৮), ইন্দু (১) নেত্র (২), এই গুলি অঙ্ক বামগতি ক্রমে স্থাপনা করিলে যে সংখ্যা লাভ হয়, তৎপরিমিত সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী ।
অর্থাৎ ২১৭৮০০ সংখ্যক সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী ।
ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

“অক্ষৌহিণ্যাং প্রদিতানাং রথানাং ধর্মচারিণাং
সংখ্যা গণিততচ্ছন্নৈঃ সহস্রান্যেকবিংশতিঃ ॥
উপর্য্যষ্টাশতান্যজ্ঞস্তথা ভূপাশ্ব সপ্ততিঃ ।
গজানান্তু পরীমাণমেতদেব विनिर्दिशेत् ॥
ত্রিযং লক্ষ্যং পদাतीনাং সহস্রাणि तथा नव ।
शतानि त्रीणि पञ्चाशच्छूराणां शस्त्रधारिणाम् ॥
पञ्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च ।
दशीनराणि यत्प्राहुः संख्यातच्छविदीजनाः ॥”

অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০ রথ, ৭০ রাজা (সামন্ত), উক্ত সংখ্যক হস্তী, ১০৯৩৫০ শস্ত্রধারী পদাতি এবং ৬৫১১০ অশ্ব বিদ্যমান থাকে ।

মহাভারতেও অক্ষৌহিণী সংখ্যার নির্ণয় আছে ।

চিহ্নকরণ ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহিত সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান করিবে ; যথা—

“পত্ন্যাঘঙ্ক ধ্বজপট্যঃ পৃথক্ কার্য্য্য বিশেষতঃ ।

স্বসৈন্যস্য চ শত্রীশ্চ বৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধয়ে ॥”

পূর্বেোক্ত পতি প্রভৃতি সৈন্তদলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্বজপট অর্থাৎ পতাকা স্থাপন করিবেক । যুদ্ধকালে ও ব্যূহ-রচনার সময় সৈন্ত দলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধি থাকায় আপন সৈন্তের ও পরকীয় সৈন্তের বৈলক্ষণ্য বোধক পতাকাদি চিহ্ন প্রদান করিবেক ।

সেনাপতি ।

“সর্বসেনাধিপঃ কার্য্য্যঃ কুলপুত্রী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

দৃষ্টাদহানী দল্লম্ব রূপবান্ রাজবল্লভঃ ॥

লালাটিকশ্চ ক্লিনন্নঃ সেনা নরবিশারদঃ ।

ধৃঢ়ঃ সারথিতা চৈব স্বযীধানাং রণাজিরি ॥”

যত প্রকার সৈন্ত থাকুক, রাজা এক জন সদগুণান্বিত ব্যক্তিকে তত্তাবতের আধিপত্যে অভিষেক করিবেন । যিনি সংকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, (অর্থাৎ লোভক্ষোভাদি-রহিত), যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও অনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, রাজপ্রিয়, ভাগ্যবান, ইঙ্গিত যোদ্ধা, সৈন্তনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দর্শ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তদিগকে সাত্বনা করিতে সমর্থ, দৈদৃশ সংপুরুষকেই রাজা সর্বসেনাপত্য প্রদান করিবেন ।

“অক্ষৌহিণীনাং পতয়ঃ পৃথক্ কার্য্যাস্থাবিধাঃ ।

সেনাপতিবশে তেঃপি তিষ্ঠেয়ুস্তেন পালিতাঃ ॥

পত্তেঃ সেনামুখস্যাপি গুল্মস্য চ গণস্য চ ।

বাহিন্যাঃ পুতনায়াশ্চ চন্দ্রাস্বাধ্যধিপাঃ পৃথক্ ॥

অনৌকিন্যাশ্চ কার্য্যাবৈ বোধশিক্ষাসু নিশ্চিন্তাঃ ।

দ্ব্যৌল্লয়াণাং পতয়ঃ কার্য্যঃ কার্য্যানুসারনঃ ॥”

যিনি সকল সেনার অধিপতি—তঁাহার নাম সেনাপতি ।
তন্নিম্ন অক্ষৌহিনীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্ম-
নায়ক, গণনায়ক, অনৌকিনীপতি, চম্পতি, ইহঁারা স্ব স্ব
সৈন্তের অধীশ্বর এবং ইহঁারা সকলেই সেনাপতি কর্তৃক
পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া তদীয় আজ্ঞাধীনে থাকিবেন ।
রাজা সেনাপতির দ্বারা উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিকে পত্তি সৈন্তের,
সেনামুখসৈন্তের, গুল্মসৈন্তের, গণসৈন্তের, বাহিনীসৈন্তের
পুতনাসৈন্তের, চম্পসৈন্তের ও অনৌকিনীসৈন্তের পৃথক
পৃথক অধিপতি নিযুক্ত করিবেন । যঁাহারা শিক্ষা দিতে
পারেন, তাহঁরা ব্যক্তিই সম্প্রতি সেনাপতি পদের উপযুক্ত
পাত্র । কার্য্যবিশেষে দুই দুই ও তিন তিন সেনার
উপর এক কিংবা ততোধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্তব্য ।

“যাটক্ সৈনাধিপত্যে তু পূর্ব্ণ যৌঃধিক্তনী ভবেত্

স জ্যেষ্ঠভাবৈ নিয়তস্তস্যস্বাদ্যস্তু তদ্বশে ॥”

পূর্বে যিনি যেরূপ সৈন্তের আধিপত্য গ্রহণ করিয়া-
ছেন, সেই সৈন্তের প্রতিই তাহার স্বাতন্ত্র্য ; পরন্তু তিনি
জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান (তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ সেনাপতি
বর্তমানে) সেই জ্যেষ্ঠেরই বশবর্তী থাকিবেন । জ্যেষ্ঠের
অভাবে তন্নিয় সেনাপতিই জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন ।

“দন্ত্যাদ্ভ্রপতীনষ্টী অলৌহিণ্যধিপানুগান্ ।

কৃত্বা জ্যৈষ্ঠানুসারেণ নিযম্যাঃ সর্বসৈনিকাঃ ॥”

পতি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি অর্থাৎ স্বল্প সেনাপতি
আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন । জ্যেষ্ঠানুসারী
থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্তদিগকে রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবেন । যিনি
সর্বসেনাপতি, তিনি সমুদায় সেনাপতিকেই আপনার
অনুগামী করিয়া সৈন্তদিগকে সুনিয়মে অনুশাসন
করিবেন ।

“অধিপাঃ প্রতি সৈন্যাস্তয়ঃকর্যাঃ সুশিক্ষিতাঃ

উত্তমাধমমধ্যস্থা জ্যৈষ্ঠানু বহুবর্ণিনঃ ॥”

পতি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে তিন জন করিয়া
অধিপতি নিযুক্ত করা কর্তব্য । তাহার মধ্যে কেহ উত্তম,
কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়
স্থানীয়) । ইহারা সকলেই আপন আপন জ্যেষ্ঠের
(প্রধানের) আজ্ঞাধীন থাকিবেন ।

সাক্ষত* ।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্য মধ্যে বিভাগক্রমে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে) প্রতিদিন এক একটী করিয়া সাক্ষত প্রচার বা সঙ্কেত নির্ধারণ করিবেন। সেই সঙ্কেত কেবল সেনাপতিরাই জ্ঞাত থাকিবেন, কোন সেনা কি অণ্ড কোন পুরুষ যেন তাহা জানিতে না পারে।

সৈন্যপালের একটী প্রধান কর্তব্য ।

“दिवसे दिवसे सेनां परिवर्त्य प्रयोजयेत् ।

एकत्र सुस्थितं सैन्यं शङ्कां चास्यापि साधयेत् ॥”

সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে এক স্থানে রাখিবেন না এবং প্রতিদিন তাহাদের পরবর্তন করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিবেন। কেন না সৈন্যগণ এক স্থানে ও অপরিবর্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

বেতন ও পুরস্কার ।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতি প্রকাশিকা গ্রন্থের ধনুর্বেদ বিভাগে যোদ্ধৃগণের বেতনবিধি ও পুরস্কার দানের নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে এদেশে

* ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যে এই সংকেত বাক্যের নাম Parole.

তৎকালে কিরূপ ধনোন্নতি ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্বকালের রাজারা যোদ্ধা দিগকে কিরূপ বেতন দিতেন, ইহা জানিবার জ্ঞ সময়ে সময়ে অনেকেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। এই দুই কারণেই আমরা এই প্রস্তাবে বেতন ও পুরস্কার ঘটিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

“যুবরাজায় বর্বাণাং পঞ্চসাহসিকী ভূতিঃ ।
 সর্বসনা-প্রণেত্রো চ চতুঃসাহসিকী চ সা ।
 ভূতিস্বাতিরথো দেয়া বর্বাণাং ত্রিসহস্রকম্ ।
 মহারথায় সাহস্রদ্বয়ং রাজাধিমাণ্ডিকম্ ॥
 বেতনং রথিকায়াঃ স্যেৎ সাহস্রং গজযোধিনে ।
 দ্বাদ্বারদ্বারথায় বেতনং শতপঞ্চকম্ ॥
 একস্মৈ রথিকায়াথ তাদৃশে গজসাধিনে ।
 নিষ্কাণাং ত্রিশতং দ্বাদ্বারতঃ যতস্তৌ তত্ কুটুম্বিনৌ ॥
 সর্বাশ্বাধিপতীরাশ্বলিসাহস্রং স বা ইতি ।
 পাদাতাধিপতিস্বাপি দ্বিসাহস্রস্য ভাজনম্ ॥
 পাদাতানাং সহস্রস্য নেত্রো পঞ্চ শতং স্মৃতম্ ।
 তথা চাশ্বসহস্রেণে সহস্রং বেতনং ভবেৎ ॥
 পদাতয়ে সুবর্ণানাং পঞ্চকং বেতনং ভবেৎ ।
 শতপত্যধিপে সপ্ত বর্বাণাং হযচারিণে ॥
 গজযন্তঃ সারথেষু ধ্বজিনে চক্রপায় চ ।

পদাতিত্রিশতেশায় পথিকৌচচরায় চ ॥
 বার্ত্তিকাধিপতেশ্বাপি বেত্রিণাং পতয়ে তথা ।
 সূতমাগধ বন্দীনাং পতয়ে বীবধাধিপে ॥
 সেনায়া মৃতিদাত্রে চ মটানাং গণনাপরে ।
 মাসি মাসিতু বব্বাণাং দশ পঞ্চ চ বেতনম্ ॥
 তন্নত্ কাৰ্য্যানুসারেণ কুলপর্য্যায়তস্তথা ।
 মটানান্ন মৃতিঃ কল্প্যা তন্নত্ কালানুসারতঃ ॥”

রাজা যুবরাজকে মাসিক পাঁচ হাজার বর্ষ* এবং প্রধান সেনাপতিকে মাসিক চারি হাজার বর্ষ বেতন প্রদান করিবেন ।

যিনি অতিরথ ;† রাজার নিকট তিন হাজার বর্ষ মাসিক রুত্তি পাইবেন এবং যিনি মহারথ তাঁহাকে অন্যান্য দুই সহস্র বর্ষ মাসিক রুত্তি প্রদান করা কর্তব্য ।

যিনি গজ-যোধী ও রথী ; রাজা তাঁহাকে এক সহস্র বর্ষ এবং যিনি অর্দ্ধ-রথী রাজা তাঁহাকে পাঁচ শত বর্ষ বেতন দিয়া বাধ্য রাখিবেন ।

যিনি কেবল মাত্র রথী, পরন্তু সুনিপুণ নহেন ; তাঁহাকে

* ইহা এক প্রকার প্রাচীন সূবর্ণ মুদ্রা ।

† সর্বশ্রেষ্ঠ রথ-যোদ্ধাকে অতিরথ বলে । ইহার পরিভাষাটি পৃথক স্থানে বর্ণন করা যাইবে ।

এবং যিনি গজযোদ্ধী পরন্তু তদ্বিষয়ে অল্পজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তিকে মাসিক তিন শত নিষ্ক প্রদান করা কর্তব্য ।

যিনি সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্তের অধিপতি, তিনি মাসিক তিন হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য এবং যিনি সমস্ত পদাতি সৈন্তের অধিনায়ক তিনি দুই হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য ।

যিনি এক হাজার পদাতি সৈন্তের নিয়ন্তা ; তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ শত নিষ্কের অধিক নহে । যিনি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়ক তাঁহাকে সহস্র নিষ্ক বেতন প্রদান করা কর্তব্য ।

শিক্ষিত ও কৃতযুদ্ধ পদাতি সৈন্তের বেতন পাঁচ সূবর্ণ † এবং শত পদাতির অধিপতির বেতন ৭ বর্ষ হওয়া উচিত ।

অশ্বনায়ক, হস্তিশিক্ষক, সারথি, চিহ্ননিয়ামক, চক্র-রক্ষক, তিন শত পদাতি সৈনের অধিপতি, পথপ্রদর্শক ও পথাভিজ্ঞ, উষ্ট্রচর, বার্তাজীবী বা চরের অধিপতি, বেত্রধারীদিগের নিয়ন্তা, স্তূত, মাগধ ও স্তুতিপাঠকদিগের অধ্যক্ষ, বীৰধ, গজের নায়ক, সেনাগণের বেতনদাতা, সৈন্ত গণনা কারক (যিনি সৈন্তগণের তালিকা রাখেন),—এই

† ইহাও এক প্রকার মুদ্রা । ৮০ রতি ওজনের মুদ্রিত কাঞ্চন খণ্ডকে পূর্বের সূবর্ণ বলিত । নিষ্কও পূর্বকালের স্বর্ণ মুদ্রা ।

সকল ব্যক্তিকে প্রতি মাসে দশ ও পাঁচ অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত বেতন প্রদান করা উচিত ।

বাহা বলা হইল তাহা একটা সাধারণ উল্লেখ মাত্র । বস্তুতঃ কার্য্য, কুল, পদমর্যাদা ও অবস্থা অনুসারেই পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের এবং অন্যান্য সৈন্তগণের বেতন কল্পনা করা কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

এক্ষণকার ত্রায় পূর্বকালেও বৃত্তিদান বা “পেন্সন” দিবার রীতি ছিল । প্রত্যেক রাজশাস্ত্রে, বিশেষতঃ নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । যথা—

“যুদ্ধে স্বার্থং মৃতা যৈশ্চ শত্রুভিস্তত্স্ববন্মু সু ।

সেবয়া জীবিতা যৈ চ দেয়ং তৈশ্চাং হি জীবনম্ ॥

মৃতানাং জীবিতাশ্চাপি পূৰ্ব্বং সেবাপরাত্মনাম্ ।

তদীয়ানান্তু তৈশ্চাং বা পূৰ্ব্বমস্মাদ্ভিজীবনম্ ॥

সংগ্রামেঃভিমুখাঃ কৃতা যুবানী ন মৃতা ভট্টাঃ ।

রাজসেবাস্বশক্তা যৈ তৈশ্চাং পূৰ্ব্বাভিজীবনম্ ॥

শত্রুসামুপঘাতার্থং তস্য মৰ্ম্মাণি যৌঃপ্যেত ।

স্বস্তৈ তস্যাপি কৰ্ম্মাণ্য দ্বিগুণা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

শত্রুসেনা বিমোহিতাঃ দুর্গারোহণতত্পরম্ ।

স্বরাজ্যং বৃদ্ধি কৰ্ত্তারং যৌজয়েত্ দ্রবণীতকরৈঃ ॥”

যে ব্যক্তি রাজার স্বার্থ সংসাধন করিতে গিয়া শত্রু কর্তৃক যুদ্ধে মৃত হইবে, রাজা তাঁহার বন্ধুকে অর্থাৎ স্ত্রী,

পিতা মাতা অথবা পুত্রকে তদীয় প্রাপ্য জীবিকা প্রদান করিবেন । (যে ব্যক্তি যাহা মাসিক বৃত্তি পাইত সেই মাসিক বৃত্তিই প্রদেয় ।) যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়া জীর্ণ হইয়াছে, কার্যক্ষম হইলেও রাজা তাহাকে সম্পূর্ণ বৃত্তি প্রদান করিবেন ।

যে ব্যক্তি পূর্বের বিশেষরূপে সেবাতৎপর ছিল, (অবাধে ও প্রাণপণে কার্য করিয়া আসিয়াছে), সে ব্যক্তি কার্য ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকুক, অথবা মৃত হউক, তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রী পুত্রকে অর্দ্ধ-জীবিকা অর্থাৎ সে যাহা পাইত তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য ।

যে যোদ্ধা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হয়, যে যুবা বিনষ্ট না হইয়া আহতপ্রযুক্ত কার্যকরণে অক্ষম ও জাতি থাকে, সে ব্যক্তিকেও পূর্ব বেতনের অর্দ্ধ পরিমাণ বেতন দেওয়া কর্তব্য ।

যে ব্যক্তি রাজার শত্রু বিনাশে উদ্যত হইয়া শত্রুর মর্শ্ব বিঘাতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রু বিনাশে কৃতকার্য হয়, হইয়া পুনশ্চ রাজসেবায় নিযুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ বেতন পাইবার উপযুক্ত ।

যে ব্যক্তি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে সমর্থ, দুর্গপ্রবেশে তৎপর, রাজ্যবৃদ্ধিকারী, রাজা তাহাকে ভূরি পরিমাণ অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবেন ।

পুরস্কার ।

“প্রত্যগ্রে কৰ্ম্মণি কৃতে স্তাঘমানঃ কৃতাৱরঃ ।

যৌধৈৰ্ভ্যঃ পূৰ্ণপাত্ৰং হি দদ্যাৱাজা বিশেষতঃ ॥”

[বৈ, নীতি ।

আজ্ঞানুরূপ কার্য সম্পাদন করিয়া আসিলে, রাজা তাহাকে সমাদর করিবেন, সর্বসমক্ষে প্রশংসা করিবেন, তাহাকে এবং তাহার আজ্ঞাপালক যোদ্ধবর্গকে বিশেষরূপ পূর্ণ পাত্র (পরিমিত ধন ও দ্রব্য) প্রদান করিবেন ।

এই সাধারণ বিধির অন্তর্গত বিশেষ বিধি অর্থাৎ কিরূপ কার্যের পুরস্কারার্থ কিরূপ পূর্ণপাত্র (পুরস্কারীয় ধন বা দ্রব্য) প্রদান করা কর্তব্য তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশিত আছে ।

“দদ্যাৎ প্রহৃষ্টী নিযুতং বৰ্জ্জাণাং রাজঘাতিনে ।

তদর্দ্ধং তত্শুভবধে সেনাপতিবধে তথা ॥

অক্ষৌহিণীপতিবধে তদর্দ্ধং পরিচক্ষতে ।

মন্ত্র্যমাত্যবধে চৈব তদর্দ্ধং প্রদাপয়েৎ ॥

অনৌকিনৌ চমস্শ্চৈব ঘটনাবাহিনীগণঃ ।

গুল্মং সেনাসুখং পত্তিরীতেশাং পতিঘাতিনে ॥

ক্রমাৱর্দ্ধাংগহাসেন তদর্দ্ধানি প্রদাপয়েৎ ।

বেতনাদধিকং চৈতৎ প্রাপ্য কুৰ্য্যুশ্চ তেঽধিকম্ ॥

अक्षौहिण्याः पतिं हत्वा द्वितीयं वा तृतीयकम् ।
 चम्बोरधिपतिञ्चैव पृतनानां पतिं तथा ॥
 अनीकिनीपहा यावत् तावत् प्राप्नोति राजतः ।
 इत्यमग्रेऽपि योक्तव्यं सम्मानमधिपापहे ॥
 पलायितं सायुधन्तु धृत्वा स्वभट्टदायिने ।
 वर्वाणां पञ्च वै दद्यात् तस्मै सत्कृत्य भूमिपः ॥
 पलायितं सभृतिकं विशस्त्रं देहशीभिनं ।
 धृत्वा निवेदिने दद्यात् वर्वाणाञ्च त्रिकं नृपः ॥
 गजञ्च गजसादिञ्च महारथिकमस्तकम् ।
 क्षित्वा निवेदयेद्राज्ञी द्विसाहस्रं स वा इति ॥
 हयारूढवरं हत्वा पादाताधिपतिं तथा ।
 वर्वाणाञ्च सहस्रस्य योग्यो भवति राजतः ॥
 शत्रुसैन्यात् कुञ्जरं वा रथं वा यः समाहरेत् ।
 पञ्चाशद्वर्षसम्मानं स प्राप्नोतीह राजतः ॥
 प्रतिप्रयाणं भृत्यानां भक्तं देयं स्थितौ न हि ।
 मार्गायासं विदित्वैषां वेतनादधिकं त्विदम् ॥
 अन्येषु वा साहसेषु वेतनादधिकं नृपः ।
 लोकसंग्रहणार्थञ्च दद्याद् पारितोषिकम् ॥
 भटेभ्यश्चैव वस्त्राणि रजकाणाञ्च वेतनम् ।
 तद्वेतनेन कल्पानि नौषधानि च रोगिणाम् ।
 परराष्ट्रार्जितं द्रव्यमर्द्धं राजा विभज्य तु ।
 योधेभ्योऽर्द्धं प्रदेयं स्थाद्वञ्च स्वयमाहरेत् ॥

হৃৎ বা শকটং বাপি হরেৎ সীপস্কৃতং ভটঃ ।

তদর্দ্ধং তূর্য্যমংশন্তু স লভেৎ রাজসত্কৃতঃ ॥

শিথিলানি চ শস্ত্রাণি লুণ্ঠিতং শত্রুভির্যুধি ।

স্বয়ীধানাং নৃপী দদ্যাৎ বেতনং পরিহায্য চ ॥”

যে যোদ্ধা শত্রু রাজাকে বধ * করে, রাজা তাহাকে হুণ্ট হইয়া নিযুত সংখ্যক বর্ষ প্রদান করিবেন। যুবরাজ বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ এবং প্রধান সেনাপতি বধ করিলেও অর্দ্ধ পুরস্কার দান করা কর্তব্য। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, মন্ত্রী ও প্রধানামাত্য বধকারিদিগকে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্তব্য।

অনীকিনী, চমু, পূতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ, ও পতি,—এই সকলের অধিপদিগকে বধ করিতে পারিলে যথাক্রমে অর্দ্ধাৰ্দ্ধ পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইবে। ইহা তাহাদিগের অতিরিক্ত লাভ, বেতনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এবম্প্রকার বেতনাধিক দান করিলে তাহারা অবশুই সাহস প্রকাশ করিবে, এতৎ কারণে রাজা উক্ত প্রকার পারিতোষিক দান করিবেন।

* বধ এই শব্দটি পারিভাষিক। “বধস্বাঘৃবিঘঃ স্মৃতঃ।” ১১৫, তাড়ন, অবমাননা প্রভৃতি আট প্রকার কার্যের উপর বধ এই পরিভাষা স্থাপিত আছে। স্মৃতিরূপ বধ শব্দ দেখিয়া সহসা প্রাণ বিনাশ অর্থ মনে হইবে বটে, পরন্তু এস্থলে সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বন্ধনাদি আট প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

অক্ষৌহিণী প্রভৃতি সৈন্যগণের তিনটী করিয়া অধিপ থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেই পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়কদিগকে বধ বন্ধনাদি করিলে পুরস্কার পাইবে, ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাও বলা যাইতেছে যে, সেই সকল সৈন্যদলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিপতিদিগকে বধ কিংবা বন্ধনাদি করিতে পারিলে তাহারাও আপন রাজার নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে। এই রূপ যে কোন অধিপতিকে বধ বন্ধনাদি করিতে পারিলেই পুরস্কার যোগ্য হইবে, ইহা রাজশাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা জানিবে।

কোন সৈন্য অস্ত্র সমেত পলায়ন করিতেছে, এমত অবস্থায় যদি কেহ তাহাকে অস্ত্র সমেত ধৃত করিয়া তাহার দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে রাজা সেই ধৃতকারী ব্যক্তিকে পাঁচ বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন এবং বিশেষ সম্মান করিবেন।

কোন সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র দেহ লইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া তদলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে, রাজা তাহাকে তিন বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি সৈন্য ভঙ্গকারী শত্রুপক্ষীয় বৃহৎ গজ, গজ-যোদ্ধা ও মহারথীর মস্তক ছেদন করিয়া রাজার নিকট

অর্পণ করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইবার যোগ্য ।

শত্রুপক্ষীয় প্রধান অশ্বারোহী বিনাশ করিয়া এবং পদাতি সৈন্তের অধিপতি বধ করিয়া রাজার নিকট সহস্র বর্ষ পুরস্কার পাইবার যোগ্য হয় ।

যে ব্যক্তি শত্রু সৈন্যের মধ্য হইতে যুদ্ধকুশল হস্তী কি কোন প্রধান রথ কাড়িয়া আনে, সে ব্যক্তিও রাজার নিকট পঞ্চাশ বর্ষ পুরস্কার পায় ।

যত বার যুদ্ধযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রাতেই রাজা সৈন্য ও ভূত্যদিগকে ভক্ত অর্থাৎ আহারাচ্ছাদন স্বকীয় কোষ হইতে প্রদান করিবেন ; কিন্তু স্থিতিকালে অর্থাৎ যখন কোন কার্য নাই, তখন তাহাদিগকে ভক্ত প্রদান করিবেন না, কেবল মাত্র বেতনই দিবেন । (তাহারা তখন আপন আপন বেতনের দ্বারা আহার নির্বাহ করিবে) পথের ও গতিবিধি ক্রেশ বিবেচনা করিয়া বেতনাধিক ভক্ত অর্থাৎ নিজ কোষ হইতে আহারীয় ব্যয় প্রদান করিবেন । এইরূপ, অন্যান্য সাহসিক কার্যেও বেতন-তিরিক্ত পৃথক প্রদান করা কর্তব্য এবং লোকসংগ্রহের নিমিত্ত রাজার পারিতোষিক দান করা কর্তব্য ।

স্থিতিকালে যোদ্ধৃগণের বস্ত্র পরিচ্ছদ ও রজকদিগের বেতন রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু তাহার ব্যয় তাহা-

দের নিজ নিজ প্রাপ্য বেতন হইতে কর্তৃত হইবে। কোন সৈন্য যদি পীড়িত হয় তবে তাহাদের চিকিৎসাও রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু ঔষধের ব্যয় তাহার বেতন হইতে প্রদত্ত হইবে।

পররাজ্য জয় হইলে, রাজা লুণ্ঠন দ্রব্য ও লুণ্ঠনলব্ধ ধন সকল দুই ভাগ করিবেন। তাহার একভাগ যোদ্ধা দিগকে এবং একভাগ ধনাগারে স্থাপন করিবেন।

কোন সৈন্য যদি সসজ্জ অশ্ব কিংবা অলঙ্কৃত রথ আহরণ করে, তবে সে তাহার চতুর্থাংশ এবং রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

যদি কোন সৈন্য আপনার অস্ত্র কিংবা শস্ত্র হারাইয়া ফেলে, অথবা তাহা শত্রু সৈন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (অর্থাৎ শত্রু পক্ষীয়েরা যদি কাহারও অস্ত্র কাড়িয়া লয়) তবে রাজা তাহাকে পুনর্বার অস্ত্র প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহার মূল্য তাহার বেতন হইতে পরিগৃহীত হইবে।

ব্যূহ ।

ধনুর্বেদ ও যুদ্ধ-প্রসঙ্গে ব্যূহরচনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে। তজ্জগৎ আশ্রয়ে ধনুর্বেদ, গুহ্রনীতি, মহাভারত, নীতিময়ুখ ও কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি মহান্ নিবন্ধ হইতে এই ব্যূহপ্রস্তাব সংকলিত হইল।

যুদ্ধকালে ও অভিনির্ঘাণকালে যে হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিসৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীক্রমে বিন্যস্ত করা হয় (সাজান হয়), সেই বিন্যাস পরিপাটীর নাম ব্যূহ । এই ব্যূহ অসংখ্য প্রকার হইলেও প্রধান কল্পে ছয় প্রকার । নীতিময়ুখগ্রন্থকার প্রধানকল্পের ছয়টী ব্যূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, “যদ্ব্যযন্যে চ গরুড়াদযী ব্যূহমেদে নীতান্স্যাদ্য-
নেষামন্ত ভাবাত্ ষোড়ৈব ব্যূহমেদা স্রীয়াঃ ।” যদিও গরুড় প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ ব্যূহ গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে, তথাপি সে সকল ব্যূহ এই ছয় প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভূত হয়, সুতরাং ছয় প্রকার ব্যূহই প্রধান, অন্যান্য ব্যূহ ঐ ছয়প্রকারের শাখা প্রশাখা মাত্র । উক্ত গ্রন্থকার প্রধান ছয় প্রকার ব্যূহের নাম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা বর্ণন করিয়াছেন । যথা—

“অহন্তু মকরশ্যেন সূচীশকটবজ্রসর্বনীমদ্রমেদাত্ ষোড়ৈ । তেষাং বিনিয়োগ উক্তো মহাভারতে ॥”

ব্যূহ ছয় প্রকার । মকর (১), শেন (২), সূচী (৩), শকট (৪), বজ্র (৫), ও সর্বতোভদ্র (৬) । এই ছয় প্রকার ব্যূহের বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ স্থলে বা কিরূপ অবস্থায় কোন ব্যূহ করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা মহাভারতে কথিত হইয়াছে । যথা—

“যাযাবুদ্বহেন মহতা মকরেণ পুরীমর্থ ।

শ্যেনেনীময়পদেণ সূচ্যা বা ধীরচক্রয়া ॥

দশ্বাঙ্ঘ্রযে তু শকটং পার্শ্বযৌর্বজ্রসংযুক্তম্ ।

সর্বতঃ সর্বতীমদ্রং ময়ি ব্যূহং প্রকল্পয়েত ॥”

যে স্থানে সম্মুখে ভয়, সেস্থানে মকরব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেক ; অথবা শেনব্যূহ কিম্বা সূচীব্যূহ অবলম্বন করিবেক । পশ্চাচ্চাগে ভয়কারণ উপলব্ধ হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে বজ্রব্যূহ আশ্রয় করা কর্তব্য । আর যদি ভয়ের দিগ্‌নির্ণয় না থাকে, সকল দিকেই ভয়সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিবেক ।

অগ্নিপুৰাণোক্ত রণদীক্ষা প্রকরণে কতকগুলি ব্যূহের উল্লেখ আছে । যথা—

“গরুড়ীমকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ ।

অঙ্কচন্দ্রস্য বজ্রস্য শকটব্যূহ এব চ ॥

মণ্ডনঃ সর্বতীমদ্রী সূচীব্যূহস্তথৈব চ ॥”

গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অঙ্কচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডন, সর্বতোভদ্র ও সূচী,—অগ্নিপুৰাণের মতে এই দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া গণ্য । অগ্নিপুৰাণ আরও বলিয়াছেন যে,—

“ব্যূহাঃ প্রায়ঃসংখ্যাস্থ দ্বয়ং নৈকধা ॥”

যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার ব্যূহ

রচিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ব্যূহের সংখ্যা কল্পনা করা বা সৈন্যরচনাকে সীমাবদ্ধ করা অসঙ্গত ভিন্ন সুসঙ্গত নহে । তবে দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত, সৈন্যরচনার মর্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত, নীতিবক্তৃৎগণ উক্ত প্রকার সীমাবদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন । অগ্নিপুরাণের রণদীক্ষা প্রকরণোক্ত নিম্নোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে উহাই প্রতীত হইবে । যথা—

“দ্বিগু লব্ধম্যঃ শত্রুনাং কৃত্যান্ প্রকৃতিকল্যণাম্ ।

সংহতান্ যীযথৈবল্যান্ কামং বিস্তারয়েৎ বহুন্ ॥”

উপযুক্ত যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া, শত্রুগণের অজ্ঞাত-সারে, আপনার সৈন্যরচনা করিবেন । অল্পসৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে সংহত অল্পের সহিত, আবশ্যকমতে বহুসৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন ।

ব্যূহরচনার সম্বন্ধে নীতিসার ও নীতিময়ুখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সর্বাগ্রভাগে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি অবস্থান করিবেন । অন্যান্য বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ করিবেন । পরন্তু তাঁহারা সকলেই সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন । স্ত্রীলোক, কোষ অর্থাৎ ধনাগার, রাজা, আর ক্ষুদ্রসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি ও তদ্রক্ষক,—ইহাদিগকে ব্যূহের মধ্যস্থলে সংরক্ষণ করা কর্তব্য । যথা—

“নাযকঃ পুরতী যাযাত্ প্রবীরপুরুষাটনঃ ।

মধ্যে কলত্রং কীপস্ব স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্ ॥”

হস্তী সৈন্ত, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি সৈন্ত,—
এই চতুর্বিধ সৈন্তই ব্যূহে বিস্তৃত হয়। পরন্তু যে কোন
প্রকার ব্যূহ রচিত হউক, সমুদায় ব্যূহেই উক্ত সৈন্ত স্থাপ-
নের এক সাধারণ বিধি আছে। যথাঃ—

“দার্ষ্যযৌরুমযীরস্বা বাজিনাং দার্ষ্যযৌ রথাঃ ।

রথানাং দার্ষ্যযৌনাংগা নাগানাস্বাটবী বলম্ ॥”

ব্যূহের উভয় পাশ্বে অশ্বারোহী থাকিবেক। অশ্বা-
রোহীর পাশ্বে রথারোহী থাকিবেক। রথের পাশ্বে হস্ত্যা-
রোহী, এবং হস্তীর পাশ্বে পদাতি সৈন্ত থাকিবেক।

নীতিমযুখকার বলেন, প্রত্যেক ব্যূহে দুই দুই সেনা-
পতি থাকে। একজন অগ্রণী এবং অন্যজন পশ্চান্নায়ক।
ইহাদের একজন অর্থাৎ যিনি অগ্রণী, তিনি সম্মুখ, অন্যজন
অর্থাৎ যিনি পশ্চান্নায়ক তিনি পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া
থাকেন। যথা—

“দস্বাত্ সেনাপতিঃ সর্বং পুরস্কৃত্য দ্বতী বলম্ ।

যাযাত্ সন্নদ্বসৈন্যৌঘৈঃ খিপ্রাংস্বাস্বাসয়ন্ জনান্ ॥”

রণদক্ষ সেনাপতি চতুরঙ্গ বল অগ্রগামী করিয়া
যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান

করিবেন এদং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভদ্রোদ্যত সৈন্য-
দিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে দুই দুই সেনাপতি থাকার
কথা বিস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

“পূর্ব সেনাপতেঃ যানমুক্তম্ । অধুনা তু পশ্চাদযানম্ । অনী-
হায়তে অগ্নি যানো পশ্চাদযানোচেতি সেনাদ্বয়মস্মীতি ।”

অগ্নিপুৰাণীয় রণদীক্ষা অধ্যায়ে উপদেশ আছে যে,
রাজা এককালে সমস্ত সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন
না। পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার দুইভাগ পক্ষে, দুই ভাগ
অনুপক্ষে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ লুক্কায়িত রাখিবেন।
আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কার্য্যসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া,
হয় একভাগ, না হয় দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অন্য
তিন ভাগ তাহাদের রক্ষার্থে স্থাপন করিবেন। যিনি রাজা,
তিনি যদি স্বয়ং সেনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তবে
তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না; অন্যান্য এককোশ
দূরে রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে
আশ্বাস দানার্থ থাকিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি
রণে ভদ্রে দেয়, তবে আর কাহারও রণে থাকা উচিত নহে।
সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়মান হওয়া উচিত। কি প্রকার
নিয়মে ব্যূহমধ্যে সংগরণ করিতে হয়? অগ্নি পুরাণ অপেক্ষা

শুক্লনীতিগ্রন্থে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । অগ্নিপুৰা-
ণীয় ব্যবস্থাটি এইঃ—

“ন সंहতান্ ন বিরলান্ যৌধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েৎ ॥
 আযুধানান্তু সঙ্কর্ণো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্ ।
 ভেদ্যু কামঃ পরানীকং সंहতৈরেব ভেদয়েৎ ॥
 ভেদরক্ষা পরেণাপি কৰ্তব্যে সंहতৈস্তথা ।
 ব্যূহং ভেদ্যবহং কুর্য্যাত্ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া ॥
 গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ ।
 রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চৰ্মিণঃ ॥
 ধন্বিনশ্চৰ্মিভিস্তৃন্যাঃ পুরস্তাশ্চৰ্মিণী রণে ।
 পৃষ্ঠতীধন্বিনঃ পশ্চাদ্বন্বিনাং তুরগা রথাঃ ॥
 রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্ভ্রাতব্যেঃ পৃথিবীচিন্তা ।
 পদাতিকুঞ্জরাশ্বানাং ধৰ্মকাৰ্য্যং প্রযতনতঃ ॥
 শূরাঃ প্রমুখ্যন্তী... স্কন্ধমাশ্চপ্রদর্শনম্ ।
 কৰ্তব্যং ভীৰুসঙ্কেন শত্রু বিদ্রাবকারকম্ ॥
 দারয়ন্তি পুরস্তাত্তু ন দেয়া ভীৰবঃ পুরঃ ।
 প্রীত্সাহয়ন্ত্যেব রণে ভীৰুন্ শূরাঃ পুরঃস্থিতাঃ ॥
 প্রাংশুশ্চ শুভনাসশ্চ যে চাজিহ্নে চণা নরাঃ ।
 সंहতভূয়ুগাশ্চৈব ক্রোধনা কলহপ্রিয়াঃ ॥
 নিত্যহৃষ্টা প্রহৃষ্টাশ্চ শূরা জ্ঞেয়াশ্চ কামিনঃ ।
 সंहতানাং হতানাশ্চ রণাপনয়নক্রিয়া ॥

প্রতियুদ্ধং গজানাঞ্চ তীর্থদানাদিকঞ্চ যত্ ।
 আয়ুধানয়নং চৈব পত্তিকৰ্ম বিধীয়তে ॥
 রিপূণাং ভেদুকামানাং স্বসৈন্যস্য তু রচণম্ ।
 ভেদনং সংহতানাঞ্চ চৰ্ম্মিণাং কৰ্ম কীর্তিতম্ ॥
 বিমুখীকরণং যুদ্ধে ধন্বিনাঞ্চ তথোচ্যতে ।
 দূরাপসরণং যানং সুনৃতস্য তথোচ্যতে ॥
 ভেদনং সংহতানাঞ্চ ভেদানাংসপি সংহতিঃ ।
 প্রাকারতীরণাট্টালদ্রুমভঙ্গস্য সঙ্গজৈঃ ॥
 পত্তিভির্বিষমা স্ত্রীয়া রথাস্বস্য তথা সমা ।
 সর্কর্দ্দমা চ নাগানাং যুদ্ধভূমিরুদাহৃতা ॥
 एवं বিরচিতব্যূহঃ কৃতপৃষ্ঠদিবাকরঃ ।
 তথানুলীমশুক্কার্কি দিক্‌পালী মৃদুমারুতঃ ।
 যীধানুত্সাহয়েত্ সৰ্ব্বান্ নাম গীচাদিনা ততঃ ॥”

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্যার্থ এই যে, ব্যূহমধ্যে
 যোদ্ধাদিগকে সংহত (অত্যন্ত একত্রিত) করিবেক না।
 বিরল অর্থাৎ অত্যন্ত ফাঁক থাকিতেও দিবেক না। অস্ত্র-
 সঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি
 না হয়, একরূপ ভাবে যোদ্ধাদিগকে পরিচালন করিবেক।

যখন পরসৈন্যের বা পরকৃতব্যূহের ভেদ করিবার
 ইচ্ছা হইবে, বা আবশ্যক হইবে, তখন সংহত হইয়া
 অর্থাৎ বহুসৈন্য একত্রিত হইয়া ও শ্রোতের ন্যায় হইয়া

ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্য-
দিগকে অর্থাৎ আপনার ব্যূহকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে,
তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে ।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ করিবে যে, ইচ্ছা করিলে, তাহা
ভিন্ন ভিন্ন (একটী ভাঙ্গিয়া বহু ব্যূহ) করা যাইতে পারে ।
অথবা পরব্যূহ ভেদ করা যাইতে পারে । অপিচ হস্তিসৈন্যের
চারিটী করিয়া পাদরক্ষক নিযুক্ত থাকিবেক, রথের জন্য
চারিটী অশ্বসৈন্য নিযুক্ত রাখিবেক, তাহাদের জন্য চারিটী
করিয়া চক্ষুধারী, তাহাদের রক্ষণার্থ তাহাদেরই সমান
ধনুধারী নিযুক্ত থাকিবেক । রণমুখে অর্থাৎ রণাগ্রে চক্ষু
অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যেরা (সম্মুখে) অবস্থান করিবেন ।

তাহাদের পশ্চাভাগে ধনুধারী সৈন্য থাকিবেক ।
ইহাদের পৃষ্ঠে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী
থাকিবেক । এবং রথারোহীর পশ্চাভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন
করিবেক ।

পদাতিসৈন্য, হস্তিসৈন্য ও অশ্বসৈন্য, ইহারা বিশেষ
যত্নের সহিত আপন আপন কর্তব্য করিবেন । যাহারা
শূর অর্থাৎ উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সকলের
সম্মুখভাগে দেওয়া কর্তব্য । অনেক ভীক একত্রিত হইলে
ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এ নিমিত্ত ভীকদিগকে সম্মুখে দিবেক
না এবং একত্রিত হইতেও দিবেক না ।

যাহারা শূর, তাহারা সম্মুখে থাকিবে । কেননা তাহারা ভীকুদিগকে, নির্ভীক ও উৎসাহিত করিতে পারে । এ নিমিত্ত শূরদিগকেই সম্মুখে স্থাপন করিতে হয় ।

শূরদিগের বাহ্যিক আকার ও লক্ষণ এই যে, যাহারা প্রাংগু অর্থাৎ দীর্ঘকায়, যাহাদের দৃষ্টি বক্র, যাহাদের ক্রয়ুগল সংহত, যাহারা ক্রোধনস্বভাব ও কলহপ্রিয়, যাহারা সর্বদাই হুষ্ঠ থাকে এবং বিপদকালেও যাহারা ক্ষুব্ধ হয় না, এমন সকল ব্যক্তিই শূর ।

হত হইলে, আহত হইলে, তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করা, হস্তিদিগকে পানাদি করান, অস্ত্রাদি আনিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কার্য্যসমূহ পদাতিদিগের কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে ॥

চক্ষুধারীরা শত্রুসৈন্যভেদ, সৈন্যের রক্ষা, সংহতদিগকে বিরল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি কার্য্য করিবেন এবং ধনুধারীরা শত্রুদিগকে বিমুখ করিবেন অর্থাৎ অগ্রসর হইতে দিবেন না এবং রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবেন ।

গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, ভেদের সংঘাত একত্রীকরণ এবং প্রাচীর, তোরণ ও অটাল প্রভৃতির ভঙ্গসাধন করা কর্তব্য ।

বিষম অর্থাৎ বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা,

সমতল স্থানে রথিসৈন্যের দ্বারা, জলকর্দমাদিযুক্ত স্থানে গজসৈন্যের দ্বারা যথাযোগ্য যুদ্ধ করা কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

এবম্প্রকারে, ব্যূহরচনাপূর্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাভাগে রাখিয়া এবং অনুকূল বায়ু ও অনুকূল গ্রহ অবলোকন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিবেক এবং নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্বক নানাপ্রকার উত্তেজক বাক্যে স্বসৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবেক ।

ব্যূহসেনা ও সেনাপতিগণ কিপ্রকারে সঞ্চরণ করিবেন ; কিরূপেই বা যুদ্ধ করিবেন ; তত্তাবৎবৃত্তান্ত শুক্রনীতির সপ্তম প্রকরণ দেখিলে জানা যায় । পাঠকগণের সুখ-বোধার্থ এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ; দেখিবেন, প্রচীন সৈনিক পুরুষেরা কিরূপে যুদ্ধকার্য্য নির্বাহ করিতেন ।

“ব্রূহরচনসঙ্কীতান্ বায়মাশাসমীরিতান্ ।

স্বসৈনিকৈর্বিদ্যা কীঃপি ন জানীয়াত্তথাবিধান্ ॥

নিযীজযেচ্ছ মতিমান্ ব্রূহান্ নানাবিধান সদা ।

অশ্বানাস্ত্র গজানাস্ত্র পদাতীনাং পৃথক্ পৃথক্ ॥

ভূমিঃ সংশ্রাবয়িব্রূহসঙ্কীতান্ সৈনিকান্ নৃপঃ ।

বামদক্ষিণসংস্থীবা মধ্যস্থো বায় সংস্থিতঃ ॥

শ্রুত্বা তান্ সৈনিকঃ কার্য্যমনুশ্লিষ্টং যথা তথা ।

সম্মীলনং প্রসারণং পরিভ্রমণমেব চ ॥

আকুञ্চনং তথা যানং প্রযাণমপযানকম্ ।

পর্য্যয়েন চ সাম্মুখ্যং সমুত্থানञ্চ লুণ্ঠনম্ ॥

সংস্থানञ্চাটদলবৎ চক্রবদ্বীলতুল্যকম্ ।

সূচীমুখং শকটবদর্দ্বচন্দ্রং সমন্তথা ॥

পৃথক্ ভবনমল্পাল্পৈঃ পর্য্যায়ৈঃ পঙ্ক্তিবেশনম্ ।

শস্ত্রাস্ত্রযৌর্ধারণञ্চ সম্মানং লক্ষ্যভেদনম্ ॥

মীচক্ণञ্চ তথা স্ত্রাণাং শস্ত্রাণাং প্রতিঘাতনম্ ।

দ্রাক্ সম্মানং পুনঃ পাতি গ্রহীমীচক্ণঃ পুনঃ পুনঃ ।

স্বগূহনং প্রতীঘাতঃ শস্ত্রাস্ত্রপদবিক্রমৈঃ ॥

দ্বাভ্যাং ত্রিভিষ্তুর্ভির্বা পঙ্ক্তিগমনং ততঃ ।

তথা প্রাগ্ ভবনং চাপসরণং তূপসর্জনম্ ॥

অপসৃত্যস্তুসিদ্ধার্থমুপসৃত্য বিমীচক্ণম্ ।

প্রাগ্ ভূত্বা মীচযেদস্তু ব্রূহস্তুঃ সৈনিকঃ সদা ॥

আসীনঃ স্যাদ্বিসুক্তাস্তুঃ প্রাগ্ বা চাপসরেত্পুনঃ ।

প্রাগাসীনং তূপস্তুতী দৃষ্টেপ্তাস্তুং বিমীচযেত্ ॥”

ব্রূহরচনার জন্য বাদ্য অথবা ভাষার সংকেত কল্পনা করিবেক। (অমুক প্রকার বাদ্য বাদিত হইলে অমুক ব্রূহ হইবেক অথবা অমুকশব্দ উচ্চারিত হইলে অমুক ব্রূহ করিতে হইবেক ইত্যাদি)। সেই সাঙ্কেতিক বাদ্য অথবা সাঙ্কেতিক ভাষা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই জ্ঞাত

থাকিবেক ; তাহা অন্য কেহ জানিতে না পারে—এরূপ নিয়মে করিবেক ।

বুদ্ধিমান রাজা অথবা সেনানায়ক বহুবিধ ব্যূহরচনা করিবেন । (উপযুক্ততা-অনুসারে) অশ্বসৈন্যের, হস্তিসৈন্যের ও পদাতিসৈন্যের পৃথক্ পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্মাণ করিবেন ।

রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহ-সঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন । ব্যূহের বামভাগে, অথবা দক্ষিণভাগে, এবং (সময় বিশেষে) মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাক্ষেতিক শব্দ করিবেন, যেন ব্যূহস্থ সমস্ত সৈনিকেই শুনিতে পায় ।

সৈনিকগণ সেই সেই সঙ্কেত ধ্বনি বা সাক্ষেতিক ভাষা শুনিয়া শিক্ষাকালে যেৰূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিবেন । সম্মীলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুখান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্ ভবন, (পঙ্ক্তি ছাড়া হওয়া), অগ্নে অগ্নে ও পর্য্যায়ক্রমে পঙ্ক্তি-প্রবেশ, ভিন্নভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্য-ভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রনিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদি-গ্রহণ, শীঘ্র অস্ত্রনিপাত, শীঘ্র অস্ত্রক্ষেপ, শীঘ্র আত্মরক্ষা

অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, অস্ত্রের দ্বারা, শস্ত্রের দ্বারা, অথবা পাদসঞ্চার দ্বারা আত্মরক্ষা ও পরকীয় সৈন্যের বা প্রহরীর প্রতিঘাত করা, দুই দুই জনে, তিন তিন জনে, কিংবা চারি চারি জনে একত্রিত হইয়া পঙ্ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা সম্মুখভাবে পলায়ন করা, পশ্চাদ্ভাগে সৈনিকগণের সঙ্কেত অনুসারে পলায়ন করা, অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কার্য পূর্বশিক্ষা অনুসারেই করিবেন, অন্যথাচরণ করিবেন না ।

ব্যুহস্থিত সৈনিক অস্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত (অব্যর্থতার নিমিত্ত) উপসরণ অর্থাৎ অগ্রে (সম্মুখে) ধাবিত হইবেন, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন ।

বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন অথবা পাছু হাঁটিয়া আসিবেন । বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবেন, তখনই অমনি তৎসমীপবর্তী হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন ।

শুক্রনীতি গ্রন্থে এইরূপ আশ্চর্য্য যুদ্ধকার্য্যসকল বর্ণিত হইয়াছে । অবশেষে কার্য্যসঙ্কট অনুসারে ক্রিয়া পরিবর্তন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । সে সকল ক্রিয়াকৌশল পর্যালোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন কার্য্য আর নাই । এই কার্য্যে যে কত মনোবল ও কত তৎপরতা লাগে, তাহা নির্ণয় করা যায় না । পূর্বে যে ক্রৌঞ্চ ও মকর প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ

করা হইয়াছে, শুক্রনীতি গ্রন্থে সে সকলের সঞ্চালন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ আছে । যথা—

“একৈকশী দিশীবাপি সঙ্কশী বোধিতী যথা ।
 ক্রৌচ্ছানাং খে গতির্যাটক্ পঙ্ক্তিতঃ সম্প্রজায়তে ।
 তাটক্ সচ্চারযেত্ ক্রৌচ্ছ বৃহৎ দেশবলং যথা ॥
 সুক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপচ্ছন্তু পঙ্ক্তিতঃ ।
 বৃহৎ পচ্ছং মধ্যগল পুচ্ছং শ্বেনং মুখেণ তু ॥
 চতুষ্পাশ্বকরী দীর্ঘাঃ স্থূলবক্ত্রীদ্বিরীষ্টকঃ ।
 সূচী সুক্ষ্মমুখীদীর্ঘাঃ সমদন্তান্तरম্ভ যুক্ত ॥
 চক্রব্যূহস্বৈকমার্গী ক্ষুদ্রা কুণ্ডলীকৃতঃ ।
 চতুর্দ্বিচ্ছুপরিধিঃ সর্বতীভদ্রসংজ্ঞকঃ ॥
 অমার্গী স্বাঘবলযৌগীলকঃ সর্বতীমুখঃ ।
 শকটঃ শকটাকারী ব্যালী ব্যালাকৃতিঃ সদা ॥
 সৈন্যমল্পং বৃহৎবাপি বৃহৎ মার্গং রণস্থলম্ ।
 বৃহৎবৃহৎ বৃহৎবৃহৎ সাঙ্কর্য্যেণাপি কল্পয়েত ॥”

রাজা অথবা সেনাপতি যেমন সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে, না হয় দুই দুই জনে, কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঙ্করণে প্রবৃত্ত হইবেন । বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, দেশ (যুদ্ধস্থান) ও সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া, সেইরূপ ক্রমে ক্রৌঞ্চব্যূহ সঞ্চালন করিবেন । (কৌঞ্চ অর্থাৎ

বক । ইহা তৎপঙ্ক্তি সঙ্করণের ন্যায় সঙ্কারিত হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চ) ।

পঙ্ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল অর্থাৎ বিস্তীর্ণ করা আবশ্যিক । শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর তুল্য ।

মকরব্যূহ চতুষ্পদাকার, বক্তৃদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ । হৃচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদন্তাকার, এবং রক্তযুক্ত ।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটি, ৮টি কুণ্ডলাকৃতি পঙ্ক্তির দ্বারা বেষ্টিত । সর্বতোভদ্র ব্যূহের চতুর্দিকে ৮ পরিধি, এতাবন্মাত্র বিশেষ আছে । ইহার প্রবেশযোগ্য দ্বার নাই, বলয়াকৃতি ৮ পঙ্ক্তির দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল । সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে ।

শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার, এইরূপ অন্যাগ্ৰ ব্যূহও অন্যান্য জন্তুর আকারবিশিষ্ট ।

সৈন্য অল্প কি অধিক, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, রণভূমি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিয়া, সঙ্করণের পথ কিরূপ তাহা দেখিয়া, হয় একটী, না হয় দুইটী অথবা ৩৪টী ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রণভূমি, সৈন্যভ্রমণের পথ,— ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হয় কোন নির্দিষ্টব্যূহ রচনা করিবেক, অথবা সঙ্কর বা মিশ্র ব্যূহ নিৰ্ম্মাণ করিবেক ।

বৃহৎসম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কথা মহাভারতের টীকায় সংগৃহীত আছে । বিস্তার ভয়ে সে সকল উল্লেখ করিলাম না । ফল, যাহা বলা হইল, তদ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন যুদ্ধপ্রণালীর এক প্রকার সামান্য ছবি প্রদর্শিত হইল । অতঃপর আমরা ধর্মযুদ্ধ ও কূটযুদ্ধের কতিপয় নিয়ম বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব ; সম্প্রতি দুর্গ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা যাউক ।

দুর্গ ।

রাজাদিগের বহু শত্রু, পররাজ্যের সহিত তাঁহাদের সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভব, এনিমিত্ত তাঁহাদের এক একটা অন্যের দুর্গম্য স্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক । সেই সকল দুর্গম্য ও দুর্ভেদ্য স্থানের নাম “দুর্গ” । ইহা তাঁহাদের একটা প্রধান সম্পদ, এনিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের ষষ্ঠ সম্পদের মধ্যে দুর্গকে প্রধান সম্পদ বলিয়া গণনা করিয়াছেন ।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কামন্দক, ভোজ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ-শাস্ত্র-উপদেষ্টৃগণ দুর্গ সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া তাহার নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়াছেন । বিশ্বকর্মসংহিতা ও রাজবল্লভ প্রভৃতি সমুদায় বাস্তুশাস্ত্রে

ইহার নির্মাণবিধি ও স্থান পরীক্ষা প্রভৃতি লিখিত আছে ।
রাজ্য, রাজধানী ও দুর্গস্থাপন বিষয়ে কামন্দকোক্ত স্থান
পরীক্ষা এতৎপ্রস্তাবের প্রথমে সংগ্রহ করা হইল ।

১ম, স্থান-পরীক্ষা ।

“ভূগুণৈর্বর্দ্ধতে রাষ্ট্রং তদৃষ্টদ্বির্নৃপদ্বয়ে ।

তস্মাত্ গুণবর্তীং ভূমিং ভূত্যে ভূপস্তু কারয়েত ॥”

“সম্যাকরবতী পুণ্যা খনিদ্রব্যসমন্বিতা ।

গৌহিতা ভূরিসলিলা পুণ্যৈর্জনপদৈর্হিতা ॥”

“রম্যা সত্কুল্লরবনা বারিস্থলপথান্বিতা ।

অদেবমাটকা চেতি শস্যতে ভূর্বিভূতয়ে ॥”

(কামন্দক ।

স্থানের গুণে রাজার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং রাজ্য-
সম্পত্তির বৃদ্ধিতেই রাজার উন্নতি হয় ; এজন্য রাজা
আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রথমতঃ গুণবর্তী ভূমি গ্রহণ
করিবেন । কিরূপ ভূমি গুণবর্তী ? তাহা বলা যাইতেছে ।

যে স্থান শস্যশালিনী, যে স্থানে আকর আছে, যে
স্থান অতি পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র (স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য),
যে স্থানে খনি আছে, যে স্থানে ব্যবহার্য্য দ্রব্য সুলভ,
যে স্থান গো ও অশ্ব প্রভৃতি বহু পশু রাখিবার উপযুক্ত,

যে স্থানে জলকষ্ট নাই, যাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ আছে, যে স্থান সুন্দর অর্থাৎ রমণীয়, যে স্থানে বা যাহার নিকটস্থ বনে হস্তী পাওয়া যায়, ও যাহার নিকটে বন আছে, যে প্রদেশে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই বিদ্যমান, যে দেশ দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ যে দেশের শস্ত্র উৎপাদন করিতে কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিতে হয় না, এক্ষণে দেশে উক্তবিধ স্থানই রাজা-দিগের পক্ষে প্রশস্ত ।

২য়, নিষিদ্ধদেশ ও স্থান ।

“সম্বর্জয়া সমাধাণা সাত্বী নিত্যনস্করা ।

রুদ্রা সকলকবনা সব্রালা চিতি ভূরভূঃ ॥”

যে স্থানে অত্যন্ত কাঁকর, অত্যন্ত প্রস্তর, নিবিড় বন, সর্বদাই দস্যুভয়,—সে স্থান উত্তম নহে । যে স্থান রুক্ষ অর্থাৎ ৮ ও ৭ জলসেক করিলেও উত্তম শস্য হয় না, যে স্থানে কণ্টক বন নিবারিত হয় না, যে প্রদেশে অধিক সবিষ সর্প জন্মে, সে স্থানও বাসের ও দুর্গের অযোগ্য ।

কামন্দকি আরও বলিয়াছেন যে,—

“মাজীষী ভূগুণৈর্যুক্তাঃ সানুদাঃ পর্বতাস্রয়ঃ ।

শুদ্র কারু বণিক্ প্রায়ী মহারম্ভঃ কৃষীবলঃ ॥

সানুরাগী রিপুদ্বেষী পীড়াकरसहः वृथः ।

নানাদেশ্যৈঃ সমাকীর্ণা ধার্মিকৈঃ পশুমান্ ধনী ॥

তং বর্দ্ধयेत् প্রযত্নে ন তস্মাত্ সৰ্ব্বং প্রবৰ্ত্ততে ॥”

যে দেশে কক্ক (শূরণ ও আলু প্রভৃতি) মূল ও ফল প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যে দেশ পূর্বোক্ত গুণযুক্ত, যে দেশ আনুপ অর্থাৎ যে দেশে প্রচুর জল আছে, যে সকল দেশ পর্বত আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত, যে দেশে দাস, দাসী, শিল্পী ও বাণিজ্যকারী লোক অধিক, যে দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মহা উদ্যোগী, যে দেশের লোক সকল স্বভাবতঃই প্রভুর প্রতি অনুরাগী ও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ্টা, যে দেশের লোকেরা কষ্টসহ ও করভার বহনে কষ্টবোধ করে না, যে দেশের লোকেরা বলবান্, যে দেশ নানাদেশীয় লোকে সমাকীর্ণ, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই ধার্মিক, পশুপোষণকারী ও ধনশালী, রাজা এরূপ দেশ যত্ন পূর্বক রক্ষা করিবেন। যে হেতু তাদৃশ দেশ হইতেই রাজার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

৩ য, রাজপুরী ও দুর্গবাস ।

“বৃথুসীমমহাখাতমুস্বপ্রাকারগীপুরম্ ।

“সমাবসেৎ পুরং শৈলং সরিন্দ্রবনাস্রয়ম্ ॥”

চতুঃপাশ্বে মহাখাত (গড়কাটা), তৎপ্রান্ত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ দ্বার,—রাজা একরূপ পুরে বাস করিবেন । নিকটে কোন পর্বত, কি নদী, বন অথবা ভূমি থাকিলে ভাল হয় । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন যে,—

“রম্যং পশ্যন্ত্য মাজীবং জাঙ্গলং দৈশমাবসেৎ ।

নন্দ্র দুর্গাণি কুব্জানি জনকীষাভ্যগুপ্তযে ॥”

রমণীয়, পশু পোষণের উপযুক্ত, বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ভূমি, জল ও পর্বতশালী,—রাজা একরূপ দেশে বাস করিবেন ; এবং তাদৃশ স্থানে স্বজন বর্গ, ধনাগার ও আত্মরক্ষার্থ দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিবেন ।

মহর্ষি মনু দুর্গবাসের উপকারিতা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন । যথা—

“একঃ শতং যৌধয়তি প্রাকারস্থৌধনুর্ধরঃ ।

শতং দশ সহস্রাণি তস্মাদ্ভির্গং সমাস্রযেৎ ॥”

যে হেতু এক যোদ্ধা দুর্গ প্রাকারে অবস্থিত থাকিয়া শত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং শত যোদ্ধা, দশ সহস্র যোদ্ধাকে পরাভব করিতে পারে, এই হেতু রাজারা দুর্গ আশ্রয় করত বাস করিবেন ।

৪র্থ, দুর্গের সংখ্যা ও প্রকারভেদ ।

দুর্গ অনেক প্রকার । তন্মধ্যে মনুর মতে ৭, কামন্দকীর মতে ৯ নববিধ দুর্গই প্রধান । মহর্ষি মনু প্রাধান্য ক্রমে ৭ প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু কামন্দক ও মহর্ষি ব্যাস তদপেক্ষা দুইটী অধিক দুর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন । মনু-মতানুযায়ী সপ্ত দুর্গ এই—

“ধন্বদুর্গ মহীদুর্গ মব্দুর্গ বান্ধমেব চ ।

নৃদুর্গ গিরিদুর্গস্ব সমাশ্রিত্যবেসত্ পুরম্ ॥”

যাহার নিকটবর্তী দিক সমূহে জলবর্জিত স্থান অর্থাৎ মরু ভূমি বিদ্যমান আছে, তাদৃশ দুর্গের নাম ধন্ব দুর্গ । মহীদুর্গ অর্থাৎ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত দুর্গ । অবদুর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ । যাহার নিকটবর্তী দিক সমূহে মহাজল বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জল দুর্গ । বৃক্ষের দ্বারা রচিত দুর্গ বিশেষের নাম বান্ধ দুর্গ ; যাহার চতুর্দিক নিবিড় দুশ্ছেদ্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত তাহাই বান্ধ দুর্গ । নৃদুর্গ অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে বহুতর বীরমনুষ্য বাস করে । গিরিদুর্গ অর্থাৎ দুরারোহ পর্বত যাহার চতুর্দিকে আছে । মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন ; পরন্তু কামন্দকী এতদপেক্ষা ঐরিণ নামক আর একটী অতিরিক্ত দুর্গের কথা বলিয়াছেন । যথা—

ঔদকং পার্বতং বান্ধুং মৈরিণং ধন্বমানবম্ ।

প্রশস্তং শাস্ত্রমতিভিঃ দুর্গং দুর্গোপচিন্তকৈঃ ॥”

ঔদক অর্থাৎ জলদুর্গ । পার্বত অর্থাৎ গিরিদুর্গ । বান্ধু অর্থাৎ বন্ধুরচিত দুর্গ । মৈরিণ অর্থাৎ উষরস্থানরূপ দুর্গ । ধন্ব অর্থাৎ জলবর্জিত দুর্গ । মানব অর্থাৎ বীর মনুষ্য বেষ্টিত দুর্গ । মহাভারতেও ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মহীদুর্গ ও মৃদুর্গ এই দুইটির ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা—

“ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈব চ ।

মনুষ্যদুর্গং মৃদুর্গং মম্বুদুর্গঞ্চ তানি ষট্ ॥”

এই শ্লোকে মহীদুর্গ ও মৃদুর্গ এই দুইটি পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যাহা স্বাভাবিক মৃত্তিকাচিত স্থান, তাহাই মহীদুর্গ এবং যাহা মৃত্তিকার দ্বারা, ইষ্টকের দ্বারা কি প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গম স্থান, তাহাই মৃদুর্গ । নীতি ময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, “মৃদুর্গমিতি মার্শিকং পাষাণং ঔদকং বা” মৃদুর্গ ৩ প্রকার,—মৃত্তিকানির্ম্মিত, পাষাণ রচিত ও ইষ্টকগ্রথিত । লিখিত বচনগুলির দ্বারা সর্ব সমেত নববিধ (৯ প্রকার) দুর্গের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে । তদ্যথা—

ধ্বজদুর্গ	...	১	}	ইহা অকৃত্রিম মৃত্তিকাচিত ও কৃত্রিম মৃত্তি নিৰ্মিত এতদ্রূপে দ্বিবিধ । মৃত্তি দুর্গের আবার প্রস্তর নিৰ্মিত ও ইষ্টক নিৰ্মিত এই দুই প্রকার প্রভেদ আছে ।
মহীদুর্গ	...	২		
জলদুর্গ	...	১		
বক্ষদুর্গ	...	১		
		৫		

নৃদুর্গ	...	১	}	ইহা বীরগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকা এবং সৈন্য রচনার দ্বারা বেষ্টিত থাকা, এই দুই প্রকার ।
গিরিদুর্গ	...	১		
		২		

বন্ধুদুর্গ	...	১	}	শূর ও আত্মীয়গণের গৃহের দ্বারা বেষ্টিত থাকা ও প্রান্তর বেষ্টিত থাকা ।
ঐরিণদুর্গ	...	১		
		২		

এই নববিধ দুর্গের মধ্যে মহীদুর্গের দ্বিতীয়টি অর্থাৎ
মৃদুর্গটি আবার ৩ প্রকার । স্তূপীকৃতমৃত্তিকারাবেষ্টিত,
প্রস্তরপ্রাকারবেষ্টিত, এবং ইষ্টকপ্রাকারবেষ্টিত । অপর, নৃদুর্গ
অর্থাৎ মনুষ্যদুর্গও দ্বিবিধ । বন্ধু দুর্গ ও ইতর মনুষ্য
দুর্গ । নীতি-ময়ুখে এই মনুষ্যদুর্গের নিম্নলিখিত লক্ষণ ও
ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে ।

“বন্ধুদুর্গ নাম সীদরাহি বন্ধুনা রাজগৃহস্য পরিতঃ স্থানানি ।
এবং বন্ধু দুর্গসম্মখে ইতর মনুষ্য দুর্গ ন কুর্বাতি ।”

ভ্রাতৃ প্রভৃতি বীর ও অন্তরঙ্গ স্বজনগণের দ্বারা বেষ্টিত

রাজ পুরীর নাম বন্ধুদুর্গ । বন্ধু বান্ধব না থাকিলে বীর পুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজ পুরীকে সামান্যতঃ মনুষ্য দুর্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায় । পরন্তু যে স্থলে বন্ধুদুর্গের সম্ভাবনা থাকে—সে স্থলে ইতর মনুষ্য দুর্গ করা কর্তব্য নহে ।

অমুরাচার্য্য উশনা স্বকৃত নীতিসার গ্রন্থে উল্লিখিত দুর্গ সমূহের পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন । যথা—

“ষষ্ঠ’ দুর্গপ্রকরণং প্রবক্ষ্যামি সমাস্ততঃ ।
 খাত কণ্টক পাশাণৈর্দুষ্যং দুর্গমৈরিণম্ ॥
 পরিতলু মহাখাতং পারিখং দুর্গমেব তত্ ।
 ইষ্টকোপলমৃদ্ধিত্তি প্রাকারং পারিঘং স্মৃতম্ ॥
 মহাকণ্টক বৃক্ষৌঘৈর্য্যাপ্তং তদ্বন দুর্গমম্ ।
 জলাभावस्तু পরিতী ধন্বদুর্গং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 জলদুর্গং স্মৃতং তজ্জলৈ রাসমন্তাত্ মহাজলম্ ।
 সবারিষ্টষ্টীচ্ছগৃহং বিবিক্তৈ গিরিদুর্গমম্ ॥
 অশ্বেদ্যং অহবিদমিৰ্যত্ ব্যাপ্তং তত্ সৈন্যদুর্গমম্ ।
 সহায়দুর্গং তজ্জলৈ যং শূরানুকূলবান্ধবম্ ॥”

আমি তোমাদিগকে দুর্গনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর । খাত, কণ্টক ও পাশাণাদির দ্বারা দুর্গম স্থানের নাম ঐরিণ দুর্গ । যাহার চতুর্দিকে মহাখাত, তাদৃশ দুর্গের নাম পারিখ দুর্গ । ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা প্রাচীর দিলে তাহার নাম পারিঘ দুর্গ । মহাকণ্টকযুক্ত

বৃক্ষের দ্বারা (বেউড় বাঁস প্রভৃতির দ্বারা) চতুর্দিক ব্যাপ্ত থাকিলে তাহা বনদুর্গ বা বৃক্ষদুর্গ। দুর্গের চতুর্দিকে অধিক দূর পর্যন্ত জলবর্জিত স্থান থাকিলে তাহা ধনুদুর্গ হইবে। চতুর্দিকে মহাজল (বৃহৎনদী কি সমুদ্র), তন্মধ্যে দুর্গ, এরূপ হইলে তাহা জলদুর্গ। মনুষ্যবাস বর্জিত সজল প্রদেশে অথবা পর্বত পৃষ্ঠোপরি অত্যুচ্চ গৃহ সমূহকে গিরিদুর্গ বলা যায়। ব্যূহ (সৈন্য বিহীন) বেত্তা বীর সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিলে তাহাকে সৈন্যদুর্গ বলা যায়। বীর বন্ধু বান্ধব অনুকূল থাকিলে তাহা সহায় দুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ ও সহায়দুর্গই শ্রেষ্ঠ। দুর্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু ও কামন্দক বলিয়াছেন যে,—

সর্বেন তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাপ্রযেত ।

এতেষাং বাজগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিখ্যতে ॥”

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গই বহুগুণে উৎকৃষ্ট; অতএব রাজা প্রযত্নের সহিত গিরিদুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। এবিষয়ে শুক্লাচার্য্য বলিয়াছেন, যে,—

“দারিখাদৈরিখং শ্রেষ্ঠং দারিঘন্তু ততীবনম্ ।

ততীধন্ব জলং . তস্মাদ্গিরিদুর্গং ততঃ স্মৃতম্ ॥

সহায়স্যেন্যদুর্গে হ্রীসর্বদুর্গপ্রসাধকী ।

তাভ্যাং বিনাঃনদুর্গাণি নিষ্ফলানি মহীমুজাম্ ॥

শ্রেষ্ঠন্তু সর্বদুর্গেভ্যঃ সেনাদুর্গং স্মৃতং বুধৈঃ ।

তত্সাধকানি চান্যানি তদ্রত্নপতিঃ সদা ॥

সেনাদুর্গন্তু যস্য স্যাৎ তস্য বশ্যা তু ভূরিযম্ ।

বিদ্যা তু সেনাদুর্গে ন দুর্গমনন্তু বন্দনম্ ॥

আপত্ কালো সেনাদুর্গানামাত্মস্বীচমীমতঃ ।”

পারিথ দুর্গ অপেক্ষা ঐরিণ দুর্গ শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা পারিষ দুর্গ উত্তম । পারিষ অপেক্ষা বনদুর্গ অর্থাৎ বৃক্ষদুর্গ ভাল । বৃক্ষদুর্গ হইতে ধন দুর্গ এবং ধন অপেক্ষা জলদুর্গ উৎকৃষ্ট । জলদুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন সহায়দুর্গ ও সৈন্তদুর্গ এই দুই দুর্গ সকল দুর্গের সাধক ; এবং ঐ সকল দুর্গের মধ্যে সৈন্তদুর্গই শ্রেষ্ঠ । অত্যাগ্রে যে কোন দুর্গ সমস্তই সৈন্তদুর্গের দ্বারা সাধিত হয় । একারণ রাজা যত্নপূর্ব্বক, সদাসর্ব্বদা সৈন্তদুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । যে রাজার সৈন্তদুর্গ উৎকৃষ্ট থাকে ; এই পৃথিবী তাহারই বশীভূত হন । সৈন্তদুর্গ না থাকিলে, অন্যান্য সমস্ত দুর্গই বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে । অন্যান্য দুর্গ কেবল বিপদকালের আশ্রয়, এজন্য তাহাও উত্তম বলিয়া গণ্য । দুর্গ সম্বন্ধে মনু অত্র এক কথা বলিয়াছেন । যথা—

“তত্সাদাযুধসম্পন্নং ধনধান্যাস্ত্রবাহনৈঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনীদকেশ্বনৈঃ ॥”

দুর্গ সকল অস্ত্র সম্পন্ন থাকা আবশ্যিক । ধনধান্য (আহারীয় দ্রব্য) ও অশ্বাদি বাহন তাহাতে রক্ষা করিবেন ।

ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী সমূহ), শিল্পী, বিবিধ যন্ত্র, যবস অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ভক্ষ্য, জল (পুষ্কর্ণী প্রভৃতি), ও কাষ্ঠ থাকা অত্যাবশ্যক।

মহাভারতেও প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

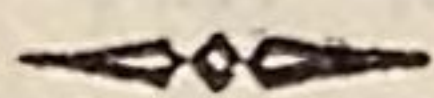
“শূরান্নজলসম্পন্ন ব্রহ্মঘীষানুনাহিতম্।

বহ্ন্যামাত্যবলী রাজা নত্পুরং স্বয়মাবিষ্ণেত ॥”

শূর অর্থাৎ বীরপুরুষে পরিপূর্ণ, বেদশক্কে নিনাদিত, বশীভূত অমাত্য ও সৈন্য সমূহে পরিপূর্ণ, এতাদৃশ পুরে রাজা অমাত্য সহ বাস করিবেন।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি দুর্গের উল্লেখ করা হইল, তৎসমস্তের মধ্যে মৃদুর্গই প্রায় প্রচলিত ও বিশেষ কৃত্রিম। আজি-পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভিত্তির দ্বারা প্রস্তর ভিত্তির দ্বারা ও ইষ্টক ভিত্তির দ্বারা দুর্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সেই সকল দুর্গ কিরূপ কৌশল সম্পন্ন তাহা আমরা উত্তমরূপে জানি না। পরন্তু পুরাতন কালের দুর্গনির্মাণবিধি পর্য্যালোচনা করিলে আধুনিক দুর্গগুলির ব্যবস্থা কৌশল অল্পপরিমাণে বোধগম্য করা যায়। রাজবল্লভ নামক বাস্তুশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ জন্ত তাহার কতক অংশ আমরা প্রবন্ধাকারে অত্র এক গ্রন্থাবয়বে প্রকাশ করিব।

যুদ্ধ-ধর্ম ।



প্রাচীন ভারতের সকল কার্যেই ধর্ম-সংযোগ ছিল। আহা করিবে তাহাতেও ধর্ম, ব্যবহার করিবে তাহাতেও ধর্ম, বিহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম, যুদ্ধ করিবে তাহাতেও ধর্ম। কোন কার্যই অধর্মপূর্বক করা বিধেয় নহে; সকল কার্যই ধর্মপূর্বক করা কর্তব্য, এইরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস পূর্বাচার্য দিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ যে এত নৃশংসের কার্য, পূর্বকালে তাহাও ধর্মের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মানুষ মারিব, কিন্তু ধর্ম বা নিয়মপূর্বক মারিব, —এরূপ ইচ্ছা, এরূপ নিয়ম, এরূপ অভিসন্ধি, এরূপ সতর্কতা, —ভাবিয়া দেখিলে উহা বীরসমাজের ভূষণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কুরুক্ষেত্রে সর্বান্তকর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, —কুরু পাণ্ডব-সৈন্য পূর্ণ উৎসাহে পরস্পর পরস্পরের বধার্থ উদ্যোগ করিল, —যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ধর্মনিয়ম প্রচার করাও হইল। উভয়পক্ষ হইতেই ধ্বনিত হইল যে আমরা অধর্ম বা

অন্যায় পূর্বক যুদ্ধ করিব না ; আরম্ভ-যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে ; দিন দিন দৈনিক যুদ্ধের অবসানে রাত্ৰিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিত থাকিবে ; তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়চরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না । বাক্যযুদ্ধকালে বাক যুদ্ধই হইবে, অস্ত্রযুদ্ধকালে অস্ত্রযুদ্ধই হইবে । পলায়িত ব্যক্তিকে ও ব্যূহ-চ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না । রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারূঢ়ের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারূঢ়ের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধ করিবে, তাহাতে কেহ প্রতি-কূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না । অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করা হইবে । বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না । নিরস্ত্র হইলে, বর্ম্মরহিত হইলে, কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না । সারথি, ভার-বাহী, শস্ত্রনেতা দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা হইবে না । ভারত যুদ্ধে ইত্যাদি প্রকার অদ্ভূত যুদ্ধধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল ।

যুদ্ধে কি প্রকার কার্য্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহা মনুসংহিতা, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শাস্ত্র-ধর, নীতিপ্রকাশিকা ও গুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে । যথা—

ন চ হন্যাৎ স্থলারুঢ়ং ন ক্লীবং ন ক্রতাজ্জলিঙ্গম্ ।
 ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥
 ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্ ।
 নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥
 ন ভীতং ন পরাভূতং সত্যং ধর্মমনুষ্মরন্ ॥”

(নীতিমযুগ্মধৃত মনুবচন ।)

যে ব্যক্তি যান হইতে অবতরণ করিয়াছে, স্থলারুঢ় হইয়াছে, তাহাকে আঘাত করা বিধেয় নহে। ক্লীবকে আঘাত করা কর্তব্য নহে। যে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে প্রহার করা কর্তব্য নহে। মুক্তকেশ ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি “আমি তোমার শরণাগত হইলাম,” বলে, তাহাকে বধ করিতে নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিকে, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদ রহিত ব্যক্তিকে, নগ্ন ব্যক্তিকে ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে, যে অপরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, যে ভয়বিহ্বল হইয়াছে, যে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, যে পশ্চাছুখ হইয়াছে, সাধুদিগের ধর্ম মনে করিয়া এই সকল ব্যক্তিকেও আঘাত করা কর্তব্য নহে।

“বৃদ্ধী বালী ন হন্যাত্মী নৈব স্ত্রী নৈব যৌ দ্বিজঃ ।

হৃৎপূর্ণমুখস্বৈব বনাস্মীতি চ যৌ বদেৎ ॥”

বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, এবং যে ভূণ মুখে করিয়া “আমি তোমার” এইরূপ কথা বলে, তাহাকে কোনক্রমেই বিনাশ করা কর্তব্য নহে ।

মহর্ষি বৈশম্পায়নও স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে উক্ত প্রকার উপদেশ করিয়াছেন । যথা—

“ন কূটৈরাযুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানী রণে রিপূন্ ।
 দ্বিগ্ধৈরন্যুত্থৈরস্তৈর্যন্তৈস্বৈব পৃথক্বিধৈঃ ॥
 ন হন্যাৎচক্ষমারুঢ়ং ন ক্লীবং ন ক্রুতাজ্জলিন্ ।
 ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥
 ন প্রসুপ্তং ন প্রণতং ন নগ্নং ন নিরাযুধম্ ॥
 নাযুদ্বমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ।
 আযুধব্যসনং প্রাপ্তং নান্নং নান্দিপরিচ্ছতম্ ॥
 ন হীনং ন পরাভূতং ন চ বল্লমীকমাশ্রিতম্ ।
 ন মুখে ত্বণিনং হন্যাৎ ন স্ত্রীযৌবেশধারিণম্ ॥
 এতাৎশান্ ভট্টৈর্বাপি ঘাতয়ন্ কিলিুষী ভবেৎ ॥”

নীতি প্রকাশিকার এই সকল বচন অতি সরল শব্দে গ্রথিত আছে । বিশেষতঃ এ গুলির অর্থ প্রায় পূর্বোক্ত বচনাবলীর দ্বারায় গতার্থ হইয়াছে । ফল, প্রথমোক্ত কূটান্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে শতদ্বী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রগুলিকেই প্রধান কল্পে গণ্য করিতে হয় ।

এক্ষণকার কামান্-যুদ্ধ অত্যন্ত কূট । কামানের ন্যায় কূটাস্ত্র আর কিছুই নাই ও ছিল না ।

আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্বকালে কামানের ন্যায় অথবা অন্য এক আকারের কামান ছিল কিন্তু তদ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না । কামানের দ্বারা যুদ্ধ করায় অধর্ম হয় এবং উহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই এইরূপ বোধ থাকাতেই তৎকালের ক্ষত্রবীরেরা কামান কি কোনরূপ যন্ত্রাগ্নির দ্বারা মনুষ্য বধ করিতে উৎসাহী হইতেন না । মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে,—

“নাবল্লুপ্তং পীড়য়েচ্ছ শত্রীঃ প্রকৃতয়ঃ স্বয়ম্ ।

বর্ষে জাতঃ পুনস্তাস্য পিতৃবৎকৃতিমাচরেৎ ॥”

শত্রু যতকাল না বশীভূত হয়, ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্যদিগকে পীড়িত করিবেক এবং তাহার ধনও লুণ্ঠন করিবেক ; পরন্তু সে যখন বশীভূত হইবেক, তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিবেক না, প্রত্যুত তাহাকে পিতৃবৎ অর্থাৎ পিতাকে যেমন বৃত্তি প্রদান করিতে হয় সেই রূপ তাহাকেও বৃত্তি প্রদান করিবেক ।

ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে মনুর উক্তি এইরূপ । যথা :—

“সমীচমাধর্মৈরাজা লাজ্জনঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।

ন নিবর্তেৎ সংগ্রামাৎ চরধর্মমনুস্মরন্ ॥”

“আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তী মহীচ্ছিতঃ ।

যুধ্যমানাঃ পরং শক্নুয়া স্বৰ্গং যান্ত্যপরাভ্ৰমুখাঃ ॥”

প্রজা পালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্তৃক সংগ্রামে আহত হইলে, ক্ষত্রধর্ম্ম অরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু রাজগণ সমধিক শক্তি অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা পরাভূত না হন, তাহারা স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন।

উৎসাহ বাক্য ।

যুদ্ধকালে রাজা ও সেনানায়ক উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোদ্ধগণকে উত্তেজিত করিবেন। ওজো-বাক্য বা উৎসাহ বাক্য কিরূপ তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে অধিক পরিমাণে আছে। নীতিপ্রকাশিকা প্রভৃতি রাজনীতিগ্রন্থেও আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় সকল পাঠকেরই জানা আছে, এজন্য আমরা নীতিগ্রন্থের উদাহৃত কতিপয় ওজো-বাক্য আহরণ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। যথা—

দ্বৈপায়নেন মুনিনা মনুনা চ ধর্মা

যুদ্ধেষু যি নিগদিতা বিদ্ভিতাস্ত তে বঃ ।

স্বাম্যর্থ গো দ্বিজহিতৈ ত্যজতাং শরীরং

लोका भवन्ति सुलभा विपुलं यशश्च ॥” ॥

“तपस्त्रिभिर्व्या सुचिरेण लभ्यते
प्रयत्नतः सत्रिभिरिज्यया च या ।
व्रजन्ति ता माशुगतिं मनस्विनी
रणाश्वमेधे पशुतामुपागताः ॥” ॥ १ ॥

“स्वर्गस्य मार्गा वहवः प्रदिष्टाः
ते कृच्छ्रसाध्या कुटिलाः सविघ्नाः ।
निमेषमात्रेण महाफलोऽयं
सुखश्च पन्थाः समरे व्यसुत्वम् ॥” २ ॥

“संरक्ष्यमानामपि नाशमुपैत्यवश्यं
एतच्छरीरमपहाय सुहृत् सुतार्थान् ।
तत् किं वरं प्रलपतां सदृशां समक्षम्
किं निघ्नतः परवलं भृकुटीमुखस्य ॥” ३ ॥

“हा तात मातेति च वेदनार्त्तः
किरन् सल्लभू च कफानुलिप्तः ।
वरं मृतः किं भवने किमाजौ
सन्दृष्टदन्तच्छदभीमवक्त्रः ॥” ४ ॥

“यस्य तपो न जनाः कथयन्ति
नीमरणं समरे विजयं वा ।
न श्रुतं दानं महाधनता वा

तस्य भवः कृमिकीटसमानः ॥” ४ ॥

“लोकः शुभस्तिष्ठतु तावदनः
पराङ्मुखानां समरेषु पुंसाम् ।
पद्मोऽपि तेषां न ह्रिया सुखानि
पुरः सखीनामवलोकयन्ति ॥” ५ ॥

“शत्रु सैन्यमवदार्य वर्त्ततां
यत्सुखन्तु कथयामि तादृशम् ।
शृण्वतां स्वयशीसोपपन्नवान्
द्विग्वधू वदनवर्णपूरकान् ॥” ७ ॥

निपतति शिरसि द्विपस्य सिंहः
स्वतनुशताधिकमांसराशि मूर्तिः ।
पिवति च तदसृङ्मदेष्टगन्धं
वदनगतांश्च शनैः प्रमृज्य सुक्तान् ॥” ८ ॥

“चित्रं किमस्मिन् वद साहसं वा
यत् स्वामिनोऽर्थे गणयन्ति नासून् ।
युद्धात् प्रनष्टो विदितोऽरिमध्ये
यद्वालिशस्तिष्ठति साहसं तत् ॥” ९ ॥

“यदि समरमपास्य नास्ति सृत्यो
भयमिति युक्तमतो न प्रतः प्रयातुम् ।
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः

কিমিতি মুখা মলিনং যম্মঃ ক্রুদ্ধম্ ॥” ১০ ॥

১। যোদ্ধাগণ ! তোমারা ব্যাসের ও মনুর কথিত যুদ্ধধর্ম জ্ঞাত আছ। প্রভুর জন্ত, গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত ও ব্রাহ্মণের জন্ত যাহারা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করে, তাহাদের স্বর্গলোক সুলভ ও বিপুল যশোলাভ হয়।

২। তপস্বীগণ যাহা দীর্ঘকাল তপস্যার পর প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞিকেরা যাহা যত্নসাধ্য যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেন, প্রশস্ত-চেতা বীরগণ যুদ্ধরূপ অশ্বমেধের পশু হইয়া তাহা ক্ষণকাল মধ্যে লাভ করিয়া থাকেন।

৩। ঋষিগণ স্বর্গগমনের বহুবিধ পথ উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু সে সকল পথ অতিশয় কষ্টগম্য, কুটিল ও বিঘ্নপরিপূর্ণ; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগরূপ পথটী ঋতু ও মহাফলদায়ক। আরও সুগমতা এই যে, এই পথের পথিক এক নিমেষের মধ্যেই স্বর্গগমন করেন।

৪। এই ভৌতিক শরীর যত্নপূর্বক রক্ষা করিলেও ইহা রক্ষিত হইবে না। অবশ্যই ইহার পতন বা বিনাশ হইবে। অবশ্যই ইহা বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ও ধন,—এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এমত স্থলে বল দেখি, রোরুদ্যমান বন্ধুগণের চক্ষের উপর ইহার পতন ভাল? কি শত্রুবলবিনাশকারী অকুটীবদ্ধমুখ বীরপুরুষের সমক্ষে ইহার বিনাশ হওয়া ভাল?

৫। হা পিতঃ ! হা মাতঃ ! ইত্যাদি বিলাপ ও আর্ত-
নাদ শুনিতে শুনিতে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাক্ত কলেবর হইয়া
গৃহে মরা ভাল ? কিযুদ্ধে অধরদংশনপূর্বক শত্রুগণের ভয়প্রদ
হইয়া মরণ লাভ করা ভাল ? (ইহাও বিচার করিয়া দেখ) ।

৬। মানুষে যাহার তপস্যা, যুদ্ধজয়, কিংবা যুদ্ধ মরণ
ঘোষণা না করে, অথবা যাহার বিদ্যা, (বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি),
দান ও মহাধনের যশঃ কীর্তন না করে, তাহার জন্ম কৃমির
ও কীটের তুল্য ।

৭। যে পুরুষ সমরে পরাজুখ হয় তাহার শুভলোক
লাভ দূরে থাকুক তাহার পত্নীগণও তাহার নিকট লজ্জায়
মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়া পুরবাসিনী সখীগণের মুখপানে
চাহিয়া থাকে ।

৮। যাহারা শত্রুসৈন্য বিদারণ পূর্বক অবস্থান করে,
যাহারা আপনার দিগন্তব্যাপী সুষশঃ শ্রবণ করে, তাহাদের
যে কি সুখ তাহা আমি পশ্চাৎ বর্ণন করিব ।

৯। সিংহ আপনা অপেক্ষা শতগুণ অধিক মাংসরাশি-
মূর্তি হস্তীর উপর নিপতিত হয় এবং তাহার মদ-গন্ধ
রক্তও পান করে ।

১০। বীরপুরুষেরা যে প্রভুর জন্য সাহসিক কার্য করে,
এবং প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা আশ্চর্য্য নহে ।
যে মূর্খেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্বক শত্রু কর্তৃক

বিজিত হইয়াও জীবিত থাকে, তাহাই আশ্চর্য্য এবং তাহাই তাহাদের আশ্চর্য্য সাহস ।

১১ । যুদ্ধ না করিলে যদি লোকের মৃত্যুভয় নিবারিত হইত তাহা হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যখন যুদ্ধ না করিলেও মরণ হইবে, তখন আর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কুশলঃ উপার্জন করিবার প্রয়োজন কি ?

ইন্দ্র অশ্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন ;—

“ভক্ত্যুৎকর্ষন্তু যঃ শূরো বিক্রমেদ্বাহিনীমুখে ।

ভয়ান্ন বিনিবর্ত্তেত তস্য লীকা যথা মম ॥” ১ ॥

“যস্ম নাপিচ্ছ্যতে কচ্ছিত্ সহায়ং বিজয়ে স্থিতঃ ।

জীবগ্ৰাহং প্রগৃহ্ণাতি তস্য লীকা যথা মম ॥” ২ ॥

“আহবে নিহতঃ শূলৈ ন শীচেত কদাচন ।

অশীচ্যা হি যতঃ শূরঃ স্বর্গলীকে মহীযতে ॥” ৩ ॥

“ন হি শীঘ্রাৎ পরং কিচ্ছিত্ ত্রিষু লীকেষু বিদ্যতে ।

শূরঃ সৰ্ব্বং প্রাপয়তি সৰ্ব্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥”

চরাণামচরা অন্নং অদংষ্ট্রা দংষ্ট্রিণামপি ।

অপাণযঃ পাণিমতো হ্যন্নং শরস্য কাतरাঃ ॥”

সমানদৃষ্টিদরপাণিপাদাঃ

পশ্চাত্ পূরং তীরযোঃনুব্রজন্তি ।

অতীভযান্তাঃ প্রাণিত্য ভূয়ঃ

কৃতান্ত্রলীকপতিষ্ঠন্তি শূরান্ ॥” ৫ ॥

১। যে বীর স্বামীর জন্ত শত্রুসৈন্যে বিক্রম প্রকাশ করে, ভয়প্রযুক্ত বিনিবৃত্ত হয় না, তাহার লোক আমার সমান অর্থাৎ সে ব্যক্তিও ইন্দ্র লোকের প্রভু হয়।

২। যে বীর বিজয়ে অবস্থান করতঃ সহায় মুখ প্রতীক্ষা না করে এবং শত্রুর জীবন গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিও যমলোক প্রাপ্ত হয়।

৩। যুদ্ধে শূলাহত হইয়াও যে ব্যক্তি শোক করে না, কাতরও হয় না, শোকশূন্য হইয়া অর্থাৎ অকাতরে যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে বীর নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়।

৪। চর-জীবেরা অচর-জীবের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হয়। অদন্ত জীবেরা দন্তর জীবের ভোগ্য হয়। হস্তবর্জিত জীব হস্তযুক্ত জীবের অন্ন হয়, আর কাতর ব্যক্তিরাই শূর পুরুষের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হইয়া থাকে।

৫। ভীকু ব্যক্তির পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ থাকিতেও শূর পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর (ভয়ে তাহার অনুগত হয়)। ভয়ে কাতর হইয়া তাহার বার বার প্রণাম করতঃ

কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া শূরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। (কি আশ্চর্য্য! ইহাদেরও হস্ত ও পদাদি আছে অথচ তাহারা হস্তপদাদির কার্য্য বিষয়ে অক্ষম)।

এইরূপ অনেক উত্তেজক বাক্য আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিতে গেলে একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম।



PRINTED BY B. N. NANDI AT THE VALMIKI PRESS.

40, GURUPROSAD CHOWDURY'S LANE CALCUTTA.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
(773) 936-3000

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Ramdas Sen

Bharat Rahasya or Essays on the ancient Religion and Warfares of India & c

Calcutta 1885

A.or. 2522 d

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11541610-8